সদ্‌গুরু বাণী

পূজ্যপাদ যোগাচার্য স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজের
মুখনিঃসৃত বাণী

সংকলক ও ব্যাখ্যাতা
যোগাচার্য্য স্বামী সাধনানন্দ গিরি

জুজারসা যোগাশ্রম
হাওড়া

প্রকাশক :
শ্রীমৎ কৃপানন্দ ব্রহ্মচারী
জুজারসা যোগাশ্রম, জুজারসা, হাওড়া,
ভায়া আন্দুল মৌড়ী, পিন : ৭১১ ৩০২

প্রথম প্রকাশ : দোল পূর্ণিমা (১৯শে ফাল্গুন) ১৩৯৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : মহালয়া (১৪ই আশ্বিন) ১৪০৪

© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত Reg. No. L12680/91

মুদ্রক :
দুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রাপ্তিস্থান

জুজারসা যোগাশ্রম
পোস্ট : জুজারসা
জেলা : হাওড়া

শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর মঠ
চন্দ্রকোণা রোড
জেলা : মেদিনীপুর

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশন

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

জয়গুরু পুস্তকালয়
১২/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ ৪০.০০

উৎসর্গ

হে গুরো! আমার নরাকার রূপে,
ভবানন্দ নামে এসেছিলে ভবে।
ভবেতে থেকে বিষয়ানন্দ তুচ্ছ করে,
সচ্চিদানন্দরূপে জ্ঞানোপদেশ দিলে।
সাধনানন্দ নাম আমায় তুমি দিলে,
শ্বাসরূপে ধন অবলম্বন করে।
সাধনে থাকিতে সদা আমায় বলিলে,
শ্বাসের সাধনে স্থিতি হয় কূটস্থে।
তাহাতে যে আনন্দ তুমি অনুভব করালে,
স্থূলদেহ ত্যাগ করে গিয়া অমরধামে।
আমার জীবনের লইয়া সম্পূর্ণ ভার,
আশীর্বাদ করিছ প্রভু হইয়া সদয়।
তোমারই বাণী আজ প্রাণবন্ত হয়ে,
লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে গ্রন্থাকারে।
লহ শ্রীগুরুদেব তোমারি উদ্দেশ্যে,
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করি চরণতলে।

— সাধনানন্দ

প্রকাশকের কথা

'গুরু' শব্দটির মহিমা ও মাধুর্য কৃপাভিক্ষু এই দীন প্রকাশকের কাছে চিরকাল অজানাই থেকে যেত যদি গ্রন্থকার, আমার গুরুদেব স্বামী সাধনানন্দ গিরি মহারাজকে দিনের পর দিন খুব কাছের থেকে দেখার সুযোগ না পেতাম। তাঁর দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নেই। শ্রীগুরুদেবের প্রসঙ্গ উঠলে তাঁর যে বিহ্বল দশা হয়, শ্রীগুরুদেবের প্রতিটি বাক্যকে, প্রতিটি আদেশকে তিনি যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করেন, শ্রীগুরুদেবের প্রতিটি চিঠিপত্রকে তিনি যে আন্তরিক মমতায় সংরক্ষণ করেন গুরুময় হয়ে যাওয়ার এমন আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আমি আগে কখনো দেখিনি কোথাও। মনে পড়ে, অসংখ্য মনি অর্ডার ফর্মের ফিরে আসা অবশিষ্ঠাংশ সযত্নে বহুমূল্য ডাকটিকিট সংগ্রহকারীর মত যত্নে ও নিষ্ঠায় তাঁকে সংরক্ষণ করতে দেখে একদিন অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিলাম। এগুলোকে কেউ কি এমন যত্নে সাজিয়ে রাখে? গদগদকণ্ঠে প্রভু আমার বলে উঠলেন, "দ্যাখ্ বাবা এই কাগজগুলো শ্রীগুরুভগবান একদিন সস্নেহে হাতে ধরেছিলেন, নিজের হাতে স্বাক্ষর করেছিলেন। এর চেয়ে পবিত্র জিনিষ আর কি আছে বল?" তাঁর সেই সময়কার ভাব, ভাষা, কণ্ঠস্বর, পুলকে উদ্ভাসিত রোমাঞ্চ আমাকে অভিভূত করে তুলেছিল। শ্রীগুরুদেবকে জীবন্ত ভগবান না ভাবলে এমনি কেউ করতে পারে না। তাঁর কাছে কথাপ্রসঙ্গে বহুবার শুনেছি "গুরোর্লোপঃ ন বক্তব্য" ইত্যাকার শাস্ত্রবচন নিছক কথার কথা নয়। অনুগত শিষ্য গুরুর দেহান্ত হোক কিম্বা না হোক তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকে কখনো বঞ্চিত হন না। তাঁর আচরণ ও অভিব্যক্তি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝেছি পূজা মনন, নিদিধ্যাসন সমস্ত বিষয়েই তিনি একেশ্বরবাদী। আর সেই ঈশ্বরের নাম স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজ।

বৃক্ষ যখন বিশাল বনস্পতি হয়ে ওঠে তখনও মাটির সাথে তার নিগূঢ় সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকে। শ্রীগুরুদেবের আশ্রমের (শ্রীযুক্তেশ্বর মঠের) প্রতি তাঁর সম্পর্ক সেই শাশ্বত সত্যেরই ইঙ্গিতবাহী। শ্রীগুরুমহারাজের (ভবানন্দজীর) স্থূল শরীরে অবস্থানকালে তো বটেই, তাঁর দেহান্তের পরেও অর্থে, সামর্থ্যে, সদুপদেশে, গঠনমূলক ভাবনায় সেই পিতৃভূমির প্রতি তাঁকে (অর্থাৎ সাধনানন্দজীকে) যে পরিমাণ সনিষ্ঠ দেখেছি, তা নিছক কর্তব্যবুদ্ধির ফসল কখনো হতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের সমাধিমন্দিরের (শ্রীযুক্তেশ্বর মঠ) প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ও আন্তরিক ভাবনাচিন্তা কতটা জায়গা জুড়ে থাকে তা তাঁর সান্নিধ্যধন্য সকলেই

অবগত আছেন। দেখেশুনে বহুসময়েই আমার মনে হয়েছে আমাদের বর্তমান আশ্রম প্রাঙ্গণটি যেন তাঁর অবয়ব মাত্র ; তাঁর প্রাণ পড়ে রয়েছে আরাধ্যনিধির সমাধি প্রাঙ্গণে।

গুরুভাইবোনদের আত্মার আত্মীয় ভাবনা তাঁর পক্ষেই সঠিকভাবে করা সম্ভব যিনি আত্মজ্ঞানী হয়েছেন। অনিবার্যভাবেই এই ব্যাপারেও তাঁর তুলনা পাইনি। তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম দেখে বহুবারই মনে প্রশ্ন জেগেছে, আমি কি আমার গুরুভাইবোনদের এমন ভালবাসতে পেরেছি? অথচ যেখানে শাস্ত্রবিগর্হিত আচরণ কিম্বা যেখানে গুরুব্রহ্মের বিন্দুমাত্র অসম্মান কিম্বা অনাদরের প্রকাশ সেখানে তাঁর রুদ্রমূর্তি আমাদেরও শঙ্কা জাগায়। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি" এই পুরুষের লোকোত্তর মহিমার তল খোঁজার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অধুনা ক্ষান্ত হয়েছি।

এতো গেল শিষ্যটির (সাধনানন্দজীর) কথা। গুরুমহারাজজীর ভূমিকাও যে কম আকর্ষণীয় নয়। সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না, আত্মদান করেন এই মহাবাক্যটি সত্য বলে বুঝতে কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হয়না যে সব শিষ্যকে দেখে, সেরকম সুযোগ্য আধার একজন মহাগুরুর পার্থিব জীবনে একটি দুটির বেশী বড় একটা পাওয়া যায়না। কিন্তু এই বহিরঙ্গ দৃষ্টির অন্তরালে সদ্‌গুরুর যে নিরন্তর প্রচেষ্টা দিনের পর দিন প্রবাহমান থাকে তার খবর আমরা ক'জন রাখি? এখানেও দেখি উপযুক্ত শিষ্যের আধারে গুরুসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেই স্বীয় কর্তব্যকর্মের সমাপন হয়েছে এমনটা ভেবে নিশ্চিন্ত বোধ করেননি আমার পরমগুরু স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজ। এই শিষ্যের মধ্যে দিয়ে গুরুশক্তির যে মহামহিম প্রকাশ প্রত্যাসন্ন তা তাঁর প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে জাজ্বল্যমান ছিল বলেই হয়ত পদে পদে তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসনটির উপযুক্ত করে তুলতে তাঁর (ভবানন্দজী) প্রয়াসের অন্ত ছিলনা। আনুষ্ঠানিক অভিষেকের আয়োজন করে নিজের হাতে আচার্যপদে বরণ করা, পত্রযোগে ডেকে এনে ধর্মসভার সভাপতিত্ব করানো, আর প্রতিনিয়ত উপদেশে ও আদেশে সদাজাগ্রত রাখার নিরন্তর প্রয়াস দেখে আমরা বুঝি নিজের দায়িত্ব কর্তব্যের বিষয়ে বিন্দুমাত্র অসতর্ক হওয়া শ্রীশ্রীভবানন্দজীর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। অপরপক্ষে সকলেই যাঁকে আপাতদৃষ্টিতে কঠোর, কঠিন এবং কড়াধাতের মানুষ বলেই জানতেন সেই আচার্যদেব যখন বলেন, "তুমি না আসিলে আমি কাহার মুখ দেখিয়া থাকিব" (পত্র নং ৪) তখন পিতৃহৃদয়ের যে অনুপম উদ্ভাস আমাদের মনোশ্চক্ষে ফুটে ওঠে তার কি কোন তুলনা হয়? ধন্য এই পিতাপুত্রের সম্পর্ক। আর ধন্য তাঁদের পারস্পরিক ভাববিনিময়। আর আমিও নিজেকে ধন্য মনে করছি এই মালঞ্চের মালাকর হতে পেরে, "ন ভূতো ন

ভবিষ্যতি" এমন একটা অত্যাশ্চর্য গ্রন্থের প্রকাশক হবার সুযোগ পেয়ে।

এই গুরুদায়িত্ব সুসম্পন্ন করার কোন যোগ্যতা যে আমার নেই সেকথা আমার চেয়ে ভাল আর কেউ জানেনা। কিন্তু পঙ্গুকে দিয়ে যিনি গিরি লঙ্ঘন করান তিনি স্বেচ্ছায় কোন দায়িত্বভার দিলে তা তাঁর শক্তিতেই সুসম্পন্ন হয় এটা অনেক দেখে ও ঠকে শিখে ফেলেছি। তাই দেবদূতেরা যে কাজে নির্ভয় থাকেন না, নির্বোধেরা সেখানে অকুতোভয় এই আপ্তবাক্যের মর্ম জানা থাকা সত্ত্বেও আমার আস্ফালনের অভাব হবে না এহেন প্রত্যয় নিশ্চয়ই পাঠকদের ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। তথাপি জানাই ত্রুটি কিছু রয়ে গেছে। এগুলোর দায় সম্পূর্ণ আমার। সংশোধনের দায়ও আমরাই।

এখানে একটি কথা জানানো প্রয়োজন। শ্রীশ্রীপরমগুরুদেবের চিঠিপত্রের ফটোস্ট্যাট কপি ছাড়াও সেগুলোর আরেকপ্রস্থ প্রতিলিপি আমরা সংযোজিত করেছি। সেখানে আমরা সচেতনভাবেই এই পত্রাবলীর ভাবগত কিম্বা ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিনি। কারণ পত্রগুলো যাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ তিনি এগুলোর অনন্যতা ক্ষুণ্ণ হবার কোন প্রকার প্রচেষ্টা অনুমোদন করতে প্রস্তুত নন।

এই মহান গ্রন্থটিকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার প্রয়াসী প্রস্তাব ও অভিভাবন জ্ঞানীভক্ত পাঠককুলের কাছে ভিক্ষা করি। ভিক্ষা করি উপদেশ ও নির্দেশনা। কারণ এ আমার গুরুর কাজ। আর মাধুকরী তো সাধুর সারাজীবনেরই ব্রত।

মহালয়া,
১৪ আশ্বিন, ১৪০৪
জুজারসা, হাওড়া।

ইতি
প্রণতঃ
কৃপানন্দ।

লেখকের অন্যান্য বই

যোগ ও সাধন রহস্য
শ্রীশ্রীকালী ও শিবের তত্ত্ব কথা
গুরুপূজা পদ্ধতি ও যোগসঙ্গীত

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সদগুরুবাণীর প্রথম সংস্করণের সমুদয় গ্রন্থ নিঃশেষিত হইবার পরেও প্রায় দুই বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইয়াছে। নূতন সংস্করণে বাণীপূজার এই আয়োজনকে অধিকতর প্রযত্নমণ্ডিত করিবার অভিলাষ ছিল। এই দুই বৎসরে বহুবার তজ্জনিত প্রচেষ্টা ও প্রয়াস গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু শ্রীগুরুদেব প্রতিবারই অন্যকিছু দায়িত্বভার ন্যস্ত করিয়া বিভিন্ন আঙ্গিকের বিবিধ উপচারের বৈচিত্র্যময় উপাসনায় কৃপাধন্য এই তনয়টির ঐকান্তিক মনোযোগ দাবী করিয়াছেন। আশ্রমের বিকাশ হইতে শুরু করিয়া শ্রীগুরুপরম্পরার দেবদেউল নির্মাণ, মর্মরবিগ্রহের আয়োজন, ভিন্নধর্মী দেশে তাঁহার নামপ্রচার, যখনই যাহা আদেশ করিয়াছেন, প্রসন্নচিত্তে তাঁহার পূজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু কর্মস্রোতের এই ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া বিবিধভূষণে তাঁহার বাণীমূর্ত্তিটিকে অলঙ্কৃত করিবার কাজটি মনপ্রাণের সমস্ত তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি সহকারে সাঙ্গ করিতে পারিলাম না বলিয়া খেদ রহিয়া গেল। হয়ত ইহাও তাঁহার ইচ্ছা। এদিকে পাঠকবর্গের ক্রমবর্দ্ধমান তাগাদা এবং অনুযোগ এমন স্থানে দাঁড়াইয়াছে যে এই মূহুর্তে তাহাকেও উপেক্ষা করিবার যো নাই। অগত্যা এই অকালবোধন।

নূতন সংস্করণে কয়েকটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সন্নিবেশিত করিয়াছি একটি নূতনতর অর্ঘ্য— আমার শ্রীগুরুবাবার কয়েকটি অমৃতময় পত্রের প্রতিলিপি।

একান্ত ব্যক্তিগত এই সম্পদগুলি এতকাল সযত্নে বুকে করিয়া রাখিয়াছি। কত উৎসাহ উদ্দীপনাসঞ্চারী, কত না স্নেহপ্রীতিনিঃস্যন্দী এই পত্রসম্ভার দিনের পর দিন ঝঞ্ঝাসংক্ষুব্ধ আমার জীবনের পথে কোথাও পথনির্দেশ, কোথাও বা পাথেয় হিসাবে সঙ্কটময়মূহুর্তগুলিতে আমাকে পরিচালিত করিয়াছে বারংবার। এই মণিরত্নমালাসমূহ শ্রীগুরুদেবের মহিমা ও মাধুর্যে নিষিক্ত করুণাময়সত্তার যে অন্তরঙ্গ দিকের প্রতি আলোকসম্পাত করে তাহা আস্বাদন করিয়া মুক্তিপথযাত্রী সকলে আপ্লুত হইবেন এমন ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমার একান্ত সাধনার ধনগুলি আজ উদ্ধারিত করিয়া দিলাম অসীমের প্রমুক্ত অয়নে। যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, যদি পাঠককূল চাহেন, তাহা হইলে পরবর্তী সংস্করণে এই পত্রাবলীর আর্ষবচনসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে নিশ্চয়ই প্রয়াসী হইব।

গ্রন্থপ্রকাশের সমস্ত জটিল কর্মসম্ভার শ্রীগুরুদেব আমার ভিন্ন ভিন্নরূপে আবির্ভূত হইয়া সুসম্পন্ন করিয়া লইয়াছেন। অপার করুণা তাঁহার। আমার তো নিজের বলিয়া

দিবার আর কিছু নাই। আছে শুধু অশ্রুসজল বিনীত নমস্কার। নবকলেবর এই গ্রন্থসকাশে আমার জীবনদেবতা শ্রীগুরুদেবকে তাহাই অর্পণ করিয়া ধন্য হই। মহালয়ার এই পূণ্য প্রহরে ইহাই আমার পারায়ণ।

মহালয়া,
১৪ আশ্বিন, ১৪০৪।
জুজারসা, হাওড়া।

ইতি
গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ

শ্রীগুরুদেবের অশেষ কৃপায় তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী আজ পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আজ কত কথাই না মনে আসিতেছে। তখন শৈশবপার হইয়া সবে কৈশোরে পড়িয়াছি। উপনয়ন উপলক্ষ্যে উপর্য্যুপরি তিনটি দিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও অনুধ্যানে অতিবাহিত করার প্রয়াস পাইতেছি। এমন সময় গীতোক্ত "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।" শ্লোকটি মনে বড়ই আলোড়ন তুলিল। ইহাও কি সম্ভব? সত্যই কি ভগবান যোগক্ষেম বহন করেন? না এই কথার অন্য কোন রহস্যার্থে আছে? প্রশ্নটি নিতান্তই ব্যাকুল করিয়া তুলিল। আমার প্রশ্নবানে ঘরে ও বাহিরে সকলেই প্রায় উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। স্কুলে এবং পরে কলেজে অধ্যাপক মহাশয়েরাও নিষ্কৃতি পাইলেন না। তাঁহারা মেটামুটি বুঝাইলেন শাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে গুরুমুখী। গুরুলাভ আবার স্থানকালপাত্রভেদে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তবে ছাত্রগণের অধ্যয়নই তপস্যা; কাজেই অধুনা এই প্রশ্ন লইয়া অধিক মত্ততা পরিহর্তব্য। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা ছিল ভিন্নতর। তাই অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল গুরুতীর্থানুসন্ধানে গৃহত্যাগ। বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার পর ঘটে বাঞ্ছিত গুরুলাভ। শাস্ত্রানুষঙ্গে ধন্য হই। পরিব্রাজনকালে ইহাও সম্যকরূপে অনুভব করি যে যোগক্ষেম বহন করা তাঁহারই দায়। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় জপধ্যান ও ঈশ্বরপ্রণিধানে। কিন্তু একদা অনুভব করিতে থাকি তবু ভরিল না চিত্ত। অতঃপর সে এক অলৌকিকআখ্যান। হরিদ্বারে সাধনরত অবস্থায় শুনিতে পাই দৈববাণী পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে রহিয়াছেন আমার আরাধ্যনিধি, প্রাণের দেবতা। পুনশ্চ বঙ্গভূমিতে প্রত্যাবর্তন এবং অবশেষে কৃতকৃতার্থ হই মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু স্বামী ভবানন্দ গিরির কৃপালাভে। শুধু ক্রিয়াযোগে দীক্ষাই নহে, তাঁহারই স্নেহ ও অভিভাবকত্বে সাধনার ক্রমপর্যায়গুলি একে একে অতিক্রম করিয়া আপ্তকাম হই। আজ প্রায় চার বৎসর অতীত হইল তিনি আর আমাদের মধ্যে স্থূলশরীরে নাই। বাংলা ১৩৯১ সালের ১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার (ইং ৩১.৭.৮৪) বিকাল ৪টা ৪৫ মিনিটে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। কিন্তু গুরুসত্তা যে শিষ্যের নিকট চিরদেদীপ্যমান থাকে তাহার জীবন্ত উপলব্ধি হইতে বঞ্চি তহই নাই। বোধসার হইতে পাই—

"বোধাত্মনা গুরুঃ শিষ্যমাবিশ্য দহতি ক্ষণাৎ।
যদ্বৈতং সাগুরোঃ শক্তির্নশিষ্যস্যেতি নির্ণয়ঃ।।
গুরু প্রভাহি শিষ্যস্থা তমোহন্তি প্রকাশতে।
তমোহন্তা প্রকাশাত্মা গুরুরেব ন শিষ্যকঃ।।"

—অর্থাৎ গুরুবোধরূপ ধরিয়া শিষ্যে প্রবেশপূর্বক ক্ষণমধ্যে যে দ্বৈতপ্রতীতির কারণ অজ্ঞানকে বিনাশ করেন তাহা গুরুরই শক্তি, শিষ্যের নহে। শাস্ত্রে এইরূপ অবধারিত হইয়াছে। গুরুপদেশ শিষ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে শিষ্যের অজ্ঞান নাশ করে এবং স্বয়ং প্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়;এইহেতু গুরুই অজ্ঞাননাশক এবং তিনিই পরিশেষে জ্ঞানরূপে অবশিষ্ট থাকেন। বোধকালে এবং বোধের অবসানে গুরুই অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া এবং শিষ্য স্বরূপ বিলীন হইয়া যায় বলিয়া গুরুর শ্রেষ্ঠতা এবং শিষ্যের গৌণতা।

যাহা হউক, আমার ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসজীবনে যেসকল প্রশ্ন জাগিত তাহা শ্রীগুরুদেবকে জানাইতাম এবং তাঁহার উত্তর খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ইহা ছাড়াও ১৯৮০ সাল হইতে ১৯৮৩ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন সময়ে আমার মনে যে সকল প্রশ্ন জাগিয়াছিল তাহা শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার উত্তর আমি রেকর্ডিং ক্যাসেটে যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। এ সকলই আমার জীবনপথের পাথেয়। কোনদিন ভাবি নাই তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীনিচয় পুস্তকাকারে গ্রথিত হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে যাহার অনিবার্য্য ফলশ্রুতি বর্তমান গ্রন্থের আবির্ভাব। কোন এক রাত্রিশেষে ধ্যানযোগে শ্রীগুরুদেবের জ্যোতির্ময় সূক্ষ্মশরীরের সাক্ষাৎ পাই। শুনিতে পাই তাঁহার নির্দেশ—"সাধনানন্দ, তোর নামের অর্থ ভুলিসনা। শ্বাসরূপ ধনই সাধন। তাকে অবলম্বন করে কূটস্থে স্থিতির আনন্দই সাধনানন্দ .....শ্রীগুরুদেবকে বাণী অর্পণ করতে হয় রে। সমস্ত দিন এক আচ্ছন্ন আবেশে অতিক্রান্ত হইল। কিন্তু 'বাণী অর্পণ' কি এই ভাবনায় পাইয়া বসিল। অবশেষে শ্রীগুরুদেব ধ্যানের মাধ্যমে অনুভব করাইলেন। মনে পড়িল শাস্ত্রের কথা,— গুরুলাভ হইলে শিষ্যকে তনু, মন, ধন ও বাণী এই চারিটি শ্রীগুরুর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে হয় (বিস্তৃত ব্যাখ্যা ৮ পৃষ্ঠায় আছে)। তন্মধ্যে শ্রীগুরুদেবের গুণগান করার নামই বাণী অর্পণ।

অতঃপর গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হই। ক্যাসেট হইতে প্রশ্ন ও উত্তর খাতায় লিখিতে শুরু করি। লেখা শেষ হইলে তাহা পড়িয়া দেখিলাম ও অনুভব করিলাম বেশ কয়েকটি জায়গায় শ্রীগুরুদেবের উপদেশ (বাণী) ক্রিয়াবান ও ভক্তগণকে অল্পাধিক সমস্যায় ফেলিতে পারে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে শ্রীগুরুদেব এমন

কিছু গ্রাম্যভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যাহার অন্য ব্যাখ্যা ও সমালোচনা হইতে পারে না এমন নয়। ফলতঃ আমাকে গুরু অপরাধে লিপ্ত হইতে হইবে অর্থাৎ গুরুর গুণগান না হইয়া দোষকীর্তনে অপরাধী হইতে হইবে। আসলে সনাতন ধর্মশাস্ত্রের প্রতিটি কথার এবং প্রতিটি আর্ষবাক্যের অন্ততঃ ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে। স্থূল লৌকিক ব্যাখ্যা, গভীর কাব্যিক ব্যাখ্যা এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। তাই ক্রিয়ান্বিত পাঠকগণের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন আমার গুরুদেবের বাণীর ভাষার দিকে লক্ষ্য না করিয়া ভাবের দিকটি অনুভব করেন। কারণ ঈশ্বর ভাষাময় নহেন, ভাবময়। ভাবের মধ্য দিয়া তাঁহাকে অনুভব করিয়া পরে ভাবাতীত হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মলীন হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া বাণীরূপা এই সকল অমূল্যসম্পদ আমি অনুশীলন করিয়াছি এবং আমার উপলব্ধিকে ভাবার্থ, বিশদার্থ, রহস্যার্থ, যৌগিক অর্থ ইত্যাদি আকারে বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আশা করি এই প্রচেষ্টা তত্ত্ব আস্বাদনে সকলকে কিছু সাহায্যই করিবে।

শ্রীগুরুদেব একজায়গায় বলিয়াছেন— "গুরুদেব দেহধারী নন, কোন সংকীর্ণতা ভেদবুদ্ধি নেই সেখানে।" এই কথাগুলি স্থূল অর্থে বিভ্রান্তিকর মনে হইতে পারে। কারণ নররূপী অর্থাৎ দেহধারী গুরুকে আমরা পূজা, শ্রদ্ধা, ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকি। অতএব "গুরু দেহধারী নন' ইহা কিভাবে হইতে পারে? ধ্যানের গভীরতায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত ইহা সম্যক বোধগম্য নাও হইতে পারে। প্রাণায়ামাদি সাধন করিতে করিতে যখন কূটস্থে মনের স্থিতি হয় তখন অনুভব হয় যে "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ।" ভগবানই (আত্মাই) গুরু। মনুষ্যদেহ গুরুর আসনমাত্র। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে স্থানান্তরে দেওয়া আছে। শুধু তাহাই নহে;অন্য একস্থলে তিনি বলিয়াছেন —"জীব গুরুত্যাগী হচ্ছে"। কি সাংঘাতিক কথা। অথচ কত গভীর তত্ত্ব পূর্ণ কথা। জীব কিভাবে 'গুরুত্যাগী হচ্ছে' তাহা পুরাণে চন্দ্রের গুরুপত্নী হরণের কাহিনীর মাধ্যমে বিশদভাবে ব্যাখাত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের কথাগুলি বাহ্যতঃ শুনিতে বড় অদ্ভুত। অথচ কী গভীর দ্যোতনাই না তাহাতে অর্ন্তলীন! উদাহরণস্বরূপ "অধর ওষ্ঠ হইতে ভ্রূদ্বয় পর্যন্ত এক বিঘত জায়গা। তাতে হাড় আর মাংস আছে। সেটা খানিক চাঁটছে আর কামড়াচ্ছে। এই লইয়া বিশ্ব উন্মাদ।" চিন্তাদীর্ণ অজস্র প্রহর কাটিয়াছে এই কথা কয়টির ব্যাখ্যায়। দীর্ঘকাল রাত্রিদিন অতিবাহিত করিয়াছি ইহার গূঢ়ার্থ অনুচিন্তনে। ভাষা আসে নাই। মনানুসারী ভাবনা ও ভাষা একই প্রবাহে সম্পৃক্ত না হওয়া পর্য্যন্ততো ভাষ্যকারের সন্তুষ্টি নাই। তাই এই সময়ে দুর্বলের একমাত্র বল্ গুরুকেই অশ্রুর উপচারে প্রাণের বেদনা নিবেদন করিতাম। রোদন সহকারে প্রার্থনা করিতাম—

"হে গুরো তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া উক্ত কথাগুলির রহস্য অনুভূতি করাও।" সাধকের একমাত্র কান্নাই বল। এবিষয়ে যোগীভক্ত কবীরও একমত,—

"কবীর হাস্‌না দূর কর
রোণেসে কর চিত।
বিন রোয়ে ক্যাঁও পাইয়ে
প্রেম পিয়ারা মিত।।"

অর্থাৎ কবীর বলিয়াছেন— তুমি হাস্যপরিহাস ত্যাগ কর। যদি ভগবানকে লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে তবে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হও। কারণ রোদন (প্রেমাশ্রুপাত) ব্যতীত প্রেমপ্রিয় অর্থাৎ প্রিয়তম ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়না।

যাহাহউক এইভাবে কয়েকমাস অতীত হইল। অতঃপর একদিন জ্যোতির্ময়রূপ ধারণ করিয়া শ্রীগুরুদেব বলিলেন,— "সাধনানন্দ! শক্তিপূজায় পাঁঠাবলি হয় রে! কণ্ঠদেশ ছেদিত হয়....জড় চৈতন্যের সন্ধিস্থল...।" তাহার পর তিনি অদৃশ্য হইলেন। এইবার লেখনী সচল হইল; এবং একসময় ভাষ্য তাহার বাঞ্ছিতরূপ লাভ করিল।

গ্রন্থের শেষপর্য্যায়ে পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রীগুরুদেবেরই প্রদত্ত সঙ্কেত অবলম্বনে বিশদ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এবং শেষপাদে সংযোজিত করিয়াছি আমার পরমগুরুদেব পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের প্রদত্ত কিছু অমূল্য উপদেশবাক্য।

আত্মশ্লাঘা কিংবা আত্মপ্রচার নহে। শ্রীগুরুদেবের অমোঘ উদ্ভাস এবং স্বীয় সাধনজীবনের সত্যোপলব্ধির নীরিখেই আশা জাগিতেছে ক্রিয়াযোগিগণের নিকট এই গ্রন্থ হয়ত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহা ক্রিয়ান্বিত সাধক ও ভক্তগণের স্বল্পমাত্র উপকারে লাগিলেই আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া আশ্বস্ত হইব।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থ প্রকাশনার বিষয়ে অজস্র দিক হইতে অজস্রবিধ সাহায্য পাইয়াছি। নতুবা আমার মত অকিঞ্চন সন্ন্যাসীর পক্ষে গ্রন্থ প্রকাশের মত বিশাল ব্যাপার সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হইত না। কাহাকে আর ধন্যবাদ দিব? ইহা শ্রীগুরুদেবেরই দান।

দোলপূর্ণিমা
১৯শে ফাল্গুন, সন ১৩৯৪ সাল,
জুজারসা/হাওড়া।

ইতি—
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

সদ্‌গুরু বাণী	...	১-১০৭
গীতা ও অধ্যাত্মতত্ত্ব	...	১০৮-১২৪
উপদেশাবলী	...	১২৫-১৩৩
পত্রাবলী	...	১৩৪-১৩৮
পত্রাবলীর প্রতিলিপি	...	১৩৯-১৪৮
পাঠকের উপলব্ধি	...	১৪৯-১৫২

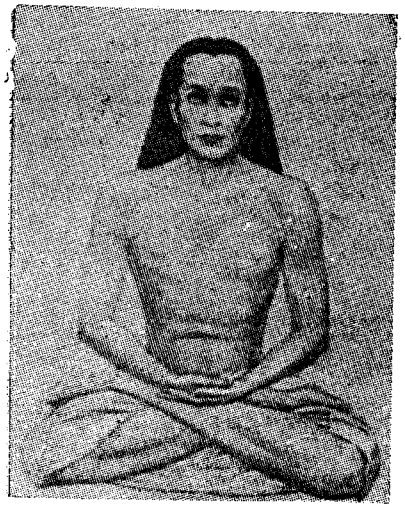

মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ

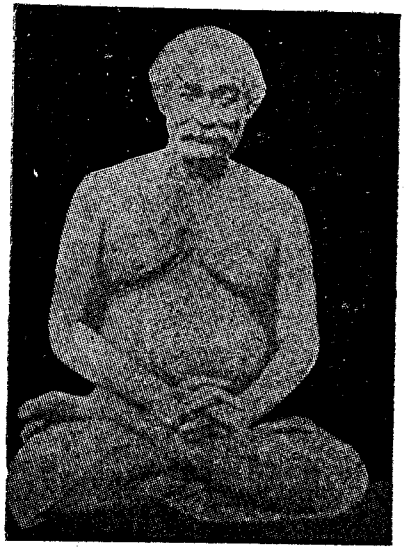

যোগাবতার শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী
মহারাজ

জ্ঞানাবতার স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি
মহারাজ

প্রেমাবতার স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজ

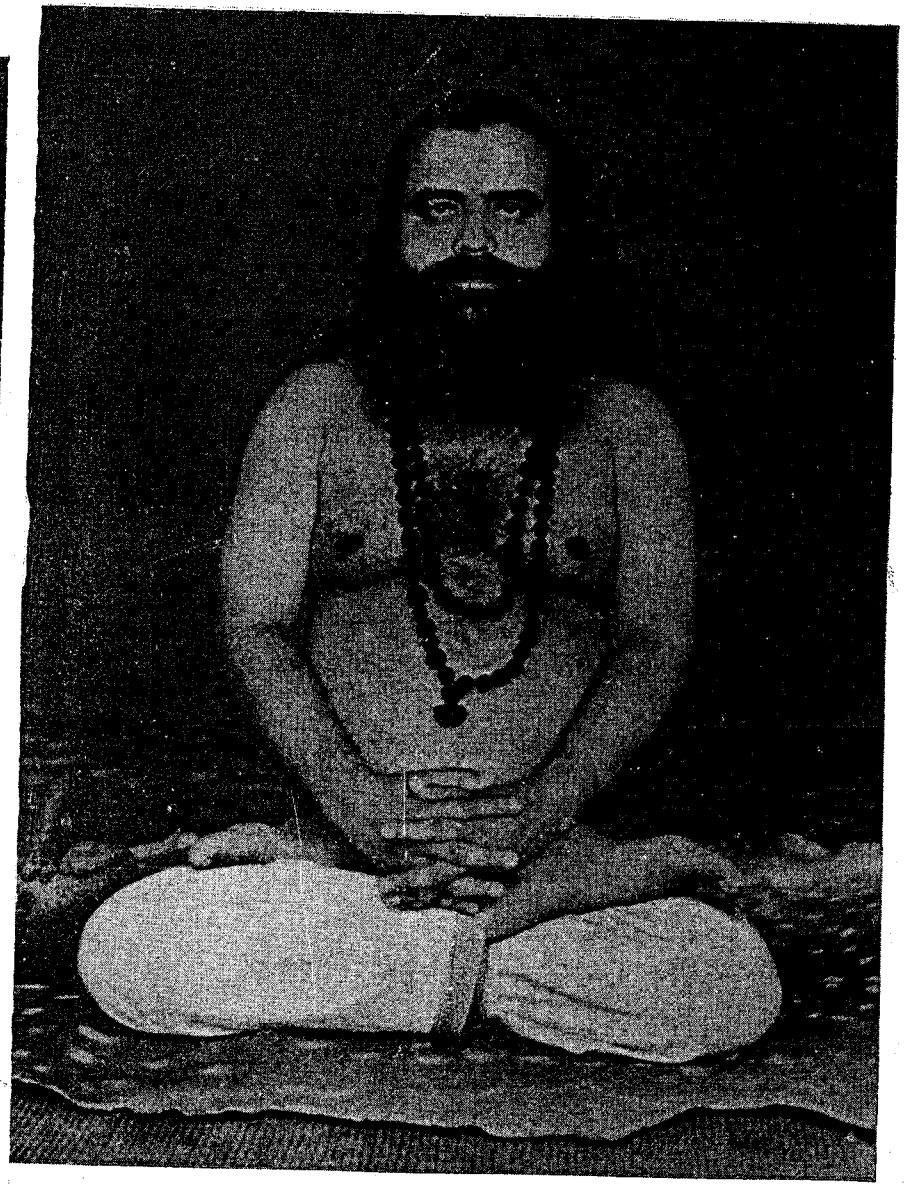

যোগাচার্য্য স্বামী সাধনানন্দ গিরি মহারাজ

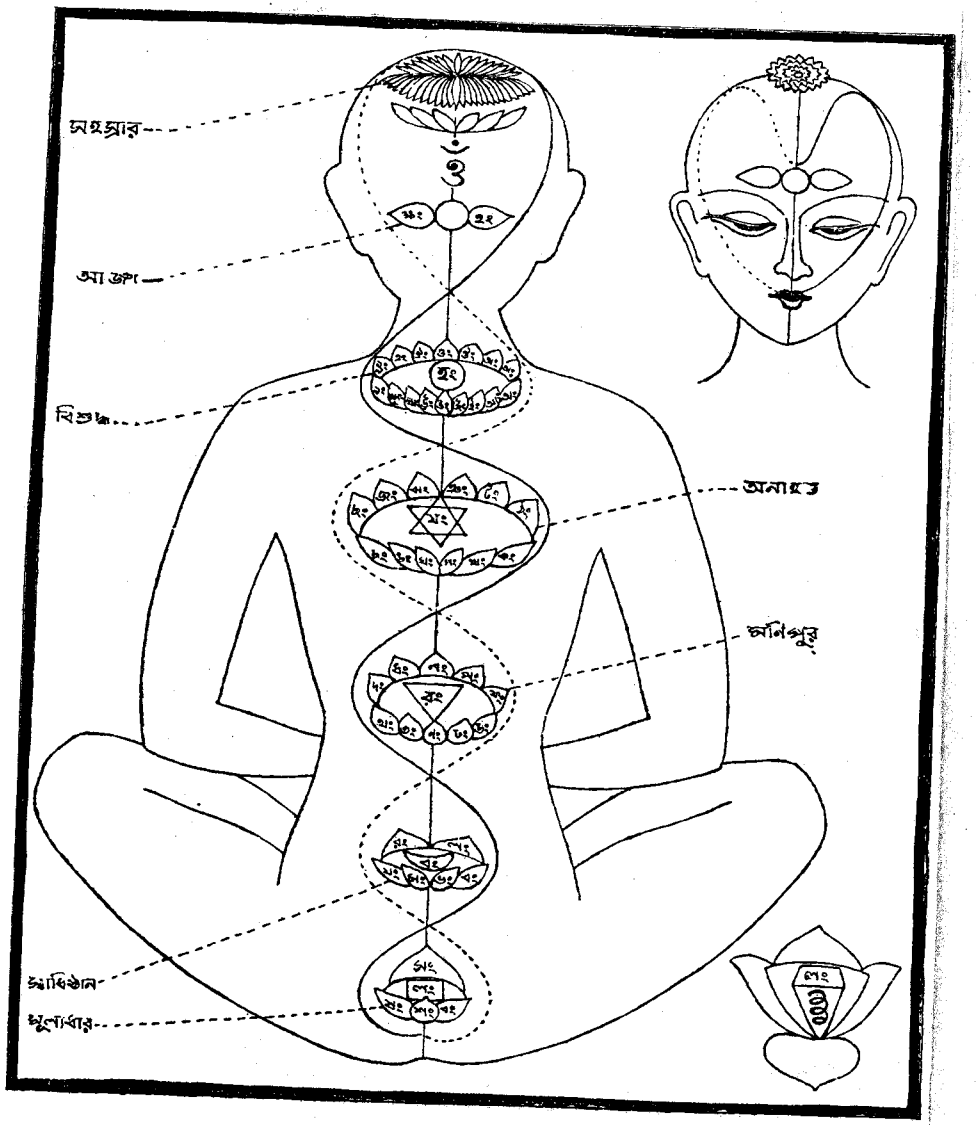

চিত্র ঃ ষট্‌চক্র

সদ্‌গুরু বাণী

প্রশ্ন ঃ সদ্‌গুরু কাহাকে বলে?

উত্তর ঃ প্রথমেই জানা দরকার 'গুরু' বলতে কি বোঝায়? সাধারণতঃ ব্যবহারিক জগতে আমরা বলে থাকি— 'আমার খাওয়াটা আজ গুরুতর হয়ে গেছে' বা 'আমি আর গুরুভার বহন করতে পারছি না'। এর অর্থ কি? না আমরা বুঝি যে আমার খাওয়াটা অনেক বেশী হয়েছে বা আমি আর অধিক ভার বহন করতে পারছি না। তাহলেই দেখা যাচ্ছে গুরু মানে অধিক, বেশী, বিরাট বা ব্যাপক ইত্যাদি। সদ্‌গুরু কথাটার মধ্যে 'সৎ' মানে সত্যতে বিরাট বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সত্য অনুভব করা। গুরু মানেই হচ্ছে বিরাট। তার সৎ অসৎ নেই। অসৎ গুরু হয় না। এই হচ্ছে গুরুর মহিমা।

সদ্‌গুরু এই কথাটা ভারতবর্ষে সর্বত্রই প্রচলিত আছে। সৎগুরু লাভ হওয়া মানে সৎ এ গতি হওয়া এবং গুরু মানে সেই বিরাট। বিরাট মহাসত্যকে অবলম্বন করে যে বা যারা গতি স্থির করে চলতে থাকেন তাকেই সদ্‌গুরু বলে।

প্রশ্ন ঃ সদ্‌গুরুর প্রয়োজন কি?

উত্তর ঃ বিরাট সত্তা বিশ্বে। যারা ভক্ত তারা সেই বিরাট সত্তায় যাবার জন্য যাত্রা শুরু করেছে। আমি সেইজন্য সকলকেই চিঠিতেই মুক্তিপথ-যাত্রী বলে উল্লেখ করি। সাধক যখন সাধনার পথে নামে তখন তার উদ্দেশ্য কি, কেন নামছে, কোথায় যাচ্ছে, কোথায় যাবে, হেতু কি? এসবের সিদ্ধান্তে যদি পৌঁছাতে হয় তবে তাকে সদ্‌গুরু ধরতে হয়। সৎ অর্থাৎ সত্তাতে গতি স্থির করে বিরাট সত্তায় অবস্থান করানোই হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাজ। গুরু যে বিরাট সত্যের অধিকারী— তিনি বিরাট সত্তা এবং বিরাট সত্তার পথের অধিকারী। সেজন্য ভারতবর্ষের মধ্যে যতরকম সম্প্রদায় থাক না কেন গুরুবাদ একই আছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরু প্রণাম মন্ত্রও একই। তার কোন ভিন্ন প্রণাম মন্ত্র নেই।

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।"

এ যে গুরুপ্রণাম মন্ত্রগুলি, এগুলি কি শাক্ত, কি শৈব, কি গাণপত্য, কি বৈষ্ণব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়েরই প্রণামমন্ত্র। কোন সম্প্রদায় গুরুপ্রণাম মন্ত্রটাকে

বাদ দেয় না। একে অবলম্বন করে সকলে কথা বলে। এর ওলট পালট হয় না। কেননা সত্য মহাবিরাট। সেজন্য গুরুপ্রণামমন্ত্রে শাক্ত যা বলেছে, বৈষ্ণবও একই কথাই বলেছে। এবং সেই বিরাট সত্তাতে যাবার জন্য আমাদের আচরণ বিধি অনুসরণ করে যেতে হচ্ছে। সদ্‌গুরুই সেই বিরাটে পৌঁছবার উপায় বলে দেন।

প্রশ্ন ঃ বিরাটের পথে কিভাবে যাত্রা শুরু করতে হয়?

উত্তর ঃ এই বিশ্বে একটা ভ্রান্তির খেলা চলছে। এ ভ্রান্তিতে উন্মাদ হয়ে বিশ্ব ছুটছে। কোথায় যাচ্ছে, কোথায় যাবে, কেন যাচ্ছে, উদ্দেশ্য কি, যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় তখন কোন পথ খুঁজে পাবে না। তার কারণ হচ্ছে বিশ্বে এসে মানুষ কি চাচ্ছে, কি পাওয়ার জন্য সে এসেছে, কি পেলে সে সন্তুষ্ট হবে তা সে জানে না। আমরা এ জিনিষগুলো বিচার করি না। না বিচার করে আমরা সর্বদাই উন্মাদের মত ছুটে বেড়াচ্ছি। এ ছুটছে তো আমি ছুটছি, আমি ছুটছি তো সে ছুটছে। এইভাবে দিশেহারা হয়ে যাতে না ছুটতেহয় তার জন্য আমাদের সদ্‌গুরুর কাছে যেতে হবে। গিয়ে সব জিনিষটি তন্ন তন্ন করে আমাদের বুঝতে হবে। বিভ্রান্ত না হয়ে বিরাটের পথে যাত্রা শুরু করতে হবে।

এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চ থেকে বিরাটের দিকে যাবার জন্য দুটো পথ আছে। তা হোল Spinal cord-এ অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ওপরে মেডুলা অবলঙ্গেটা আছে। ঐখানেই আমাদের দুটো গতি আছে। একটায় হচ্ছে অবিদ্যা মায়ার খেলা, আর একটায় বিদ্যা মায়ার খেলা। অবিদ্যা মায়ার খেলাটা আমাদের এই ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে স্বতঃস্ফূরিত হচ্ছে। বিদ্যা মায়ার খেলা ঊর্দ্ধে। ঊর্দ্ধ দিকে তার গতি আছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই আমরা অবিদ্যা মায়ার খেলায় মেতে যাই। বিশ্বের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ পাওয়ার জন্য ইন্দ্রিয়গুলো পাগল হয় এবং শেষে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়ি। তাইতো আমরা সেই বিরাট সত্তাটিকে হারিয়ে ফেলি। সুতরাং সেই বিরাট সত্তাটাকে পেতে হলে আমাদের নিম্নমুখী গতিটাকে নষ্ট করতে হবে। কারণ আমরা তা থেকে কিছুই পাব না। একটু দূরে গিয়ে সেগুলো আমাদের শেষ হয়ে যাবে। ইন্দ্রিয়গুলো একত্র বাস করছে বটে, যেমন একসঙ্গে দুটো চোখ, দুটো কান, দুটো নাক, দুটো জিভ ইত্যাদি পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় একজায়গায়, এক পাড়াতেই বাস করে। কিন্তু ওদের পরিবেশ পশুপক্ষীর পরিবেশের মত। কেউ কারোর সাহায্য করে না বা কেউ কারো প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। চোখ যদি শ্রবণেন্দ্রিয়কে বলে যে, চোখে বালি পড়েছে, খস্‌খস্ করছে, তার কাজটুকু কান যেন করে দেয়। কিন্তু কাণ পারবে কি? পারবে না। তাই ইন্দ্রিয়গুলো এক পাড়াতে বাস করছে বটে কিন্তু

কেউ কারো প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয়। সুতরাং এরূপ ইন্দ্রিয়গণের অধীন হয়ে যদি আমরা চলি তবে আমাদের গতিও অতি নীচের দিকে চলে যাবে।

প্রশ্ন ঃ সদ্‌গুরু লাভ হলে তিনি কি করেন?

উত্তর ঃ সদ্‌গুরু লাভ হলে তিনি ভেদটা বলে দেন। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়ে দেন সুখে তুমি সুখী নও। ইন্দ্রিয়সুখ তো একটু পরে শেষ হয়ে যাবে। চোখ রূপ দেখছে, কত দেখবে, একটু পরে ক্লান্ত হয়ে ফুরিয়ে যাবে। তার দেখার আকাঙ্খা নষ্ট হয়ে যাবে। কাণ শব্দ শুনছে। কিন্তু সে কি অনবরত শব্দ শুনতে পারে? তারও বিপর্যয় ঘটবে। এই হিসাবে ইন্দ্রিয়গুলো সীমিত; পরমায়ু নেই বেশীদিন। সেজন্য আমাদের বিরাট সত্তাতে যেতে হলে ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করতে হবে। তুলসীদাসের একটা দোহা আছে।

"সদ্ গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ।
তও কয়লা কি ময়লা ছুটে যও আগ করে পরবেশ।।'

—অর্থাৎ সদ্‌গুরু ভেদ বাতিয়ে দেন। ইন্দ্রিয় সুখ এবং ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সুখের কথা তিনিই বুঝিয়ে দেন। ইন্দ্রিয় সব সময় প্রেয়কেই চায়।* সাধারণতঃ একটু তৃপ্তি, আনন্দ চায়। কিন্তু একটু পরে সে শেষ হয়ে যাবে। যা লাভ করলে মানুষের শ্রেয় হয়, তার জন্ম সার্থক হয় সেটা ইন্দ্রিয়দ্বারা লাভ হয় না। ইন্দ্রিয়কে ত্যাগ করে যেতে হয়। সদ্‌গুরু এই উপদেশ, এই জ্ঞানদান করেন। কয়লাতে আগুন প্রবেশ করলে যেমন কয়লার ময়লা নষ্ট হয়ে যায় তেমনি মানুষের যখন জ্ঞানের উদয় হয় তখন কয়লার ময়লার মত ভ্রান্তিটাও ছুটে চলে যায়।

**ভাবার্থ— প্রেয় হইল যাহা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা আপাত মধুর এবং আপাত সুখকর, কিন্তু পরিণামে ভয়াবহ। ইহার দ্বারা জীবনে কখনও কোনদিন শাশ্বত শান্তির সন্ধান মিলে না। শাশ্বত শান্তি একমাত্র শ্রেয়ের পথেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু প্রেয় যাহা তাহা সহজলভ্য হওয়ায় ইহার প্রতি মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই গভীর অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণ বারংবার শ্রেয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রেয়কেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন কারণ শ্রেয় প্রেয়ের দ্বন্দ্ব চিরদিনের, চিরকালের। জ্ঞানী ব্যক্তি আপাত রমণীয় প্রেয়কে পরিত্যাগপূর্বক শ্রেয়কেই গ্রহণ করেন। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—*

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়োমন্দো যোগ-ক্ষেমাদ্ বৃণীতে।।"

— কঠোপনিষৎ ১।২।২

থাকে না। এই ভ্রান্তিতেই বিশ্বখেলা করছে, আর আমরা সকলে সেই খেলায় মেতে আছি। যশ, খ্যাতি প্রতিপত্তি, ধন, জন, জীবন যৌবন এই নিয়ে খেলা করছি। কিন্তু এটার জন্য তো আমরা আসিনি। এর জন্য তো পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবলে পড়তে হবে। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, কিছুদিন মায়ের কোলে থাকে। পরে যখন তার মুখে ভাষা ফোটে তখন সে মাকে জিজ্ঞাসা করে— মা, এটা কি? ওটা কে, সে কে? ইত্যাদি। এই জিজ্ঞাসাবাদ পশুপক্ষীর আসে না। মানুষেরই এসেছে। মানুষ এই বিরাট বৈচিত্র্যময় জগৎটাকে জানতে চায়। সে এই বিরাট বিশ্বে সত্যের অনুশীলন করতে চায়। ক্রমে সেই মানব শিশুই পরিণত হয়ে জানতে চায়— আমি কে? কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, কেন এসেছি, কি উদ্দেশ্য, কি পাব, কি পেয়েছি ইত্যাদি। এই সমস্ত বিভিন্ন জিজ্ঞাসা যখন মনে উদিত হয় তখন একমাত্র সদ্‌গুরুই এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে তাকে বিরাটের পথে নিয়ে গিয়ে বিরাটের বোধে প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

অর্থাৎ শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ই মানুষের কাছে সমুপস্থিত হয়। জ্ঞানী শ্রেয় এবং প্রেয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া প্রেয় পরিত্যাগপূর্বক শ্রেয়ই গ্রহণ করেন। আর অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানব বিচার শক্তির অভাবে প্রেয়বস্তুকেই প্রার্থনা করে। সুতরাং এই শ্রেয় এবং প্রেয়ের মধ্যে কোনটি কল্যাণপ্রদ, মনুষ্যজীবনে যথার্থ শ্রেয়স্কর কোনটি তাহা নির্ণয় করা মূঢ়, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। একমাত্র সাধনসিদ্ধ সদ্‌গুরুই তাহার নির্দেশ দিতে সক্ষম। তিনিই মনুষ্যকুলকে প্রেয়ের ভয়াবহ পরিণতির কথা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া তাহাদের শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করেন। তিনিই প্রেয় হইতে শ্রেয়ের এই ভেদ দর্শন করাইয়া দেন। বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে জীব সদ্‌গুরু লাভ করিয়া তাঁহারই নির্দেশে শ্রেয় সাধনে তৎপর হয় এবং তদনন্তর প্রকৃত শ্রেয়কে যখন প্রাপ্ত হয় তখন বুঝিতে পারে যে ইহা ত্রিভুবনের সমস্ত প্রেয়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। তাই উপনিষদে আছে— "প্রেয়পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ"— (বৃহঃ উপনিষদ ১।৪।৮) অর্থাৎ ব্রহ্ম পুত্রের অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, অন্য সমস্তের অপেক্ষা প্রিয়। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের যুগান্তকারী ঘটনা হইল যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই পত্নী ছিল। তাঁহারা হইলেন মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। বাণপ্রস্থ অবলম্বনকালে ঋষি দুই স্ত্রীকে বহু ঐশ্বর্য্য দিয়া যান। তখন মৈত্রেয়ী তাহা না লইয়া বলিয়াছিলেন— "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" অর্থাৎ যাহাতে আমি অমরত্বলাভ করিতে না পারিব, তাহা লইয়া কি করিব? যাজ্ঞবল্ক্য তখন মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায়

পতি প্রিয় হয়, জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় বিত্ত প্রিয় হয়। অতএব এই আত্মাই সর্ববস্তুতে পরিব্যাপ্ত, সর্ববস্তুতে অনুস্যূত এবং সর্বদা সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান।

"ততঃশ্রুতিস্তন্মননং সতত্ত্বধ্যানং চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনেঃ।
ততোঽবিকল্পং পরমেত্যবিদ্বানিহৈব নির্বাণসুখং সমৃচ্ছতি।।"

— (বিবেকচূড়ামণি)

মোক্ষপরায়ণ পুরুষ প্রথমে শ্রুতিবাক্যদ্বারা আত্মশ্রবণ, যুক্তিদ্বারা আত্মতত্ত্বের মনন এবং নিরন্তর অবিচ্ছেদে আত্মতত্ত্ব ধ্যান করিবেন। পরিশেষে যখন চিত্ত বিকল্পরহিত হইবে তখনই সেই বিদ্বান পুরুষ এই লোকেই মোক্ষসুখ লাভ করিতে পারিবেন।

সুতরাং মুমুক্ষু জীবের, সমস্ত প্রেয়বস্তুর অন্তরালে সর্বানুস্যূত যে আত্মা রহিয়াছেন তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সদ্‌গুরু নির্দেশিত পথে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। গুরুই এপথের একমাত্র দিশারী। তাঁহাকে ছাড়া, তাঁহার কৃপা ছাড়া ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সুখের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। জীবনে, মরণে তাঁহার নির্দেশিত পথে অনুগমনের দ্বারাই আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত হইতে পারে।

প্রশ্ন ঃ জগৎগুরু মানে কি?

উত্তর ঃ জগৎগুরু জগতের গুরু। সেও বিরাট। একই কথাকে High করে (ব্যাপক ভাবনা, বোধ করে) বলা হচ্ছে। সৎ বা সত্যতে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই হচ্ছে সদ্‌গুরু। গুরু মানেই হচ্ছে বিরাট। প্রকৃত অর্থে তিনি দেহধারী নন। কোন সংকীর্ণতা ভেদবুদ্ধি নেই সেখানে। যদি কিছু ভেদবুদ্ধি থাকে, সংকীর্ণতা থাকে তবে সেটা ঠিক ঠিকভাবে প্রকৃত সত্যের অনুশীলন করা হল না। এজন্য আমাদের গুরুবাদটাকে কেউ ওলটপালট করতে পারে না। একই মন্ত্র, একই আচরণ করে সকলেই সেই কূটস্থে মন স্থির করে। সেখানে আঙ্গুল ঠেকিয়ে, মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানায় যে প্রভু! আমাকে রক্ষা কর, একর, ওকর, এমন কত রকম ভাষা আছে তার কি কিছু ঠিক আছে? আমরা অনেক সময় বলি— আমার ভাগ্যে যা আছে, আমার কপালে যা আছে তাই হবে। এর অর্থ হল এই কপালটা আমাদের উর্দ্ধদেশ। এখানে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করে চলতে হবে। সেজন্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে সেই গুরুপদে মতি দেওয়া। মানে সেই বিরাটের দিকে যাওয়া। সৎই গুরু।

ভাবার্থ ঃ *গুরু দেহধারী নন অর্থাৎ তিনি গগনসদৃশ বা আকাশবৎ। ইহা তাঁহার নির্গুণ নিরাকাররূপ। এই নির্গুণ নিরাকাররূপের মধ্যে যখন অনুকম্পার স্পন্দন জাগে তখন তিনিই 'সংসারিণঃ পুরুষানউদ্ধরিষ্যামি' সংকল্প লইয়া জীবজগতের প্রয়োজনে গুরুরূপে সগুণে সাকারে প্রকটিত হন। যুগপ্রয়োজনে গুরুপরম্পরাক্রমে তিনি আবির্ভূত হন। তাই দেহই গুরু নহে। দেহ অবলম্বন মাত্র। চৈতন্য সত্তাই গুরু।* সেই মূল চৈতন্যসত্তা দেহকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হন। এই চৈতন্যসত্তার ষোল আনা বিকাশ সর্বত্র ঘটে না। কোথাও দুই আনা, কোথাও চার আনা, কোথাও বা ছ'আনা। সেই চৈতন্যসত্তার যেখানে ষোল আনা বিকাশ সেই দেহেই গুরুর অধিষ্ঠান হয় এবং সেই দেহই তখন প্রণম্য। সাধকের প্রথম ধ্যানের অবলম্বন গুরুমূর্তি। ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থায় গুরুর মর্ত্যরূপ (স্থূলরূপ) যখন লুপ্ত হয় তখন আবির্ভূত হয় নির্গুণ জ্যোতির্ময়-রূপ। ধ্যানভঙ্গ হইলে প্রাকৃতভূমিতে আবার নির্গুণ নিরাকাররূপেরই প্রতিরূপ সগুণ, সাকার দেহধারী গুরুরূপ।*

**বিশদ অর্থ— জীব যখন এরূপ বোধ করে যে, নিজ জ্ঞানবলে এবং শাস্ত্র অধ্যয়নাদি দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে কিংবা সমধর্মী কোন লোকের জ্ঞানের দ্বারাও কিছুতেই তত্ত্ব উন্মেষ হইতেছে না, কিছুতেই প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে না, সন্দেহ দূরীভূত হইতেছে না, কিছুতেই তত্ত্ব অধিগত হইতেছে না বা সব কিছু করা হইল অথচ জীবনের কৃতকৃতার্থতা আসিল না, অমরত্বের আস্বাদন পাওয়া গেল না বা অভয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না, এইরূপ ভাবের দ্বারা সে যখন একান্ত বিব্রত হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকে তখন ভগবান আর স্থির থাকিতে পারেন না। তাঁহার মধ্যে অনুকম্পা জাগে। তখন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে দয়াময় প্রভু গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আবার যখন কোন দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের অধিকাংশ এইরূপ ভাবের দ্বারা আকুল হইয়া পড়ে তখনই তিনি জগদগুরুরূপে, ঋষিরূপে, ধর্মপ্রতিষ্ঠাতারূপে মনুষ্যদেহে প্রকটিত হইয়া সত্যের সমুজ্জ্বল আলোকে জীবজগৎকে ধন্য করিয়া থাকেন।*

স্বয়ং ঈশ্বরই পরমগুরু। তিনি জীবোদ্ধারের সংকল্প লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তিনিই গুরু পরম্পরার ভিতর দিয়া সম্প্রদায় আশ্রিত শিষ্যমণ্ডলীকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ব্যাসদেবই গুরুশক্তির প্রথম অবতার। জ্ঞানশক্তির প্রথম ধারক স্বয়ং ব্যাসদেব। তাহার পর পরম্পরাক্রমে অনেক যোগ্য আধারে গুরুশক্তির বিকাশ ঘটে। গুরুশক্তির ধারক বা বাহক হওয়ার সৌভাগ্য সকলের নাই। একমাত্র চিহ্নিত আধারেই গুরুশক্তির অবতরণলীলা ঘটে। গুরুশক্তির এই অবতরণ গুরুপরম্পরাক্রমেই ঘটিয়া থাকে। একগুরু বা আচার্য্য হইতেই গুরুশক্তির অবতরণ ঘটিয়া পরে তাহা বিস্তৃত বা প্রসারিত হয়। গুরুশক্তির প্রকাশ বা বিকাশের

জন্যই সদ্‌গুরুর আগমন। তাঁহার (ঈশ্বরের) অমোঘ সংকল্প যোগ্য ব্যষ্টি আধারেই প্রকাশিত হয়। তিনি যাঁহাকে নির্বাচন করেন তাঁহার ভিতরই গুরুশক্তির মহিমা ফুটিয়া ওঠে। ঈশ্বরের সংকল্প যে যোগ্য আধারে রূপায়িত হয় তিনিই হন সদ্‌গুরু। তিনিই নরাকার পরব্রহ্ম। এই গুরুতে যথা ভগবদ্‌বুদ্ধি না হইলে শিষ্যের কখনও জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। এই গুরুর প্রতি যত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় শিষ্য ততই গুরুকৃপালাভে চরিতার্থ হন। জ্ঞানলাভের জন্য শিষ্যকে ধীর, স্থির, শুশ্রূষু, বিনীত ও আদেশ পালনে উদ্যত এই পঞ্চ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তবেই জ্ঞান সহজলভ্য হইবে। সত্য বলিতে কি— শিষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধ হইলেই যে সব লাভ হয় আজ তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শিষ্যত্বের সাধনায় যাঁহারা সফলকাম হইয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন উপনিষদের যুগের সত্যকাম, উপমন্যু, আরুণি, বেদ, কৌৎস প্রভৃতি মহর্ষিগণ। তাই বলি, শিষ্যত্বের সাধনা করিতে হইলে হৃদয়ে গুরুর আসন রচনা করিয়া প্রাণে প্রাণে তাঁহাকে অনুভব করিতে হইবে। "আত্মাবৈ গুরুরেকঃ" ইহা শাস্ত্রের বাণী। মনুষ্য অবয়ব সংস্থানের মধ্যে দ্বিদল আজ্ঞাচক্রেই এই আত্মা বা গুরুর অধিকতর প্রকাশ হয়। মনের স্বস্থান হইল ঐ দ্বিদলপদ্ম। দেহাভ্যন্তরে ভ্রূমধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) তিনি স্ব মহিমায় নিত্যবিরাজিত।

প্রাণক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে কূটস্থে স্থাপন করিতে পারিলে প্রাণে প্রাণে তাঁহাকে অনুভব করা যায়। মন যদি কোনপ্রকারে সেই ধামে একবার প্রবেশ করিতে পারে তবে তাহার আত্মবিস্মৃতি ছুটিয়া যায়। জীবের মোহনিদ্রা ভাঙাইবার জন্য ঈশ্বরই সদ্‌গুরুরূপে আসিয়া দেখা দেন। এই গুরুর নিকট সাধকের প্রাণ স্বতঃই নমিত হইয়া পড়ে। অধ্যাত্মপথে একমাত্র গুরুই দিশারী। এইরূপ গুরুর অবলম্বন বিনা সাধক জীব কোন প্রকারেই অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। গুরু শিষ্যকে পথ দেখাইয়া দেন ও শিষ্যকে তদনুকূলে সাধনা করাইয়া লন। গুরুকে অবলম্বন করিয়া শিষ্যকে সাধনা করিতে হয়। শিষ্যের সাধনা ভিন্ন শিষ্যের অন্তরে গুরুর গুরুত্ব প্রতিভাত হয় না। গুরু মুক্তির পথ ও তাহার উপায় বলিয়া দেন। গুরু নির্দেশিত পথে সাধনা করিয়া শিষ্যও মুক্ত হইয়া যান। কাহারও মুক্তি কেহ করিয়া দেন না বা দিতে পারেন না। তবে যাঁহারা সর্বস্ব গুরুতে সমর্পণ করিয়া, সমস্তভার গুরুর উপর দিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র এবং জগতে এরূপ মহাপুরুষ অতি বিরল। তবে সে সকল ক্ষেত্রেও শিষ্যের অজ্ঞাতসারে গুরু মুক্তির অনুকূল কার্য্যগুলি করাইয়া লন। কিন্তু গুরুর এমন মহিমা যে, সমর্পিত প্রাণ শিষ্য বুঝিতে পারে না যে সে সাধনা করিতেছে।

প্রত্যেক জীবহৃদয়ে গুরুরূপে তিনি নিত্য বিরাজিত। তিনি অন্তর্য্যামী চিন্ময় মহাপুরুষ। যতদিন জীব এই হৃদয়স্থ গুরুর সন্ধান না পায়, ততদিন প্রকৃত শান্তির কেন্দ্র খুঁজিয়া পায় না। বাহিরের মনুষ্যমূর্তি গুরু যতদিন বিজ্ঞানময় মহেশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত না হন, ততদিন যথার্থ গুরুলাভ হয় না। গুরুলাভ হইলে জীবের

আর ভয় না থাকায় মুক্তি সুনিশ্চিৎ।

গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা উপদেশ পাইলেই গুরুলাভ হইল এরূপ মনে করা ঠিক নয়। গুরু যতদিন 'আমার' না হন একান্ত আত্মীয়, প্রাণের প্রাণ, যতদিন না তিনি হন একান্ত অন্তরঙ্গ ততদিন গুরুলাভ হয় না। যথার্থ গুরুলাভ হইলে শিষ্য অনসূয় হয় অর্থাৎ গুরুর দোষ দর্শনে অন্ধ হয়। গুরুর প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক ইঙ্গিতই তখন মহান উদ্দেশ্যপূর্ণ ঐশ্বরিক কার্য্য বলিয়া শিষ্যহৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাই ব্যবহারিক জগতেও গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বররূপে দর্শন করা কর্তব্য। গুরু যেমনই হউন না কেন, তিনিই আমার ইহকাল পরকালের একমাত্র গতি, তিনিই সমগ্র জগতের, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্তা। শুধু আমার প্রতি কৃপাপরাবশ হইয়া মনুষ্যমূর্তিতে বিরাজমান। নরাকার পরব্রহ্মস্বরূপ যে গুরু তাঁহাকে নমস্কার।

যথার্থ গুরুলাভ হইলে অর্থাৎ গুরুপদিষ্ট উপায়ে প্রাণকে কুটস্থে স্থিতি করিতে পারিলে সাধক আমি হারা হইয়া যায়। তখন অনুভব হয় "আত্মাবৈ গুরুরেকঃ।" ভগবান ব্যতীত আর কাহারও গুরু হইবার অধিকার নাই। মনুষ্যদেহ গুরুর আসনমাত্র। যেরূপ শালগ্রাম শিলা যে সিংহাসনে থাকে, সেই আসনখানাও প্রণম্য অর্থাৎ আমাদের পূজ্য সেইরূপ যে দেহ আশ্রয় করিয়া গুরুশক্তি প্রকাশিত হয়, সেই দেহটিও আমাদের পূজ্য। গুরু একজন। তাই কেহ কখনও কাহারও গুরুনিন্দা করিও না। কারণ তোমার গুরু, আমার গুরু পৃথক নহেন। বৈষ্ণব, শাক্ত শৈব প্রভৃতি বাহ্য আবরণগুলি গুরুর ভেদক চিহ্ন নহে। যেরূপ সকল কাঁচ আধারের মধ্যে একই বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে, কেবল আধারগত, বর্ণগত বৈচিত্র্যবশতঃ আলোর বিচিত্রতার উপলব্ধি হয় সেইরূপ একই গুরু বিভিন্ন আধারে অবস্থিত হইয়া বিভিন্ন অধিকারীর মঙ্গলের জন্য বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

গুরুলাভ হইলে শিষ্যের কর্তব্য কি তাহা প্রত্যেক অধ্যাত্মপথযাত্রী শিষ্যের জানা বিশেষ কর্তব্য। শাস্ত্রে আছে গুরুলাভান্তে শিষ্যকে তনু, মন, ধন ও বাণী এই চারটি যথাসম্ভব শ্রীগুরুচরণে অর্পণ করিতে হয়। সর্বতোভাবে গুরুর আদেশ পালনের জন্য দেহটি গুরুচরণে অর্পণ করার নাম 'তনু' অর্পণ। গুরুকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বররূপে দর্শন করার নাম 'মন' অর্পণ। শাস্ত্রে আছে 'সর্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ' অর্থাৎ শিষ্যের যাবতীয় অর্থ-সম্পদ গুরুকে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ গুরুর সেবাপূজাদির ফল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই। শুধু মৌখিক ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তোমার প্রাণ সংসারের নশ্বর বস্তুতে আসক্ত হইয়া আছে। সেই সমগ্র প্রাণটা তুলিয়া লইয়া শ্রীগুরুচরণে অর্পণ করিতে হইবে। সর্বদা গুরুর গুণ-গান করার নাম 'বাণী' অর্পণ। এইগুলি যথাযথভাবে করিতে পারিলে শিষ্যের কর্তব্য শেষ হয়। তখন গুরুর কর্তব্য আরম্ভ হয়। শিষ্য যতদিন না মুক্ত হইতে পারে ততদিন গুরুর মুক্তি নাই, বিশ্রাম নাই। বড় ভীষণ দায়িত্ব।

প্রশ্ন ঃ সদ্‌গুরু, জগৎগুরু কি একই?

উত্তর ঃ গুরু এক কথা। গুরু মানে সেই বিরাট। তার জগৎ কি, সৎ কি, অসৎ কি? তার ভিন্ন ভাব নেই। বন্ধু, পিতা, মাতা রূপে তিনিই এক। শুধু ভাষা ভিন্ন, ভাব এক। সেজন্য গুরুবাদ, গুরুগ্রন্থ এক। রকমারি নেই। শুধু ভাষার খেলা।

প্রশ্ন ঃ শঙ্করাচার্য বলেছেন— 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'— এ কথার অর্থ কি?

উত্তর ঃ গম্ ধাতু থেকে জগৎ হয়েছে। যা গতিশীল, যা চলে যাচ্ছে যার কম্পন হচ্ছে তা মিথ্যা। আজকে শিশু আছি, কালকে যুবক হয়েছি, দুদিন পরে বার্দ্ধক্য এসেছে, তাতে স্থবিরত্ব এসেছে, এগুলো মিথ্যা। যশ মান, খ্যাতি প্রতিপত্তি যা কিছু দেখছ সবই গতিশীল। এগুলো কিছু নয়। আমার অট্টালিকা, আমার ঘর, আমার ঐশ্বর্য বলি, কিন্তু আমি তো অট্টালিকা নই, আমি তো ঘর নই। আমার ঐশ্বর্য হতে পারে কিন্তু আমি তো নই ওটা। এইভাবে যখন আমরা বিচার করব তখন দেখা যাবে যে ভোজবাজী ছাড়া কিছুই নেই। একটা ভ্রান্তির খেলা খেলছি মাত্র। এ খেলাতে না পাই শান্তি, না পাই তৃপ্তি। কিছুই পাইনে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন গুরু শিষ্যকে কি জিনিষ দিয়া থাকেন?

"একমপ্যক্ষরং যং তু গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ দ্রব্যং যদ্ দত্ত্বা সোহনৃণীভবেৎ।।"

—অর্থাৎ গুরু শিষ্যকে এক অদ্বিতীয় অক্ষর পুরুষে প্রবোধিত করেন। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ নাই যাহা তাহার বিনিময়ে অর্পণ করিয়া শিষ্য অঋণী হইতে পারে। গুরু শিষ্যের মঙ্গলের জন্য নিজে মরিয়া শিষ্যকে বাঁচান। যে ব্রহ্মানন্দে অবস্থান করিলে জগৎ বলিয়া, শিষ্য বলিয়া কোন কিছু থাকে না, সেই ব্রহ্মানন্দ হইতে নীচে অবতরণ করিয়া থাকেন। শিষ্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সেই আনন্দ তাহাদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাহাতেই তাঁহার সুখ। নিজ সুখ আনন্দ অপরের মধ্যে বিতরণে উন্মুখ তাঁহারা। তাই গুরুকে 'পরমসুখদং' বলা হয়। শুধু তাহাই নহে। শিষ্যের যত কিছু মলিনতা, পাপ, তাপ সব নিজে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পবিত্রতা বা পুণ্যের উজ্জ্বল আলোকে শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। এইরূপ গুরুর প্রতি তদ্‌গত ও নিবেদিত প্রাণ শিষ্যের সর্বপ্রকার তাপ ও জ্বালার অবসান হইয়া যায়। গুরুকৃপার আলোকে সমস্ত তত্ত্ব শিষ্যের নিকট পরিস্ফুট হয়। ত্রিভুবনে তাহার অপ্রাপ্য কিছু থাকে না। তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"যস্য দেবে পরাভক্তি যথাদেবে তথাগুরৌ—
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মজ্ঞি।।"

অর্থাৎ যাঁহার গুরুতে ঈশ্বরজ্ঞান আসিয়াছে, যিনি গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানেই ভক্তি করিতে পারেন, একমাত্র তাঁহার নিকটই গুরুপদিষ্ট সাধনের ও গুঢ় রহস্যের যথার্থ তত্ত্ব উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে।

এইভাবে আমাদের জন্ম জন্মান্তরের খেলা চলেছে। এইরূপ ক্ষুদ্র বোধে ক্ষুদ্রভাবে কায়াতে মেতে গিয়ে কায়ার মায়াতে মত্ত হয়ে আমি আমাকে হারিয়ে ফেলেছি।*

সেইজন্য আমাদের এই নামরূপে পরপারে যেতে হবে। এই নামরূপের পরপারে না গেলে অনাদি অনন্ত কাল ধরে এই ভুলের মাশুল বইতে হবে।

ভুলের মাশুল দিতে হবে সবে, হউক যত বলীয়ান।
ভুলের হস্তে পড়েছে যেজন, নাহি তার পরিত্রাণ।।

জীবনের পর জীবন কেটে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে কেও বলতে পারবে না কোথায় যাচ্ছে। সবাই ছুটছে। ছেলের পিছনে ছুটছে মা, বাবা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। ছেলেও ছুটছে তার ছেলের পিছনে তার ছেলেও ছুটছে। এইভাবে কেউ কাউকে ধরা দিচ্ছে না। যে যার গন্তব্যস্থলে উন্মাদ হয়ে ছুটছে। এইভাবে সকলের মিথ্যার খেলায় মেতে যাচ্ছে। সেজন্য জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। যে সত্তাতে শ্রদ্ধা দিলে, ভক্তি দিলে, প্রেম দিলে সবই পাওয়া যায় এবং বিরাটে পৌঁছবার একটা আধার তৈরী হয় সে সত্তা আমরা হারিয়েছি। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ছাড়া বড় কেউ আছে, আপনজন বলতে কেউ আছে সেই ধারণাই অনেকের নেই। আমরা কি এই করতেই এসেছি না এই করে আমাদের জন্ম সার্থক হবে? এই তো আমি আছি, দুদিন পরে আমিও চলে যাব। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, আত্মীয় পরিজন কখন চলে যাবে। এই অনিত্য বস্তুকে নিয়ে আমরা যদি বিভ্রান্তির পথে ছুটে বেড়াই তাহলে এতবড় মনুষ্য জন্মটায় কি করলাম আমরা। এই ভ্রান্তি মোচন করবেন কে? একমাত্র গুরুই করবেন। গুরুই দেখিয়ে দেবেন যে এই ভুলের পথে তোমরা ছুটেছ। সেইজন্য বেদান্তের একমাত্র বাণী হল ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।

**ভাবার্থ— কায়া অর্থাৎ দেহ। এই দেহের মায়াতে আমরা আবদ্ধ হইয়াছি এবং আমি আমাকে অর্থাৎ আপন স্বরূপকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। বেগবান অশ্বকে ফিরাইতে হইলে তাহার বল্গা আকর্ষণ করা ব্যতীত স্তব, স্তুতি, ভালবাসা বা আনুগত্য স্বীকারের দ্বারা যেমন তাহা সম্ভব নয় সেইরূপ আমি দেহ রথের রথী। আত্মা বা অহং দুর্বার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে সংযত করিতে না পারিলে আমার দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ বাসনা নিবারণ হইবে না। আমিটা কে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, অহং আমি। সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ আত্মাই আমি। সাধারণতঃ আমি বলিলে দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, জনম-মরণ ধর্মী সুখ দুঃখে চঞ্চল একটি সংসারক্লিষ্ট জীবমাত্র বুঝিয়া থাকি। সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি "আমার দেহ"। ইহাতে দেহ হইতে আমি পৃথক একজন, ইহা অনুভব করি। আমার সত্তায় দেহের সত্তা। আমি দেখিতেছি, তাই দেহ আছে। আমি দেহ নই, আমাতে দেহ আছে। এইরূপে আমার দেহ হইতে 'আমি'কে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারি। আমার প্রাণ, আমার মন, আমার জ্ঞান, আমার আনন্দ এই শব্দগুলি আমরা*

বলিয়া থাকি। ইহা হইতে আমরা দেহ হইতে পৃথক, প্রাণ হইতে পৃথক, মন হইতে পৃথক, আনন্দ হইতে পৃথকরূপে একটি 'আমি'র সন্ধান পাই। এই 'আমি'ই দেহাদি পাঁচটি আবরণের ভিতর দিয়া অভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। আমার বাড়ীটাকে যেমন 'আমি বাড়ী' বলিয়া বুঝি না, সেইরূপ 'আমি দেহ' 'আমি মন' এইরূপ প্রতীতিও আমাদের কখনও হয় না। দেহাদি হইতে পৃথক ঐ 'আমি'র স্বরূপটি যদি বলিতে বা বুঝিতে যাই, তাহা হইলে বলিব বা বুঝিব যে ইহা অচিন্ত্য অব্যক্ত সর্বেন্দ্রিয় অগম্য কিন্তু সত্য। চিন্তা করিয়া 'আমি'কে ধরিতে পারি না। বাক্য দ্বারা বলিতে পারি না। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু সেই জিনিষটি সে সত্যই আছে তাহা বুঝিতে পারি। কোনরূপেই 'আমি' নাই ইহা প্রতীতিগোচর হয় না। এই যে সত্য 'আমি' ইহা আমরা সর্বদাই উপলব্ধি করি অথচ বুঝিতে পারি না। সৎ-চিৎ আনন্দই ইহার স্বরূপ। সৎ একটি সত্তা। বলিতে পারি একটা কিছু আছে। তাহা চিৎ অর্থাৎ ঐ সত্তাটি চৈতন্যময়। আর সেই যে আছে বলিয়া একটি প্রতীতি হয় উহা শুধু সত্তা মাত্র নহে। উহা চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং ঐ জ্ঞানময় সত্তাটি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। আমি বুঝিতেছি যে 'আমি' আছি। ঐ 'আমি'টি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু। অতএব আনন্দময়। এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাই 'আমি'। এই 'আমি'ই সত্য। এই 'আমি'তে জন্ম-মৃত্যু, সুখঃদুঃখ, হাসি-কান্না কিছুই নাই অথচ পূর্ণ আনন্দ আছে। তাই গুরুদেব বলিয়াছেন 'কায়ার মায়াতে মত্ত হয়ে আমি আমাকে হারিয়ে ফেলেছি' অর্থাৎ আমি দেহাত্মবুদ্ধিতে মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। 'আমি বস্তুত দেহ নহি। 'আমি' হইলাম আমার অভ্যন্তরস্থ সেই শুদ্ধ চৈতন্য। দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট। অর্থাৎ আমি আমার জ্ঞানটা সেই চৈতন্যস্বরূপ 'মহাআমি'র অধ্যাস অর্থাৎ আভাসমাত্র। 'ছায়ার ছায়া তস্য ছায়া'।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মাত্র আট বৎসর বয়সে ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ করতঃ বেদান্ত অভ্যাসের নিমিত্ত বর্ত্তমান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নর্মদাতীরে গুরুশ্রীমদ্ গোবিন্দপাদের নিকট গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। গুরু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—

"মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো—
মুখত্বাৎ পৃথকত্বেণ নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জাবোহপি তদ্বৎ
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহ হ মাত্মা।।"

দর্পণে দশ্যমান মুখভাসক বস্তুটির (প্রতিবিম্বের) অস্তিত্ব মুখত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে। অন্তঃকরণে (ধী-তে) চিদাভাসক চৈতন্যস্বরূপআত্মার অবভাসক প্রতিচ্ছায়া জীবও তদ্রুপ। সেই নিত্যোপলব্ধি স্বরূপ আত্মাই আমি। অর্থাৎ দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায় । মুখ হইতে উহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। প্রতিবিম্বতো কেবল দৃশ্যমান বস্তুমাত্র। এবং যতক্ষণ দর্পণের সম্মুখে থাকে ততক্ষণই উহা দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রীয় ভাষায় বিশ্বস্বরূপ মুখ তো সর্বদা আপন স্বরূপেই

প্রশ্ন ঃ তাহলে যা গতিশীল, যা পরিবর্তনশীল তাই মিথ্যা?

উত্তর ঃ সত্য, এটা ধ্রুব সত্য। বিশ্বটা এভাবেই খেলছে। জগতের দিকে তাকিয়ে কি হবে? চৈতন্য সত্তার দিকে তাকাও। জগতে যে চৈতন্য সত্তাটা খেলছে, চিন্ময়ী মা* আমার খেলছেন, সেই চিন্ময়ী মায়ের দিকে লক্ষ্য করে চল দেখবে সবই তার খেলাঘরে তিনি খেলছেন। কিন্তু এই খেলাটাকে আমরা অনুভব করতে পারছি না। আমরা ক্ষুদ্রকে অনুভব করে ভ্রান্তির ভাব নিয়ে কি যে বলছি তা বুঝি না।

বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপে আত্মার প্রতিবিম্ব অন্তঃকরণে পতিত হইলে উহাকে জীব বলা হয়। সেই নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মাই অমিত্বের পরিচয়। পুনশ্চ

"এই আমি কি সেই আমি কি আর কোথা কেউ আমি আছে—
আমি আমি সবাই বলে, আমার তত্ত্ব কে পেয়েছে?"
"যে বলে আমি আমি, সেওতো জানেনা 'আমি'
কেবল কেনা বদনামী, নয় আমি কয় কথা মিছে—
ঘুরচে আমি আমার কাছে, সই দিয়ে তা কে নিয়েছে?
যে কেউ পেয়েছে 'আমি' অহং তত্ত্ব তার গিয়েছে।
ব্রহ্মাণ্ড জোড়া আমি, ভিতরে আমি বাহিরে,
আমি হয়ে জগৎস্বামী, এ জগৎ সৃজন করেছে।
ভাঙ্গচে আমি গড়চে আমি
হাঁসছে আমি কাঁদছে আমি,
আমিকে খুঁজতে আমার
হাটে মামা হারিয়ে গেছে।" (সুদীন)

ভাবার্থ— সেই চিন্ময়ী মা কে? কিভাবে তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে? শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলিতে হয় যে "সত্ত্বরজস্তমষাং সাম্যাবস্থাং প্রকৃতি"। বৈষম্যই মায়া। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ ক্রিয়াশীল হইলে সৃষ্টি হয়। সাম্যাবস্থা হইল প্রকৃতি। বাহ্য প্রকৃতিই মায়া। ইহাতে দুঃখের, ছায়াবাজীর অভিনয় হয়। জগতের অভ্যন্তরস্থ পরা প্রকৃতিই মহামায়া। এই আদ্যাশক্তি মহামায়াই জীবকুলকে সুখদুঃখের অভিনয় করাইয়া থাকেন। এই জগৎরূপ অভিনয়-মঞ্চে, খেলাঘরে খেলাদিয়া জননী মহামায়া ধীরে ধীরে আপন সন্তানগণকে জ্ঞান শিক্ষা দেন আবার শেষে কোলে তুলিয়া লইয়া পূর্ণ সুখ প্রদান করিয়া পূর্ণব্রহ্মকে দেখাইয়া দেন। মহামায়া নিজেই পূর্ণব্রহ্ম হন। সূর্য যেমন ঊষাকে বক্ষে টানিয়া আত্মস্থ করেন, তেমনি মহামায়া সৃষ্ট জীবকুলকে লইয়া আত্মস্থ করিয়ালন। সূর্য ও ঊষা যেমন ক্রমে অভিন্ন হইয়া যায়। তেমনি জননী ও সন্তানও অভিন্ন।

মহামায়া আদ্যাশক্তি আদিভূতা সনাতনী। তিনিই জগতের মূল। ইনি সর্বত্রই

চৈতন্য শক্তিরূপে বিরাজমানা। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মচৈতন্য পরব্যোমময় হইয়া আছেন। আর একটি কার্যকরী চৈতন্যশক্তি সমস্ত বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন। এই চৈতন্যশক্তির অভিপ্রায় অনুসারেই জগতের সমস্ত কার্য নিয়মিত হইতেছে। ঐ চৈতন্যশক্তির বুদ্ধি বিবেচনা আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার সহিত একজাতীয়। বায়ুমণ্ডলস্থ ঐ চৈতন্যশক্তির বুদ্ধি বিবেচনা হইতেই ছায়ারূপে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রতিফলিত হইতেছে।

'বায়ুরায়ুঃ বলং বায়ুঃ বায়ুর্ধাতা শরীরিণাং— এ বায়ুই মানুষের আয়ু, বল ও বিধাতা। সুতরাং আমাদের বুদ্ধি বিবেচনাতে কোনও বিষয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছা উপস্থিত হইলে আমরা যদি বায়ুমধ্যস্থা চৈতন্যময়ী পরাশক্তিকে তাহা জানাই তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই সর্বান্তর্গতা চৈতন্যশক্তির গায়ে একটি আঘাত লাগিতেছে। পুনঃ পুনঃ ঐ আঘাত লাগিলে সেই মহাশক্তি জাগ্রতা হন। এইজন্য ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির সহিত ক্রমাগত প্রার্থনা দ্বারা সেই নানা কৌশলময়ী চৈতন্যশক্তির কৃপা লাভ করা যায়।

যতক্ষণ এই ভৌতিক জগৎকে চৈতন্যময় যজ্ঞাগার বলিয়া ধারণা করিতে না পারিবে ততক্ষণ কোনক্রমে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে না। আবার স্বীয় অন্তরের অন্তর্যামিনী চিন্ময়ীকে দেখিয়া তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে যতক্ষণ না চিন্ময়ী শক্তির লীলা নিকেতন বলিয়া জানিবে ততক্ষণ বিরাট বাহ্যশক্তিকেও চিন্ময়ী বলিয়া জানিতে পারিবে না। কেবল জন্মমরণের কারবার শেষ করিবার চেষ্টা যাহার আসিয়াছে, মুমুক্ষুত্ব আসিয়াছে, যে বুঝিতে পারিয়াছে যে প্রকৃতিকে শুধু কামিনীভাবে দেখা মানে নিজে পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হওয়া,— ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ জন্মজন্মান্তর সৃষ্টি করা,— সেই কেবল প্রকৃতির জননীরূপটাই কষিয়া ধরিয়া থাকে। তাহাতে ধীরে ধীরে কামিনীর মোহ কাটানো সহজ হইয়া থাকে। মাতৃভাবই প্রকৃতির একমাত্র ভাব নহে আর সত্যভাবও নহে। মুক্তির জন্য মানুষ ঐ ভাবটি প্রতিক্রিয়াবশেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। আসলে ইহা আংশিকভাব মাত্র। জ্ঞানের বা জীবনমুক্তির পর আর ঐভাব থাকে না। সেই প্রকৃতির আসল ভাব অতি গুহ্য, অনির্বচনীয় কেবলানন্দময়ী ভাব। তাহার বর্ণনা নাই। প্রকৃতির আসল ভাবটি তাহা হইলে, কথায় বলিতে হইলে, এই কথাই বলিতে হয় যে কোন প্রকার সম্ভোগকামনালেশশূন্য আনন্দময়ী ভাব। যেখানে রমনী ও জননী দুইটি ভাব এক হইয়া গিয়াছে। চৈতন্যময় পুরুষের কেবলানন্দদায়িনী সেই আনন্দ অনুভবের বিষয়। কোনরূপ ক্রিয়াসম্ভোগের বালাই সেখানে নাই। সেই চিন্ময়ীকে জানিতে হইলে যোগক্রিয়া করিতে হইবে। তাই নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন শ্যামা নয় সামান্য মেয়ে। "সে যে মূলাধারে সহস্রারে উঠছে ধেয়ে ধেয়ে।" যৌগিক অর্থ—

"ঊর্দ্ধশক্তি নিপাতেন অধোশক্তের্নিষ্কুঞ্চ নাৎ।
মধ্যশক্তি প্রবোধেন জায়তে পরমং পদম্।।"

প্রশ্ন ঃ ক্ষুদ্র বোধেই কি জগতের মানুষ কায়াতে আবদ্ধ হয়েছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কায়াতে আবদ্ধ তো বটেই। তা কায়া আবার কতটুকু? এক বিঘত জায়গা। চিবুক থেকে ভ্রূ পর্যন্ত এক বিঘত জায়গায় খেলা করছে। কায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে উন্মাদ হয়ে আছে বিশ্ব। এই মুখ মণ্ডলটুকু একে মুখশ্রী বলে। এর চামড়াটুকু সামান্য জায়গা। এই সামান্য জায়গা মুখশ্রীটুকু দেখে সকলে উন্মাদ হয়েছে। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এই কায়াতে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছে।

প্রশ্ন ঃ জগতটা তাহলে কি ভ্রমেই চলছে?

উত্তর ঃ শুধু ভ্রমে নয়। অন্ধকারকেই ভালবাসছে জগৎ।

প্রশ্ন ঃ এতে কি পাচ্ছে? কি লাভ হচ্ছে?

উত্তর ঃ লুকোচুরি খেলা করছে অন্ধকারে। এতে লোকসান হচ্ছে। লাভ তো হয় না। তবু মনে করছে এটি আমার সুন্দর খেলা। চোর চুরি করে লাভ কিছু হয়না বটে, কারণ শেষে ধরা পড়ে সে সর্বঃস্বান্ত হয়ে যায়। কিন্তু তবুও চুরি করার জন্য ব্যস্ত থাকে। যতক্ষণ অন্ধকার না আসে ততক্ষণ তার মনটা খারাপ হয়ে থাকে। সে প্রতীক্ষায় থাকে কখন অন্ধকার আসবে। কারণ সে অন্ধকারকে ভালবাসে। এরূপ ভ্রান্তিতেই চোর নিমগ্ন আছে।

অর্থাৎ যে ক্রিয়া কৌশল দ্বারা উর্দ্ধশক্তি প্রাণবায়ু যখন অধোশক্তি অপনাবায়ুর সহিত মিলিয়া যায়, তখনই সুষুম্না বা মধ্যশক্তি জাগ্রত হয় এবং সাধক পরমপদ প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় চিন্ময়ী দেবী সুষুম্না পথে ওঁকার ধ্বনির সহিত চক্রে চক্রে নৃত্য করিতে করিতে যখন সহস্রারে স্থিত হন তখন সাধক সমাধিস্থ হন। তাঁহার অজানা কিছু থাকে না। আবার সমাধি ভঙ্গ হইলে জাগ্রত ভূমিতে সব কিছু সেই চৈতন্যময়ী মায়ের প্রকাশ বলিয়া অনুভব করেন। সাধক তখন মায়ের নিকট প্রার্থনা জানান— 'মা তোমার জন্য প্রাণ দেওয়াই শ্রেয়। তুমি দুধ দিয়া প্রাণটাকে রাখিয়াছ, আমি সেই প্রাণ তোমার হাতেই দিব। ইহাই স্বাভাবিক। সন্তানকে বুকে রাখিয়া আমিও অনির্বচনীয় সুখ পাই। যে প্রাণ, যে শ্বাস তুমি দিয়াছ যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি আছি তাহা তো তোমারই। ইহাকে রাখা বা নেওয়া তোমারই ইচ্ছা। আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ তোমাকেই দেওয়া উচিত। আমার মা কোথায়, মা কোথায় এইরূপ বলিতে বলিতেই প্রাণটাকে দেহ হইতে বাহির করিতে হইবে। নতুবা প্রাণের সার্থকতা আসে না। মা সর্বমঙ্গলে তোমাকে প্রাণ দেওয়ার অর্থই হইল মহাপ্রাণকে পাওয়া। সূর্যদেব উঠিয়া যেমন ঊষার আলোককে বুকে করিয়া লন, তাহাকে আত্মস্থ করেন, তেমনি মহাচেতনাময়ী তুমিও আমাকে বুকে রাখ। তোমারই চৈতন্যে আমাকে জাগরিত কর, তোমার চৈতন্যশক্তিতে আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর।

প্রশ্ন ঃ চোর কি বুঝতে পারছে না যে তার ক্ষতি হচ্ছে?

উত্তর ঃ না, সে বুঝতে পারবে কেন? তার একটা আলাদা স্তর আছে। "অসতো মা সদগময়"— অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্বের এই কামনা। কিন্তু যারা চোর, দস্যু তস্কর তারা এটা চায় না। তারা আলো চায় না। অন্ধকার চায়। অন্ধকার হলে তাদের আনন্দ হয়। কখন অন্ধকার আসবে এই বাসনা নিয়ে, এই ভ্রান্তিতেই তারা আছে।

প্রশ্ন ঃ ভ্রান্তি ছাড়া কি কিছু নেই?

উত্তর ঃ একেবারে ভ্রান্তি। নিছক ভ্রান্তি। কিন্তু এ ভ্রান্তিটা ধরিয়ে দেবে কে? দর্পনে মুখ দেখে আমরা কেউ বুঝতে পারছি না যে উল্টো দেখছি। কারণ ডান হাতটাকে বাম হাতে মনে হচ্ছে, আর বাম হাতকে ডান হাত মনে হচ্ছে। এই উল্টোটাই দেখে সাজগোজ করছি। এমনই ভ্রম। (তুলনীয় পৃঃ ১১)

প্রশ্ন ঃ এই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কি?

উত্তর ঃ এই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে গেলে, প্রকৃত মহাসত্যকে উদঘাটন করতে গেলে আমাদের উর্দ্ধদিকে যেতে হবে। অর্থাৎ কূটস্থে গতি নিতে হবে। সেইটি হল প্রকৃত আনন্দময় রাজ্য। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই তিনটি ভাগ আমাদের শরীরে আছে। নাভিদেশ থেকে নীচেরটা হল পাতাল, নাভি থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত মর্ত্য এবং কণ্ঠ থেকে সহস্রার পর্যন্ত স্বর্গ। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবন আমাদের ভেতরেই আছে। আমাদের নিম্নদিকটা হল পাতাল। এদিকেই পুঁজরক্তের খেলা, জন্ম-মৃত্যুর খেলা। এদিকেই হয় বিভ্রান্তির খেলা। সেজন্য নিজেদের ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন না করলে আমাদের ভ্রান্তিটা কাটবে না। সেজন্য গুরুবাদ আমাদের একান্ত প্রয়োজন। গুরুই আমাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন সেই রাজ্যে। আমাদের কণ্ঠদেশ পর্যন্ত অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্রের নীচ পর্যন্ত সংকল্প থাকে তার পরেই তা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর কোন সংকল্প থাকে না। এতে উর্দ্ধগতি হয় আত্মার। আমাদের এই দুর্লভ সাধন পথে গতিস্থির করতে পারলে শাশ্বত গতি আমাদের অবশ্যই লাভ হবে। সেজন্য লাহিড়ী মহাশয়কে তাঁর গুরুদেব সূক্ষ্মশরীরে এসে উপদেশ দিয়ে গেলেন আজকে সারা পৃথিবী তোলপাড় হচ্ছে এর দ্বারা। সেই সুন্দর উপদেশ বাণী ও কৌশল এক মুহূর্তে আমাদের সেই বিরাটের পথে পৌঁছে দিতে পারে। এক মুহূর্তে আমাদের মাইণ্ড চেঞ্জ হয়ে গিয়ে আমরা বিরাটের পথ অনুসরণ করতে পারি। বায়ু স্থির, দৃষ্টি স্থির, মনস্থির হয়ে বিরাটের পথে যাত্রা শুরু হতে পারে।*

** ভাবার্থ— প্রাণের ক্রিয়া সংযত করিবার জন্য প্রাণায়াম সাধন অত্যাবশ্যক। প্রাণের বিশ্রামই প্রাণায়াম। ইহা চঞ্চল প্রাণপ্রবাহকে স্থির করিয়া দৈহিক, মানসিক,*

প্রশ্ন ঃ তাহলে কি আমাদের কর্তব্য হোল এ সমস্ত ভ্রান্তি থেকে মনকে গুটিয়ে এনে শ্রীগুরু চরণে আত্মসমর্পণ করা?

উত্তর ঃ সে তো বটেই। আমরা যখন এসেছি তখন প্রতি পদে পদে আমাদের বিচার করতে হবে। এ জগত গতিশীল। এখানে দর্শনীয় যা দেখছি তার সমষ্টিতেই হচ্ছে জগৎ। সবাই এখানে চলছে। কিন্তু কোথায় চলছে তার ঠিকানা নেই। জগতের সাথে কোন সম্বন্ধ নেই। মানুষ ছুটছে ঐশ্বর্যের পিছনে। যশ, মান, খ্যাতি প্রতিপত্তি ইত্যাদি ঐশ্বর্যের লালসায় সে উন্মাদ হচ্ছে। কিন্তু কেউ কাউকে ধরা দেয় না। যে যার গতি নিয়ে চলছে। আত্মার আত্মীয়সূত্রে বদ্ধ হচ্ছে না। সন্ধ্যা রাতকে ধরা দিচ্ছে না। পিতা পুত্রকে বা পুত্র পিতাকে কেহই কাউকে ধরা দিচ্ছে না। প্রত্যেকেই আপন আপন গতি নিয়ে চলছে। কারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। সেজন্য একমাত্র তোমার সঙ্গে তুমি সম্বন্ধ যুক্ত। সেজন্য কথা হচ্ছে—

স্নায়বিক ও পৈশিক গতিসমূহকে রোধ করিতে শিক্ষা দেয়। যখন উক্ত গতিসমূহ একটি ধারায় প্রবাহিত হয় তখন উহা হইতে একটি তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া অন্তরকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া চৈতন্যের চেতনা প্রকাশ করে। জীব দেহাত্মবোধ শূন্য হইয়া আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। "চলে বাতে চলচ্চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।" (হঠ প্রদীপিকা)। ধ্যানের সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকিলে মন চঞ্চ ল হয় এবং উহা নিশ্চল হইলে মনস্থির হয়।

ক্রিয়াযোগের দ্বারা মনের মিলন কৌশলে শ্বাসের গতি কমিয়া আসে এবং ক্রমে তাহা নিরোধ করিবার শক্তি সাধকের জন্মায়। নিষ্কাম প্রাণ ক্রিয়াযোগে 'খেচরী অবস্থা' প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে মনের শূন্যে স্থিতিলাভ ঘটিয়া থাকে। খেচরী অবস্থা হইল—

"মনঃস্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং।
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনং।।
দৃষ্টি স্থিরা যস্য বিনাবলোকনং।
সা এব মুদ্রা বিচরন্তী খেচরী।।" (জ্ঞানসঙ্কলিনী)

—অর্থাৎ অবলম্বন ব্যতিরেকে যে মুদ্রা দ্বারা চিত্ত স্থির হয়, নিরোধ ব্যতিরেকে যে মুদ্রা দ্বারা বায়ুস্থির হয়, অবলোকন ব্যতিরেকে যে মুদ্রা দ্বারা দৃষ্টি স্থির হয়, তাহাকে খেচরী মুদ্রা বলে। এই অবস্থায় সাধকের অন্তরে প্রজ্ঞালোক ফুটিয়া উঠে। তাঁহার বিষয় বন্ধন আল্‌গা হইয়া যায়। সমস্ত সন্দেহ, সংশয় ইত্যাদি প্রজ্ঞার আলোকে বিনষ্ট হয়। জগৎ রহস্য তাঁহার নিকট ক্রমে উন্মোচিত হয় ও সাধক সত্যের প্রকৃতরূপ দর্শনাভিলাষে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বিরাটের পথে অগ্রসর হন।

আমি আমি করি বুঝিতে না পারি—
কে আমি আমাতে আছে কি রতন।।
কোন শক্তি বলে বেড়াই চলে বলে
কার অভাবে হবে দেহ অচেতন।।
দেহ মাঝে আছে প্রাণেরি সঞ্চার
তাহাতেই বলি আমি বা আমার।
প্রাণ গেলে চলে হবে সবাকার—
কেবা কার কোথা রবে ধন জন।।
প্রাণেরি চাঞ্চল্যে জীব ভাব ঘটে ;
চঞ্চলতা গেলেই সব আশা মিটে।
স্থিতি হলে সদা দেখি চিত্ত পটে
আঁকা আছে বাঁকা মদনমোহন।।
অপরূপ তাঁর রূপের মাধুরী,
দৃষ্টি মাত্র করে মন প্রাণ চুরি।
কেমন মহিমা বুঝিতে না পারি—
সকল পাসরি হেরি নব ঘন।।

সুতরাং একমাত্র "আমির" সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। কিন্তু এই প্রকৃত "আমি"টাকে কেউ ধরতে পারছে না। সকলে "আমি" "আমি" করে কিন্তু প্রত্যেকেই তার ঐশ্বর্য নিয়ে খেলা করছে। আমার এই বাড়ী, আমার অট্টালিকা, আমার রাজ্য, আমার ঐশ্বর্য এগুলিতেই মুগ্ধ হয়ে আছে! আর এই বিষয়গুলোতে মুগ্ধ হওয়ার জন্য "আমি"কে হারিয়ে ফেলেছে !

প্রশ্ন ঃ তাহলে এই যে মূল ভ্রান্তি এটা কি গুরুকৃপা ছাড়া মোচন হয় না?

উত্তর ঃ গুরুকৃপা তো আছে! কিন্তু তার জন্য ব্যাকুল হয়ে শরণাগত হতে হয়। শ্রীমতী রাধা যেমন ব্যাকুল হয়ে উন্মাদ হয়েছিলেন তবে গিয়ে প্রাণবধুকে পেয়েছিলেন। আমরা যদি শ্রীমতী রাধার মত ব্যাকুল হই, আমরা তাঁর শরণাগত হই তবে সেই প্রাণহরিকে ধরতে পারব। ধরবো কি করে এটা শুধু ভাষায় বলি, কাজে কিছু করি না। সেজন্য আমাদের উচিত হচ্ছে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসার সমন্বয় করে সেই "আমির" শরণাগত হয়ে থাকা এবং এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে বিস্মৃত না হওয়া। এই আমাদের প্রার্থনা। এই যে উপদেশ বাণী বললাম তাকে কিভাবে সব সময় ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারা যায় তার সুকৌশল হল শাশ্বত গতিতে মন দেওয়া। শাশ্বত গতি আমাদের ভেতরেই আছে। তা হল শ্বাস-প্রশ্বাস ! শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করে আমরা যদি ব্যবহারিক

জীবনকে চালাতে পারি তাহলে আর তা থেকে বিচ্ছেদ হয় না। আমরা যেমন শ্বাসকে ছাড়া বাঁচতে পারি না তেমনি শ্বাসের সঙ্গে ভক্তি, ভালবাসা, প্রেম, আনন্দ সবটাই যদি আমরা সংযুক্ত করি তবে শান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ সবটাই পাবো।।

প্রশ্ন ঃ শ্বাসের সঙ্গে ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রেম নিযুক্ত করার উপায় কি?

উত্তর ঃ শ্বাস আছে বলেই তো আমি আছি। শ্বাস ছেড়ে দিয়ে কি আমি থাকতে পারি? শ্বাস হচ্ছে প্রাণবায়ু। এই প্রাণবায়ুকে অবলম্বন করে আমার প্রাণ আছে। সুতরাং তাকেই অবলম্বন করে যদি আমার শ্রদ্ধাভক্তি, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি যতকিছু উপাদেয় জিনিষ আছে তা দিয়ে তাকে মধুময় করতে পারি তবেই আমার সব কিছু সুন্দর হতে পারে। তখনই আমি বিরাটের পথে যাত্রা শুরু করতে পারব। এই হচ্ছে কৌশল। সব সময় আমি যেন মধুময় হতে পারি, অর্থাৎ সুন্দর হতে পারি। শ্বাস যখন বেঁচে আছে আর শ্বাসকে নিয়েই আমি যখন বেঁচে আছি তখন শ্বাসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকবে না কেন? প্রেম থাকবে না কেন? ভালবাসা থাকবে না কেন? এটা হচ্ছে শাশ্বত গতি। মানুষ এটা অবলম্বন করলে আর বেহুঁশ হতে পারে না। মানুষ ওতেই বেহুঁশ হয়ে আছে। সেজন্য "শ্বাস-প্রশ্বাসয়ো গতি। বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করে সেই বিরাট সত্ত্বাতে পৌঁছবার জন আয়োজন কর। তাহলে সব ঠিক হবে, ঠিকই সঙ্গ হবে। সঙ্গ বিচ্যুত হবে না। এটা যদি পুনঃপুনঃ আলোচনা করি তবেই ধরা পড়বে। তা না হলে বেঁহুশে তো বিশ্ব খেলছে। বেহুঁশে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, প্রাণ চলছে। বেহুঁশে আমার বুদ্ধিবৃত্তিও খেলছে। সেজন্য আমরা বেহুঁশে এই বিশ্বের খেলা খেলি। অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগৃহে লুকোচুরি খেলছি, আমাকে হারিয়ে আমি সবটা করতে যাচ্ছি। এগুলোতে আমাদের ভ্রান্তির খেলা হচ্ছে। এই ভ্রান্তির খেলাটিকে চিনতে হলে গুরুর যে পথ নির্দেশ আছে সেটা সব সময় অবলম্বন করতে হবে। তাহলে তখন আপনাআপনি একটা আকর্ষণ আসবে। আগে শ্রদ্ধা তারপর প্রেম ভক্তি সবটাই আসবে। তখন ভাববে যে পৃথিবীতে আমি একাই এসেছি। আমি আছি আর আমার প্রভু আছে। আমার ঐশ্বর্য আমার প্রভু, আমি সেই প্রভুর দ্বাররক্ষক। এইটুকু বোধ নিয়ে যদি আমরা চলি, যদি প্রভুর সঙ্গ পাওয়ার জন্যই আমরা সবসময় প্রস্তুত হয়ে থাকি, এছাড়া আমার বিষয় আর কিছু নেই তবেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা এগুলো ক্রমে আমাদের আসবে।

প্রশ্ন ঃ শ্বাসের সঙ্গে মন রাখলেই কি শ্রদ্ধা আসবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, শ্বাসের সঙ্গে মন রাখলে তাতে শাশ্বত গতি আপনাআপনি

আসবে। ভাববে আমি একা এসেছি, একাই যাব। আমার সঙ্গে প্রভু আছেন আর আমি আছি। আমার দুটো অবস্থা আছে। দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ, দুটো কান ইত্যাদি। এ দুটো যে একসঙ্গে আছে তা আমরা বুঝতে পারি না। একটা অন্যটাকে আঘাত দিচ্ছে। একটা অন্যটার সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন হয়ে চলছে। চেষ্টা করছে কিন্তু মিলন কোথায়? সেই মিলন করবার জন্য আমরা একসঙ্গে থাকি। কে? না আমি। সেই আমিতে জোর দিয়ে তার গতি চলছে। এটা নিয়ে খেলা করছে। তারপর বলল আমার নাম অমুক। তার নাম বলছে সে নয়। এরূপভাবে নাম। নামরূপের পরপারে তুমি খেলা কর।

প্রশ্ন ঃ নামরূপ নিয়ে খেলা করছেন আবার নামরূপের পরপারেও খেলা করছেন— এর কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা?

উত্তর ঃ সবটাই সত্য। নামরূপটা নিয়ে 'আমি' খেলছে এই বোধটুকু যদি থাকে তাহলে তিনি সত্য। সত্যকার তখন আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রেম ভালবাসা সবটাই আসবে! তখন জীবনটা মধুময় হবে। মধুময় করবার জন্যই তো এগুলোর আয়োজন। তিনিই আমার একমাত্র আপনজন। এ ছাড়া আর কেউ নেই। কার সঙ্গে আমি কি সম্বন্ধ করব এইভাবে যদি ভাবিত হই, যদি এই বোধে উদ্বুদ্ধ হই তবেই আমরা জন্ম সার্থক করার প্রয়াস পেতে পারি। আর কিছু নয়। একটা ভ্রান্তির বশে আমরা খেলছি। খেলার ফলে কতজন্ম আমাদের কেটেছে এবং কাটছে। কিন্তু লুকোচুরি খেলা শেষ হচ্ছে না। এই খেলার শেষ করতে গেলে আমাদের সবসময় বিষয়কে এড়িয়ে চলতে হবে এবং আমার প্রভুর বা প্রাণবল্লভের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চলতে হবে। তবেই আমার জন্ম সার্থক হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি যে বললেন কায়া আর মায়া। কায়ার সাথে মায়ার কি সম্বন্ধ এবং মায়ার সাথেই বা কায়ার কি সম্বন্ধ?

উত্তর ঃ কায়াটা দেখেই তো মানুষ আসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ঐশ্বর্য এ সবই তো কায়া। এই কায়াকে দেখে বিশ্বটাই উন্মাদ, পাগল। যখনই কায়াকে লাভ করবার চেষ্টা করবে, তাকে কি লাভ করতে পারবে বা কায়ার কিটা লাভ করবে? কায়াকে লাভ করাতো যায় না। কায়াতে যে চৈতন্য সত্তা খেলছে, চিন্ময়ী মা আমার খেলছেন, তাঁকে লাভ করতে হবে। তাঁকে লাভ করতে হলে কায়ার মায়াটাকে অর্থাৎ মাংস চামড়াকে বাদ দিতে হবে। মাংস চামড়াকে কেহ ভালবাসে না। ভালবাসে সেই চৈতন্য সত্তাকে। চৈতন্য সত্তা যখন সেই কায়াতে খেলছে তখনি মানুষ তাতে অভিভূত হচ্ছে। চামড়াটাই দেখার জন্য পাগল হচ্ছে। চৈতন্য সত্তাকে হারিয়ে কায়াকে পাবার জন্য চেষ্টা করছে। কায়াতে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অভিনয়

চলছে তাতে অভিভূত হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। সেজন্য কায়াতে মায়ার অর্থাৎ নামরূপে পরপারে না গেলে মায়া ত্যাগ হয় না। তুমি মুক্ত হও, বিরাটের পূজারী হও, পূজা কর। পূজা করলে তবে অহংকার থাকবে না। অষ্টপাশ থেকে মুক্ত সবটাই ঠিক হবে। এবার পূজা করতে হবে। এই পূজার অধিকারী তখনই হবে যখন তোমার পরিপূর্ণ সারেণ্ডার করবার ক্ষমতা আসবে। তখনই কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই তিনের ঠিক ঠিক সমন্বয় হবে।

প্রশ্ন ঃ মায়া থেকে কি কায়ার সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মায়া থেকেই কায়ার সৃষ্টি হয়েছে। মায়া না হলে কায়ার সৃষ্টি হয় না। আবার কায়াতে মায়া আবদ্ধ হয়েছে। কায়াতেই আমরা সম্বন্ধ সৃষ্টি করেছি। কায়াটা কিছু নয়। ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেমের দ্বারা আত্মসমর্পণ না করলে কায়ার মায়া কাটে না।*

** বিশদ অর্থ— ভক্তি— ভক্তি কি বা ভক্তি কাহাকে বলে ইহার উত্তর শাস্ত্রে বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন ভাবে উক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সেই সমস্ত উক্তির বা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের অনুকূলে অশেষ প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভগবদগীতায় ভগবান নিজমুখে ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কোন দ্বন্দ্ব নাই। ভগবানের অমৃতময় বাণী সকলেরই শিরোধার্য্য। স্বয়ং ভগবান ভক্তির একটি তালিকা নিজে রচনা করিয়াছেন গীতায়।*

ভক্ত বা ভক্তির লক্ষণ হইল অশেষ সদগুণ বা কল্যাণগুণ অর্জন এবং হেয়গুণ বর্জন। ভক্তি বলিতে কেবল সাময়িক আবেগ, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি বুঝায় না। ভক্তি হইল সদ্‌গুণে ভূষিত হওয়া। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে যে সকল লক্ষণের কথা বলা আছে সেগুলির সহিত জীবনকে মিলাইয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য প্রয়োজন নিরলস সাধনা বা তপস্যা। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা কৃপা এবং সাধকের নিরলস প্রচেষ্টা থাকা চাই। তবেই ভক্তিলাভ সম্ভব। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় ভক্তিলাভ হয় অর্থাৎ ভগবান প্রোক্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া যায়। ভক্তি কতকগুলি দৈবী সম্পদ বা দিব্যগুণ। সংযমের সাধনায় এই দিব্যগুণগুলি আয়ত্ত করিতে হয়। সাময়িক পুলক বা অশ্রুতে ভিতরের মালিন্য দূরীভূত হয় না। করণীয় আরও অনেক কিছু আছে। আমরা ভক্ত বলিয়া নিজেদের জাহির করিতে চাই। কিন্তু ভক্তির পরীক্ষায় কতজন উত্তীর্ণ হইতে পারি তাহাই বিচার্য্য। অর্জুনকে ভগবান ভক্ত আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, আমাদের মত সাধারণকে কি ভগবান বা শ্রীগুরু ভক্ত শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন?

এই ভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ভক্ত। ভক্ত ভগবানে আত্মহারা হইয়া যান। তিনি ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া সর্বত্রই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন। জলে-স্থলে, আকাশে-বায়ুতে সর্বঘটে বিশ্বব্যাপীরূপে তাঁহাকে দেখিয়া ভক্ত তাঁহাতেই আত্মসমর্পিত হইয়া যান। মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্ব তাঁহার

চরণে অর্পণ করিয়া ভক্ত কৃতার্থ হন। ভক্ত আকুলকণ্ঠে ভগবানকে বলেন, প্রভো! তুমিই আমার সব। আমি জপ তপ, হোম, ব্রত কিছুই জানিনা। আমি তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানিনা। আমি তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই চাহিনা। শাণ্ডিল্য ঋষি বলেন, 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' অর্থাৎ পরমেশ্বরে পরম অনুরক্তিকেই ভক্তি বলে। পরমেশ্বরে এই অনুরক্তি যখন জন্মে তখন ভক্ত জ্ঞান-কর্ম বাসনা কামনা ভুলিয়া যান। সুখ-দুঃখ ধর্মাধর্ম তাঁহার বোধ থাকেনা। সুতরাং জ্ঞান কর্ম ভুলিয়া, সুখ-দুঃখ ভুলিয়া, ধনৈশ্বর্য্য, স্ত্রীপুত্র এমনকি নিজেকেও ভুলিয়া ভগবানে যে ঐকান্তিক অনুরক্তি, তাহার নাম ভক্তি। এই ভক্তিদ্বারাই একমাত্র ভগবান লভ্য হন। নতুবা জীবের কতটুকু শক্তি যে তাহার দ্বারা অনন্ত শক্তিময়কে আয়ত্ব করিবে? সুতরাং ভক্তিব্যতীত জীবের উপায় কি? তাই ভগবান নিজমুখে ভক্তি ও ভক্তের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া বলিয়াছেন—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।"

—গীতা ৯। ৩০-৩১

— অর্জুন অতি দুরাচার লোকও যদি অনন্যচেতা হইয়া আমার ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। সে সম্যক জ্ঞানবান হইয়াছে যে এরূপে আমার ভজনা করে সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা জানিও— আমার ভক্ত কখনও বিনাশ হয়না।

তাই জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য বলিলেন—

"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।
স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ।।"

— (বিবেকচূড়ামণি)

যে সমস্ত মোক্ষকারণ সামগ্রী আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই প্রধানা। পণ্ডিতগণ বলেন, জীবের স্বরূপ অনুসন্ধানই ভক্তি। অর্থাৎ জীবের স্বরূপ কি ইহার তত্ত্ব অনুসন্ধানই ভক্তি। জীবাত্মাতে যে পরমাত্মার অনুসন্ধান তাহাকে ভক্তি বলে। সোজা কথায় ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগকেই, ভগবানে পরম প্রেমকেই ভক্তি বলে।

এতাদৃশ ভক্তি যখন সাধকের অন্তরে জাগ্রত হয় তখন সে আপন ভুলিয়া ভগবানে তন্ময় হইয়া যায়। তাহার দেহ, প্রাণ, মন ভগবানে নিবেদিত হয়। এইভাবে ভক্ত যখন আত্মনিবেদিত হইয়া যায়, তখন দেহাত্মবুদ্ধি তিরোহিত হয় ও কায়ার মায়া কাটিয়া যায়।

শ্রদ্ধা— শ্রৎ—বিশ্বাস (বিগতশ্বাস) + ধা— ধারণ করা। শ্বাসের ক্রিয়া হইতে মনকে তুলিয়া লইয়া অন্তরে ধারণ করার নাম শ্রদ্ধা। ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা

অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারা বহির্মুখী মনকে উঠাইয়া লইয়া কূটস্থে স্থিতি করার নাম শ্রদ্ধা। প্রাণক্রিয়া দ্বারা প্রাণ যখন মস্তকে চড়িয়া বসে, তখন যে স্থিরাবস্থা হয় এবং যিনি ঐ অবস্থায় পৌছান তিনি শ্রদ্ধাবান সাধক। এতদ্ব্যতীত স্থূলভাবের অর্থ হইল গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসী হওয়া। শ্রদ্ধাবানেরাই জ্ঞানলাভ করেন। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিলেন 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। জ্ঞানলাভ হইলে সাধকের সমস্ত ভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়, জগৎ রহস্য তাঁহার নিকট অনাবৃত হয়। জ্ঞানলাভের পূর্বে অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থায় জীব যেমন কায়ার মায়াতে মুগ্ধ হয় তেমনি জ্ঞানলাভ হইলে সাধকের বিপরীত অবস্থার উদ্রেক হয় অর্থাৎ কায়ার মায়া অতি সহজেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

প্রেম—শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তির সাধন করিতে করিতে অর্থাৎ সুদীর্ঘ সাধনার পর সাধকের অন্তরে প্রেম উদিত হয়। প্রেম সঞ্চারমাত্রেই স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বেবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই আটপ্রকার সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ হয়। কামগন্ধশূন্য যে অনুরক্তি তাহার নাম প্রেম। আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য যে কার্য্য করা যায় তাহাকে কাম বলে। আর ঈশ্বরেন্দ্রিয়ের প্রীতির জন্য যাহা করা যায় তাকে প্রেম বলে। প্রেম জন্মিলে মানুষের সমুদায় বৃত্তি তাঁহারই আশ্রিত হইয়া পড়ে। ভক্ত তখন তদ্‌গতচিত্তে তাঁহাকেই (ঈশ্বরকে) চায়। ভক্ত তখন জ্ঞান, শক্তি, মুক্তি কিছুই চাহে না। চাহে কেবল তাঁহাকে। মনের এই যে অবস্থা ইহার নাম প্রেম।

প্রেমের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। প্রেমের বশে ভগবান আকৃষ্ট হন। সে আর্কষণে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের সাধনায় ভগবান তাহার প্রতিদান দিতে পারেন কিন্তু গোপী প্রেমের প্রতিদান দিতে পারেন না। তোমাকে, শুধু তোমাকেই জানি, তোমাবই আর কিছু জানি না— ভক্তের এই যে আহ্বান, ইহাতে কি কোন প্রার্থনা আছে? আর প্রার্থনা যদি না থাকে তবে পূরণ করিবেন কি? প্রতিদান দিবেন কি? চাই তোমাকে। দিতে হইলে সেই নিজেকেই দিতে হয়। তাই ভগবান গোপীপ্রেমের নিকট ঋণী।

প্রেম চারি প্রকার। (১)একাঙ্গী অর্থাৎ একদিক হইতে ভালবাসা। যেমন হাঁস জলকে ভালবাসে কিন্তু জল হাঁসকে চায় না। (২)সাধারণী ইহাতে শুধু নিজের সুখ চায়। তুমি সুখী হও বা না হও আমার নিজের সুখ চাই। যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। (৩)সামঞ্জস্য— অর্থাৎ উভয়ের সুখ। আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক। ইহা খুব ভাল অবস্থা। (৪) সামর্থ্য— সর্বাপেক্ষা উচ্চ অবস্থা। সমর্থা প্রেমের দৃষ্টান্ত হইলেন শ্রীরাধা। সর্বদা কৃষ্ণ সুখে সুখী। তুমি সুখে থাক, আমার যাহাই হউক, এইপ্রকার ভাব। সে সুখী হইলে তবে আমার সুখ। ইহাই প্রকৃত প্রেম। ভগবানকে সেবা করিয়া, ভগবানকে সৌন্দর্য্য উপভোগ করাইয়া, ভগবানকে বুকে লইয়া যে আনন্দের পূর্ণতম ভাব, তাহাই প্রেম।

এই সমর্থা প্রেমের দ্বারাই ভগবানের নিকট ঠিক ঠিক আত্মসমর্পণ করা যায়। তখন দেহাত্মভাব থাকে না। দেহাত্মভাব না থাকায় কায়ার মায়াও কাটিয়া যায়।

প্রশ্ন ঃ আত্মসমর্পণ কাকে করতে হবে?

উত্তর ঃ আত্মসমর্পণ করতে হবে সেই প্রাণবল্লভ হরিকে। যিনি আমার প্রাণস্বরূপ তাঁকে আত্মসমর্পণ করলে মায়াটা কেটে যাবে, কায়াটা কেটে যাবে। তখন ভ্রান্তিটা ছুটে যাবে। এই ভ্রান্তি যখন ছুটে যাবে তখন আসবে শান্তি, তৃপ্তি এবং শাশ্বতগতি। এই শাশ্বতগতিতে না আসা পর্য্যন্ত মানবগণকে ভ্রান্তির বশে ঘুরতে হবে! এই ভ্রান্তি যতক্ষণ না মোচন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শাশ্বতগতি হতে পারে না। আমাদের চরম ও পরমস্থান হল সেই বিরাট। বিরাটে অবস্থান করা ও বিরাটবোধে প্রতিষ্ঠিত হলেই আমাদের সমাপ্তি হয়ে গেল। তখন আমি "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" অর্থাৎ আমি সেই অমৃতের পুত্র। বিরাট বৈচিত্র্যময় জগতে আমি সেই বিরাটের সন্তান হয়ে, উত্তরাধিকারসূত্রে আমিও বিরাট। তবে এই অনুভূতি লাভ করতে হলে চাই সংযম। সংযম শিক্ষা না করলে এই প্রকৃত সত্যের অনুভূতি হয় না।

প্রশ্ন ঃ সংযম শিক্ষা কাকে বলে?

উত্তর ঃ সংযম হল আমার মনকে ইচ্ছাশক্তির খেলায় না খেলিয়ে একেবারে কূটস্থে আবদ্ধ করে রাখা। যখনই কূটস্থে আবদ্ধ করে রাখার মত আমার অভ্যাস তৈরী হবে তখনই ইচ্ছাশক্তির যে একটা প্রভাব, এটা ধরছে, ওটা ধরছে, সেটা ছাড়ছে, এই ভাব আমার সংযত হবে। এই যে ইচ্ছাশক্তি, এই ইচ্ছাশক্তিটাই হচ্ছে মন। মন বলতে আর একটা নতুন সাজগোছ পরা কিছু নেই। ইচ্ছাশক্তি যখনই আয়ত্তাধীন হবে মনও তখনই আয়ত্তাধীন হবে।

প্রশ্ন ঃ লাহিড়ী মহাশয় বলছেন— প্রাণের চঞ্চল অবস্থার নাম মন। মন যখন স্থির হয় তখন তো আত্মা। স্থির মন তো তাহলে আত্মা হচ্ছে।

উত্তর ঃ মন যে আত্মা এটা ঠিক কথা। কিন্তু মনকে ধরবে কি করে? মন কথাটা কি? মনের বাহ্য স্বরূপটা কি?

মনের স্বরূপ বলতে গিয়ে ইচ্ছাশক্তি কথাটা ব্যবহার করছি। কিন্তু মনটা কি সেটা ব্যবহার করতে পারছি না। সেটা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ইচ্ছাশক্তির কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে অমুক করি, ইচ্ছা হচ্ছে এই করি। বিভিন্ন মুহূর্তে কত যে ইচ্ছা হচ্ছে তার ঠিক নেই। বিভিন্ন ইচ্ছা প্রভাবে ঘাড়ে ধরে চালাচ্ছে। ইচ্ছাশক্তির প্রবল আবেগের বশে সে নিজে নিজের সংযম হারিয়ে বসেছে। সেজন্য সাধনার কৌশল হল ইচ্ছাশক্তিকে আপন করতলগত করা এবং স্বর্গরাজ্যে অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্মপ্রদেশে অবস্থান করা। এতেই অবস্থান করব কারণ এই রাজ্যই আমার প্রকৃত রাজ্য।

প্রশ্ন ঃ তাহলে এক কথায় ইচ্ছাশক্তিকে বহির্মুখী না করে অন্তর্মুখী করাই কি সংযম?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। ইচ্ছাশক্তি বহির্মুখী করেই তো বিশ্ব শেষ হয়ে গেছে। বাইরের পথে গিয়েই তো ভ্রান্তিতে পড়েছে। এজন্য এ আর কি বলব, এই বিশ্ব একটা উন্মাদ পাগল অবস্থার মধ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে। মানুষ যেন কি একটা দিশাহারা হয়ে পড়েছে। কোথায় যে এসেছে, কোথায় যে যাচ্ছে, কোথায় যাবে, কেন যাচ্ছে, কি পাচ্ছে কি পাবে, কি পাবার জন্য যাচ্ছে তা কোনটাই সে জানে না। এই উন্মাদনাই হো অবিদ্যামায়ার খেলা। মা চিন্ময়ী। অবিদ্যামায়া এবং বিদ্যামায়া এ দুটি তাঁর খেলাঘর। অবিদ্যাতে তিনি খেলছেন, বিদ্যাতে তিনি বিচার করে দিচ্ছেন এটা ভ্রান্তি। কাজেই প্রত্যেকে বুঝে নাও কোথায় যাচ্ছ। তিনি তোমাদের বিচার, বুদ্ধি সর্বস্ব দিয়েছেন বোঝবার জন্য। কাজেই সেই আধার নিয়ে বুঝতে, শিখতে হবে। তা না হলে ভ্রান্তিতে হাবুডুবু খেতে হবে। তাই ঠিক ঠিক পথে যেতে হলে আমাদের সাধু গুরুসঙ্গ প্রতিমুহূর্তেই করা দরকার। প্রতি মুহূর্তে শ্বাসের সঙ্গ করতে হয়। শ্বাসের সঙ্গ না হলে ঠিক ঠিক গতি হয় না। শাশ্বত গতি হবে না। শ্বাসকে শাসন করে ইচ্ছাশক্তিকে আপন করতলগত করতে হবে।

তাই শ্বাসকে শাসন কর।* কেন সে ঝড়ের মত ছুটবে? এই বিশ্বটা সৃষ্টি হয়েছে এই ঝড়ের ভিতরে, একটা উন্মাদনার ভিতর দিয়ে। অন্ধকার কারা গৃহে উন্মাদ পাগল হয়ে বিশ্বটা সৃষ্টি করছে। এটা বুঝে না। সকলেই তো এইভাবে সৃষ্ট হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ অন্ধকারেই কি সৃষ্টি হচ্ছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অন্ধকারেই সৃষ্টি হচ্ছে। আলোতে সৃষ্টি হয় না। যৌন ক্রিয়া করতে গেলে কাউকে নিমন্ত্রণ করতে হয় না। এটা কেউ বলে না। এজন্য আমাদের

** ভাবার্থ— যাহা শাসন করে বা আজ্ঞা করে তাহাই শাস্ত্র। কাহার শাসনে শরীরে চলিতেছে? "বায়ুর্ধাতা শরীরীণাম্" অর্থাৎ বায়ুই এই শরীরের শাসক। বায়ুর শক্তিতেই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব চলিতেছে। তাহার মধ্যে প্রাণবায়ু প্রধান। বায়ুই শরীরের শাসনকর্তা বা শাস্ত্র। শ্বাস= শ্বাস, স্ত্র-অস্ত্র। শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ অস্ত্রই শাস্ত্র। এই শ্বাসরূপী অস্ত্র চালনা করিয়া যিনি দক্ষতা বা পটুতা অর্জন করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়াছেন তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ এইগুলিকেও শাস্ত্র বলা হয়। কারণ এই প্রকারে শ্বাসরূপী অস্ত্র চালনা করিয়া যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছেন সেই সকল ঋষিগণ তাঁহাদের অনুভূতির বিষয় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই বেদ পুরাণ, উপনিষদ্ প্রভৃতিও শাস্ত্র পদবাচ্য। তাই এগুলিও প্রামাণিক। এই শ্বাসরূপী শাস্ত্রের শরণাগত হইলে সমগ্র প্রকৃতি তাহার অধীন হয়। তখন তাহার প্রকৃতি পুরুষ অবগত হইয়া নানাত্ব চলিয়া যায় এবং জন্ম মরণরহিত হয়। (পুরাণ পুরুষ যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী)।*

প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হয়। জন্মাশৌচ, মৃতাশৌচ এই দুটো অশৌচ আমাদের ভোগ করতে হয়। এই খেলাঘরে যে উল্টাপাল্টা খেলা হচ্ছে আমরা তার কিছুই বুঝতে পারছি না। সাধু গুরুর সঙ্গ না করলে এসব কিছুই বোঝা যাবে না। আর একটা মজা হচ্ছে যখনই একটু আধটু বোধ হল, বুঝতে পারলাম তখনই ভাবলাম যে এবার মেরে দিয়েছি, গুরুদেবের কাছে যা ছিল সব পেয়ে গেছি। চাওয়া পাওয়া আমার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার কি শেষ হয়? যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণ চাওয়া পাওয়া আছে। শ্বাস যতক্ষণ আছে, শ্বাসের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে এই বিশ্বখেলা খেলতে থাকো। তাহলে সব বুঝতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ শ্বাস না থাকলে চাওয়া পাওয়া থাকবে না?

উত্তর ঃ না। শ্বাস না থাকলে চাওয়া পাওয়ার কি থাকবে? তখন তো শরীর থেকে আমি চলে গেলাম। তখন সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর, তুরীয় শরীর এই সব শরীর নিয়ে আমি খেলা করব।* তখন আমি এইদিকে দৃষ্টি দিতে যাব কেন?

** ভাবার্থ—স্থুল শরীর= পঞ্চীকৃত মহাভূত সম্ভবং কর্মসঞ্চিতং।*
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে।"
—(আত্মবোধঃ)

সঞ্চিত কর্মানুসারে পঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদি মহাভূত হইতেই নানাপ্রকার স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়। এই শরীরই সুখ ও দুঃখের ভোগাস্পদ। সূক্ষ্ম দেহ হইল—

"পঞ্চ প্রাণো মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্।।"

অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত হইতে উৎপন্ন পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ এবং কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ এই দশ ইন্দ্রিয় সমন্বিত ভোগসাধন দেহকে সূক্ষ্মদেহ বলে।

কারণ শরীর = "অনাদ্যবিদ্যা নির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধি ত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ।।"

অর্থাৎ অনাদি অনির্বচনীয় অবিদ্যাকে কারণোপাধি বা কারণ শরীর বলে। স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর এবং কারণ শরীর এই দেহ ত্রয় হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে অবধারণ করিবে।

যৌগিক অর্থ—প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ু স্থির হইলে মনস্থির হয়। তখন মন সূক্ষ্ম বিষয় চিন্তা করিতে থাকে। সাধক ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পরাবস্থা যখন প্রাপ্ত হন, তখন বুঝিতে পারেন যে মরুৎ ব্যোম (বাতাস আকাশ) উভয় মিলিত। ঐ সূক্ষ্ম পরব্যোম ও সূক্ষ্ম স্থির বায়ু একত্রে মানবের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলে সর্বশরীরে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ পরব্যোম বা চিদাকাশ কেবল "চৈতন্য" সকল জ্ঞান বুদ্ধির আধারস্থল। সেই মহাচৈতন্যই অন্তরস্থ সূক্ষ্ম বায়ুতে সম্মিলিত

রহিয়াছে। ঐ স্থিরবায়ুই মহাচৈতন্যের বাসভবন। সেই চেতনা বুদ্ধি বাহ্যবায়ুর মধ্যস্থ স্থির বায়ুতে থাকেন। তিনি জীবাত্মারূপে শ্বাসপ্রশ্বাস পথ দিয়া হৃদয়মধ্যে একবার আসিতেছেন আবার হৃদয়মধ্যে সংযোগ রাখিয়াই নাসিকার বাহিরে অনন্ত আকাশরূপী চৈতন্য সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। দেহমধ্যস্থ মেরুদণ্ডের মধ্যে যে পদ্ম বন রহিয়াছে সেখানে মনে প্রাণে যাতায়াত করিতে করিতে ধীরে ধীরে সাধক আজ্ঞাচক্রে স্থিরতা লাভ করে এবং তারপর ক্রমে সহস্রারে যায়। তখন কোন দেহবোধ থাকে না এবং এই অবস্থাই তুরীয় অবস্থা। সাধক তখন এই অবস্থায় বিরাজ করেন। আবার যখন জ্ঞানের নিম্নভূমিতে অবতরণ করেন তখন জাগ্রত, স্বপ্নাবস্থা ইত্যাদি ভোগ করিতে থাকেন। একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইতে পারে। সঙ্গীতটি নিম্নরূপ—

"ও মন চলনা আপন দেশ।
আপন ধনে হারায়ে কেন আজ সেজেছ ভিখারী বেশ।।
আশাভগ্ন হৃদে নিয়ত ছুটিছ, কি যেন কি তুমি হারায়ে ফেলেছ,
থেকে সংসার কাজে তবু তার মাঝে—
মাঝে মাঝে মনে পড়িছে বেশ।।
যে দেহ হতে আভাসে ভাসিছ,
সে দেহ দেখ আজ কি সাজে সেজেছ।
ত্রিগুণাধারে আলো আধাঁর করে,
ম্রিয়মাণ তাই জগৎ বেশ।।
দৃশ্যমানটি এই জগৎ ভ্রমে,
কেন ছুটিতেছ অহং জ্ঞানে।
সাধু গুরু সনে লও তত্ত্ব জেনে,
করনা আপন কর্ম শেষ।।
তোমার দেশের কিবা কথা বলি
ত্রিপাদত্যজিলে ওমন তুমি তো সকলি।
চল বেলাবেলি আয়ু গেল চলি,
পরাণে তুমি হইয়া মেশ।।
তুরীয়পাদ তোমারি সখা,
সেই দীপ্তিস্বরূপ বিন্দু করিবে দেখা।
তখন সমাধিস্থজ্ঞানে রবে সর্বস্থানে,
সেথাকার কোন নাহিকো ক্লেশ।।
প্রণবের মন হও না সুজন
সর্বভূতই এক ভাবনা সেজন।
তাই বলি মন আর নাহি কোন জন—
শুধু একতারে সাধো একেরই রেশ।।

— (প্রণবানন্দ ভারতী)

এইভাবে সাধক সাধনা দ্বারা দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া পরমাত্মায় মিলিত হন এবং নির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।

ক্রিয়াযোগ অবলম্বন বা সাধনা দ্বারা সাধকচিত্তের ক্রমিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে বা সাধকের মধ্যে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এক স্তরে বা এক ভূমিতে আবদ্ধ থাকা সাধকজীবনে ক্রমোন্নতির লক্ষণ নহে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তুরীয়াদি অবস্থার ন্যায় অধ্যাত্মজগতেও ক্রমবিকাশ আছে। তীব্র সংবেগ সম্পন্ন সাধকই অনেক স্তর ভেদ করিয়া চরম ভূমিতে আরোহন করিতে সমর্থ হন। ঊর্দ্ধ সপ্তলোকের ন্যায় অধোদেশেও সাতটি ভুবন আছে। যথা অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। আর ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক হইল ক্রমোচ্চ সাতটি ভূমি। ভূমা সুখাভিলাষী সাধক নিম্নের অনেক ভূমি অতিক্রম করিয়া তুরীয় ভূমিতে পৌঁছিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করেন।

যোগবাশিষ্ঠে ক্রমসোপান বা ভূমিকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বশিষ্ঠদেব সাতটি ভূমিকা অর্থাৎ অবস্থাভেদে ব্রহ্মবিৎ সাধকের শ্রেণীভেদ বা স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন।

'এতাদৃশো ব্রহ্মবিৎ ভূমিকা সপ্তকভেদেন নিরূপিতো বশিষ্ঠেন।' ভূমিকা বলিতে চিত্তের অবস্থা বিশেষকেই বুঝায়।

সাধনা করিতে করিতে প্রাণের যখন কূটস্থে স্থিতি হয় তখন সেই স্থিরতার অবস্থাভেদে সাধক বিভিন্ন ভূমিকায় আরোহন করেন।' 'শুভেচ্ছা নামক যে জ্ঞানভূমি তাহাই প্রথমা বলিয়া পরিকীর্তিত; বিচারণা দ্বিতীয়া, তনুমানসা তৃতীয়া, সত্ত্বাপত্তি চতুর্থী, অসংসক্তি পঞ্চমী, পদার্থভাবনী ষষ্ঠী এবং তুর্যগা নামক ভূমিকা সপ্তমী বলিয়া কীর্তিত হয়। যোগের এই সপ্তভূমিকার মধ্যে প্রথম দুইটি অর্থাৎ শুভেচ্ছা ও বিচারণা সাধন লক্ষণ মাত্র। তৃতীয় তনুমানসা—ইহাতে মনের ক্ষীণতা জন্মে অর্থাৎ মন থাকে কিন্তু তাহা ভিতরে ডোবা। এই তিন ভূমিকা যোগিগণ কর্তৃক জাগ্রত অবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়। কারণ এই অবস্থায় যোগিদের নিকট ভিন্নরূপে জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে অর্থাৎ মুমুক্ষু ব্যক্তির এই অবস্থায় জগদ্‌বিষয়ক ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়না, কিন্তু তাহা বিদ্যমান থাকে। চতুর্থ হইল সত্ত্বাপত্তি। এই অবস্থায় জগৎ ভুল হয়, আপনাকে ভুল হইয়া যায়। ইহাই সমাধির আরম্ভ। এই অবস্থা স্থায়ী ও স্থির হইলেই সাধক কৃতার্থ হন। সাধারণতঃ এই অবস্থা পর্যন্তই সাধক অবস্থা। পঞ্চম অসংসক্তি। এই অবস্থায় যোগী সমাধিস্থ থাকুন আর বুত্থিতই হউন, যোগী তাহার ব্রহ্মভাব হইতে বিচলিত হন না বা সংসারের দৃশ্যদর্শনে বিমুগ্ধ হন না। ইহা পাকা যোগারূঢ় অবস্থা। এই অবস্থায় থাকিয়া সব কাজ করাও যায় বা কিছু না করাও যায়। সাধারণতঃ মহাযোগীশ্বর পুরুষ এবং অবতারাদি পুরুষেরা এই অবস্থায় থাকেন এবং জগৎলীলা সম্পাদন করেন। ষষ্ঠ ভূমিকা হইল পদার্থভাবনী। ইহাকে গাঢ় সুষুপ্তি নামে অভিহিত করা হয়। ইহাতে অবস্থিত যোগীর আর ব্যুত্থান হয় না। তাঁহার নিকট সৃষ্ট অসৃষ্ট বলিয়া তখন কিছু থাকে না। কিছু করা বা হওয়া সেখানে নাই। সুখ দুঃখ বা জন্ম

প্রশ্ন ঃ আপনি বিচার বা সাধুসঙ্গ করতে বলেছেন। তার চেয়ে কি মনকে একেবারে সমর্পণ করে জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া ভাল নয়?

উত্তর ঃ কোথায় বিদায় নেবে? কি কৌশলে কোথায়ই বা যাবে? এখানে আসক্তির খেলা আছে। কাজেই বিদায় নেবে কি করে? বিদায় নেবার কি উপায় আছে?

প্রশ্ন ঃ তাহলে কি বিচার করতে হবে মুহুর্মুহু?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অনবরত বিচার। বিচার আসনে বসে থাকতে হবে। তবে গিয়ে হবে। এখানে তো আমরা আড্ডা দিতে আসিনি। এসেছি জন্ম সার্থক করার জন্য। আমরা পশুপক্ষী নই। পশুপক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ কিছু নেই। তারা খায় দায় আর সৃষ্টি করে। এই হোল তাদের খেলাঘর। কিন্তু তোমার খেলাঘর তা নয়। তাই তোমাকে বিচারাসনে বসে বিচার করতে হবে। এজন্য ভগবান মানুষকেই সর্বশক্তি দিয়েছেন তাঁর কাছে পৌছবার জন্য। তাঁর কাছে যাবার

মরণের ভ্রমজ্ঞান সেখানে ফুটিতে পারে না। ইহা দ্বন্দ্বতীত অবস্থা বা পরম প্রজ্ঞার অবস্থা। প্রথম তিনটি ভূমি মুমুক্ষুদিগের। চতুর্থ ভূমিস্থিত যোগীকে ব্রহ্মবিদ্ বলা যায়। অসংশক্তি নামক পঞ্চ ম অবস্থায় যোগীর অবিদ্যার কার্যে আসক্তি থাকে না। ইঁহারাই ব্রহ্মবিদবর। পরে পদার্থভাবনী ষষ্ঠ ভূমিকা। এই অবস্থায় ভিতর, বাহির স্থূল সূক্ষ্ম বলিয়া কিছু থাকে না। কোন পদার্থ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকে না। আমি, তুমি ইত্যকার কোন বোধ থাকে না। এই যে জ্ঞানী ও যোগী পুরুষ ইনি ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে উৎকৃষ্টতর। অতঃপর সপ্তম ভূমিকা হইল তুর্যগা। ইহাই সমাধির শেষ অবস্থা। যোগের যে সপ্তমী ভূমিকা তাহাকেই বিদেহ মুক্ততা বলা হয়। সেই অবস্থা বাক্যের অগম্য। 'কেবলং জ্ঞানমূতিং— সাক্ষাৎ শিবরূপ বা ব্রহ্মরূপ। যোগী সেই অবস্থায় সকল দিকেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ হইয়া থাকেন। সেই যে অবস্থা তাহাকে তুরীয় অবস্থা বলা হয়। যিনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে উৎকৃষ্টতম বলা হয়। উক্ত সাতটি ভূমিকার মধ্যে চতুর্থী ভূমিকাটি জ্ঞানের অবস্থা, তাহার পূর্ববর্তী তিনটি অবস্থা তাহারই সাধনস্বরূপ আর উহার পরবর্তী তিনটি ভূমিকা জীবন্মুক্তির অবস্থা বলিয়া কথিত হয়।

অধ্যাত্ম জগতে ক্রমোচ্চ ভূমি বা অবস্থা লাভ করিবার জন্যই সদ্‌গুরুর আশ্রয় লওয়া। আবার দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেই জীবনে কৃতার্থতা আসে না। পরপর কৃত্যগুলির কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। সাধকের সাধন প্রযত্ন অবশ্যই প্রয়োজন। দীক্ষা গ্রহণ করিলে সাধন জগতে প্রবেশাধিকার মাত্র লাভ হয়। তাহার পর সাধন প্রযত্ন দ্বারা নিজেকেই পরপর ঊর্দ্ধভূমিতে আরোহন করিতে হয়। সাধক যখন তুরীয় ভূমিতে আরোহন করেন, তখন সেই অবস্থায় শরীর বেশীদিন থাকে না। বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্রের ন্যায় উহা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।।

জন্য তিনি একটা বিচার আসন দিয়েছেন। তাই যতরকম প্রশ্ন, যতরকম চাওয়ার সব মানুষের কাছে এসেছে। এই চাওয়া যখন মানুষের কাছেই এসেছে তখন তাকেই সর্বদা বিচার করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ দেহ সংক্রান্ত বিচারটা কেমন হবে ঠাকুর?

উত্তর ঃ আমাদের এই দেহ সপ্ত ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেই সপ্ত ধাতু হল রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র। এই সপ্ত ধাতু থেকে যখন দেহের উৎপত্তি তখন তার মধ্যে সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন। কিন্তু কে এই সৃষ্টিকর্তা? শুক্রই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, শুক্রই হলেন আচার্য, এইজন্য শুক্রাচার্য। তিনি দৈত্যগুরু। এই জগৎটা হচ্ছে দৈত্যদানবের খেলা। এখানে শুভ অশুভ, সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ, আলো অন্ধকার এই দুটো একসঙ্গে খেলা করছে অনাদি অনন্তকাল ধরে। এই খেলা নিয়ে আমরা খেলতে এসেছি। তার মধ্যে স্রষ্টা কে? কে গুরুরূপে, আচার্যরূপে বিশ্বটাকে চালনা করছেন? তিনি হলেন একমাত্র শুক্র। যে শুক্রটাকে কীট বলে মনে করি তা নয়। শুক্রাচার্য অর্থাৎ শুক্র যিনি আচার্য। তিনি এই বিশ্বটাকে সৃষ্টি করেছেন। আর কি বলব। শুক্রটাকে, বীর্যকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। এইভাবে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য নিজ নিজ ভ্রান্তির পথে ছুটে বেড়াচ্ছে। এইভাবে আস্তাকুঁড়ে, এখানে ওখানে ছুঁড়ে ফেলে গুরুত্যাগী হচ্ছে।* সুতরাং মানুষ সত্যকে এড়িয়ে চামড়া, মাংস নিয়ে কামড়া-কামড়ি করছে। যিনি আচার্যদেব তাঁকে তো ঊর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারছে না। শুক্রকে গর্ভে ফেলে তা থেকে যা তৈরী হচ্ছে পরে তার পিছনে ছুটছে। ওটা কে? আমারই শুক্র, আমারই শুক্রকীটের খেলা। আমি আমারই শুক্রকে গর্ভে ছুঁড়ে ফেলেছি এবং পরে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের ধারায় সে যখন আমার কাছে আবির্ভূত হয় আমি তাতেই মোহিত হচ্ছি। উন্মাদ হচ্ছি। কিন্তু আচার্যদেবকে ঠিক ঠিকভাবে আচার্য বলে পূজা করতে পারছি না। এইভাবে বিচার করতে হয়। বিচার করতে করতে ক্রমশঃ প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তির পথ ধরতে পারি।

**রহস্যার্থ—মানব শরীর সপ্তধাতুতে গঠিত। এই সপ্তধাতু হইল রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। এই সপ্তধাতুর মধ্যে শুক্র বা বীর্যই প্রধান বা সকল ধাতুর সার। সেইজন্য বীর্যধারণ করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিতে হইবে। শাস্ত্রে আছে "বীর্যধারণম্ ব্রহ্মচর্যম্। অর্থাৎ বীর্যধারণই ব্রহ্মচর্য। ইহাকে অবলম্বন করিয়া মানব সাধনার চরম সোপানে উঠিয়া নিজেকে জানিয়া পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। সাধক কবির ভাষায়—*

"মস্তিষ্কের সনে গাঁথা—শুক্র আর প্রাণ।
এক ক্ষয়ে আর ক্ষয় সাধু সাবধান।।

এই বীর্যই জীবের জীবনীশক্তি, প্রাণের অবলম্বন। বীর্যধারণই হইল জীবন।

বীর্যপাতই মৃত্যু। 'শুক্র ধাতু ভবেৎ প্রাণঃ' অর্থাৎ শুক্রই হইতেছে প্রাণ। এই প্রাণকে পাইতে হইলে দেহ মন্দিরের অভ্যন্তরে যজ্ঞ করিতে হইবে। মানবদেহের অভ্যন্তরে ষট্‌চক্র আছে যাহা যোগীজনধ্যানগম্য। সেই ষট্‌চক্রের স্তরে স্তরে মাতৃপূজার আয়োজন ও তাহার সাধন করিতে হইবে। বিভিন্ন স্তরে আছে বিভিন্ন বর্ণের পদ্মকলি। চৈতন্যময়ীর চৈতন্য সম্পাদন ব্যতীত সেগুলি নতশিরে থাকিয়া শুকাইয়া যাইতেছে। সূর্যের অনুদয়ে কমলিনী (পদ্মের ঝাড়) যেমন প্রস্ফুটিত হইতে পারে না তেমনি মূলাধারাদি চক্রে অবস্থিত পদ্মসকল সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তিনী জগদ্ধাত্রী জননীর হিরন্ময় কিরণ বিহনে অস্ফুটন্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ুর অভাবে কমলিনীর সুগন্ধ যেমন বিস্তৃত হয় না, তেমনি মানব তোমার প্রাণবায়ুর কোমল স্পর্শ না পাইয়া ঐ পদ্মসকলের সুগন্ধ মাতৃমন্দিরকে সুগন্ধযুক্ত করিতে পারে না। ভ্রমর যেমন মধুর আশায় পদ্মে পদ্মে ভ্রমণ করে তেমনি আমার প্রাণসম বন্ধুগণ, তোমরাও গুরুপদেশমত পদ্মে পদ্মে পরিভ্রমণ কর। তৃষ্ণার আগুন বুকে লইয়া, প্রাণের আকুলতা চক্ষে মাখাইয়া গুরুপ্রদর্শিত পথে পদ্মে পদ্মে ওঁকার ক্রিয়ার মাধ্যমে পরিভ্রমণ কর। তোমার শ্রদ্ধা মিশ্রিত কাতর মন্ত্রজপরূপ গুন্‌গুন্ রবে ক্ষীরোদার্ণবশায়িনী পদ্মালয়া জননীর আমার নিদ্রাভঙ্গ হইবে। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি পদ্মবনে ঊর্দ্ধমুখে আরোহন করিতে চেষ্টা করিবেন। সাধক কবির ভাষায় "মা নয় সামান্য মেয়ে, সে যে মূলাধারে সহস্রারে উঠছে ধেয়ে ধেয়ে।" সাধক! মধুলব্ধ ভ্রমরের ন্যায় তুমি তখন মাতৃঅঙ্ক জড়াইয়া ধরিবে। ভ্রমরের ন্যায় তোমার মনরূপ চরণ পদ্মমধুতে আটকাইয়া যাইবে। তোমার এ সংসারে যাতায়াতরূপ গতিরুদ্ধ হইবে।

মাতৃপূজার অব্যবহিত পরেই দেখিবে যে, রক্তিমরাগে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তোমার মণিপুরে মণিময় দেশকে মণিময় কিরণে মণ্ডিত করিয়া ত্রিলোক বরেণ্য সবিতৃ মণ্ডল উদিত হইবেন। তোমার ললাটদেশে সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রও উদ্ভাসিত হইবেন। চন্দ্রের কিরণে, রবির আলোকে মাখামাখি হইলে নবঘনশ্যামের প্রাণমাতানো রূপের আবির্ভাব হইবে এবং সেই আলোমাখা নয়নাভিরাম কালোরূপ তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। সেই অপূর্ব অপরূপ শোভা যদি হৃদয়ে দেখিতে চাও তবে সাধক তুমি চন্দ্র হইতে কিরণ সংগ্রহ করিয়া সূর্যে ঢালিয়া দাও। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, পিঙ্গলায় (দক্ষিণ নাসায়) যে বায়ু বহে তাহাই সূর্য্য এবং ইড়ায় (বামনাসায়) যে বায়ু বহে তাহাই চন্দ্র। প্রাণায়ামের দ্বারা এই উভয় বায়ুর যখন মিলন হয় তখনই চন্দ্রের ও সূর্যের কিরণে মাখামাখি হইয়া যায়।

তাই বলিতেছি সাধক তুমি খেচরী মুদ্রা সহ প্রতি পদ্মে পদ্মে ওঁকার ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণকে টানা ফেলা কর। যতক্ষণ না পদ্মের সুধায় তোমার মনরূপ ভ্রমরের চরণ আটকাইয়া, জড়াইয়া যায়, ততক্ষণ চন্দ্রের কিরণ আনিয়া সূর্যে আহুতি দাও। সূর্য প্রখর হইবে—পদ্ম ফুটিবে।

মনের অধিপতি দেবতার নাম চন্দ্র। এই চন্দ্রকে ইহার স্বস্থানে অর্থাৎ ললাটে ধারণ করিতে পারিলে জীব চন্দ্রশেখর হয়। তখন ইহা হইতে স্নিগ্ধ কৌমুদী রাশি বিকীর্ণ হইয়া দিঙ্‌মণ্ডলে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। অপূর্ব হৈম জ্যোতিতে প্রাণপূর্ণ হয়। এই জ্যোতির অমিয় ধারা সুষুম্না পথের আকাশ মার্গে নাভিস্থ বৈশ্বানরে বা সূর্যে ঢালিয়া দিতে হয়। বিষয় সকলের সংস্কার রাশি ঐ চন্দ্র কিরণ ধরিয়া বৈশ্বানর অগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়। আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যস্থল দিয়া এই সুষুম্নাপথ প্রবাহিত। ইহার অভ্যন্তরে সুনীল স্বচ্ছ আকাশ বিদ্যমান। এই আকাশে প্রবেশ করিতে পারিলে ব্রহ্মময়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাই ইহার অপর নাম ব্রহ্মনাড়ী।

ব্রহ্ম হইতে ভাবরূপ কর্ম, ভাব হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে, অন্ন, অন্ন হইতে ভূতের উৎপত্তি। আবার ইহার অনুবর্তনে ভূত হইতে ভগবদ্‌ভাব, ভগবদ্‌ভাব হইতে যজ্ঞ বা ঈশ্বরমুখী আশ্রমোচিত কর্ম, তাহা হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে ভূত। অথবা যেমন আজ্ঞা হইতে বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ হইতে অনাহত, অনাহত হইতে মণিপুর, মণিপুর হইতে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান হইতে মূলাধার, তদ্রূপ আবার মূলাধার হইতে স্বাধিষ্টান, স্বাধিষ্টান হইতে মণিপুর, মণিপুর হইতে অনাহত, অনাহত হইতে বিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ হইতে আজ্ঞা এই নিম্নঊর্দ্ধভাবে চক্রবৎ গতি যে না অনুধাবন করে তাহার জীবন বৃথা। কর্ম হইতে শুক্র উদ্ভূত হয়। মন বহির্মুখী কর্মে নিযুক্ত হইলে বাহ্যশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় ও শুক্র সঞ্জাত হইয়া থাকে। এই শুক্রই বাহ্য স্থূল শক্তির আধার—গুরু। আসুরিক শক্তি ও ইহা হইতে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। এইজন্য শুক্রাচার্য অসুরকুলের গুরু বলিয়া পুরাণে বর্ণিত। মন ভগবৎমুখী কর্মে নিযুক্ত হইলে তাহা হইতে ধীশক্তি বা চৈতন্য শক্তি পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইহার অন্য নাম দেবশক্তি। ইহার গুরু বৃহস্পতি। মন বা চন্দ্র সাধারণতঃ বহির্মুখী অবস্থার প্রলোভনে মুগ্ধ থাকিয়া এই চৈতন্য শক্তির কার্যকারিতা অপহরণ করে ও বাহ্য কর্মে সঙ্গত হয়। ইহাই পুরাণে চন্দ্রের গুরুপত্নী হরণ। ইহা হইতে সাধারণ বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ইত্যাদি সঞ্জাত হয়, যাহার অধিপতি বুধ। ইহাই হইল চন্দ্রের ঔরসে গুরুপত্নী গর্ভে বুধের জন্ম। পুরাণে আছে—চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ ও সম্ভোগ করিয়া অসুর কুলের গুরু শুক্রের শরণাগত হইয়াছিলেন। পরে বৃহস্পতি ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের শরণাগত হওয়ায় তাঁহারা শুক্রাচার্য্যকে চন্দ্র ও তারাকে তন্মুহূর্তে তাঁহাদিগের সম্মুখে লইয়া আসিতে বলেন। মহেশ্বর কোপাবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকে ধ্বংস করিবেন এইরূপ সংকল্প করায় শুক্রাচার্য্য স্তব-স্তুতির দ্বারা তাঁহার সন্তোষবিধান করেন। উদার হৃদয় আশুতোষের সমস্ত ক্রোধ দূরীভূত হইল এবং শরণাগত চন্দ্রকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক অংশ নিজ ললাটে ধারণ করিলেন। অপরাংশ দেবসভার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত রহিল। তারার অভিশাপে চন্দ্র তদবধি ক্ষয়রোগগ্রস্ত। পক্ষে পক্ষে চন্দ্রের যে হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই তারার অভিশাপই তাহার কারণ। মন ধীশক্তিকে অপহরণ করিয়া

বর্হিমুখে কার্য্যকরী হইলে শুক্রস্থানে শক্তি সঞ্চিত হয় অর্থাৎ মনঃশক্তি দৈহিকশক্তিরূপে পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। দেহশক্তির আধার শুক্র। এই শুক্রই সমস্ত দৈহিকশক্তির মূল।

যাহা হউক ধী বা চৈতন্যের কার্য্যকরী শক্তিকে পুনরায় লাভ করিতে হইলে জীবকে সৃষ্টিশক্তি ও লয়শক্তি বা ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের শরণাগত হইতে হয় অর্থাৎ গুরুপদিষ্ট উপায়ে একবার সৃষ্টিমুখে ও একবার লয়মুখে—এইরূপে সাধনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। প্রাণক্রিয়া দ্বারা মন যখন মূলাধার হইতে চক্রে চক্রে স্পর্শ করিয়া আজ্ঞাচক্রে স্থিত হয় তখন মনের লয় হয় ও মহেশ্বরের শরণাগত হয়। আবার আজ্ঞাচক্র হইতে বিসর্জন করিতে করিতে মূলাধারে নামিয়া সৃষ্টিমুখে ব্রহ্মার শরণাগত হয়। তখন শুক্রের আশ্রয়স্থিত চৈতন্য বা ধীশক্তি পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনাধিপতি চন্দ্র তখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক অংশ লয়রূপ সাধনার শিরোভূষণরূপে শোভা পায়। জ্যোতির অন্তর্গত এই মন সাধকের উপলব্ধিতে আসে। ক্ষয় ও বর্দ্ধনধর্মী অন্য অংশ স্বস্থানে থাকিয়া কার্য্য করে বা সাধারণ মনোময় ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য করে। মানুষের মন কখন ইচ্ছানুযায়ী সত্তস্ফূরণশীল আবার কখনও যেন অবসাদগ্রস্ত জ্যোতিহীনরূপে প্রতীয়মান হয়। উক্ত ক্ষয় ও বর্দ্ধনই উহার কারণ। জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থাও মনের এই ক্ষয় ও বর্দ্ধনরূপ উভয়বিধ গতির লক্ষণ।

মনাধিপতি চন্দ্রের গুরু বৃহস্পতি। মন যখন ঊর্দ্ধমুখে কার্য্য করে অর্থাৎ মনপ্রাণ যখন আজ্ঞাচক্রে স্থিত হয় তখন সে গুরুপত্নীর সেবক। অর্থাৎ শক্তিমান ও শক্তি অভিন্ন। তেমনই গুরু ও গুরুশক্তিও অভিন্ন। তাই মন তখন গুরুর সেবক। আর মন যখন নিম্নমুখে কার্য্য করে তখন গুরুপত্নীর অপহারক মাত্র এবং গুরুরও অবমাননাকারী। ইহাই পূজ্যপাদ্য স্বামী ভবানন্দগিরি মহারাজের ভাষায় 'জীব গুরুত্যাগী হচ্ছে'। তাই সাধারণ জীবজগতের মন কলঙ্কিত, ক্ষয়রোগগ্রস্ত।

লয়শক্তির সাধনায় মনকে ঊর্দ্ধমুখে পরিচালিত করিলে তবে মহেশ্বরের কৃপায় উহা আবার বর্দ্ধনশক্তিকে লাভ করিবে। মনের তখন ক্ষয়ও বর্দ্ধনধর্ম সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে। মনোময় ক্ষেত্র কখনও ক্ষয়যুক্ত কখনও বা বর্দ্ধনশীল, তাহা মনের অবস্থা পরিদর্শন করিলেও সহজে বুঝা যায়।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের এই দুরপণেয় কলঙ্কমোচন করিতে আমাদের কৃতসংকল্প হইতে হইবে। হে দেবগুরু চৈতন্য! তোমার ধীশক্তিরূপিণী পত্নী তোমার প্রিয় শিষ্য মনের দ্বারা অপহৃতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া কলংকিণীর ন্যায় অপদস্থা রহিয়াছে। সৃষ্টি ও লয়শক্তির শরণাগত হইয়া তোমার পত্নীর উদ্ধার সাধন কর। তোমার প্রিয় শিষ্যের উদ্ধার সাধন কর। তুমি শক্তিযুক্ত হইয়া স্বীয় গুরুত্ব রক্ষা কর।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু তা কি গুরুকৃপা ছাড়া সম্ভব?

উত্তরঃ তাঁর কৃপা তো আছে। কিন্তু আমাকে করে পেতে হবে। কৃপা মানে করে পাওয়া। বিরাটের পথে যেতে হলে এই মাংস চামড়া নিয়ে খেলা বাদ দিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ করে পাওয়া মানে কি আত্মকর্ম করে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আত্মকর্ম করে। সংযত হয়ে পুনঃপুনঃ অভ্যাস করতে হবে। তবেই পাওয়া যাবে। কি পাওয়া যাবে? না তখন সংযমের পথ পাওয়া যাবে। সংযমের পথে মন অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিকে করতলগত করতে হবে। মনটা খুঁজে পাবে না, প্রাণটা খুঁজে পাবে না। ইচ্ছাশক্তি পাবে। ওটাকে আপন করে নেওয়া। ঐটা যেন তোমার কাছে বিটলামি না করে। তাহলে ফুরিয়ে গেল। ঐটাকে ধরতে পারলে প্রাণ, মন ধরতে পারবে। ইচ্ছাশক্তিকে স্বাধীন করে রাখলে মন তখন আর কিছু করতে পারবে না। তখন মনটা শান্ত হয়ে বুদ্ধির দিকে যাবে।

প্রশ্ন ঃ বুদ্ধির দিকে বলতে কি বোঝাচ্ছে?

উত্তর ঃ সেই বুদ্ধিটা হচ্ছে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি আমাদের ঠিক ঠিকভাবে পথে টেনে নিয়ে যাবে। এইগুলি পুনঃ পুনঃ চিন্তা কর, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর। অভ্যাস না করে, চিন্তা না করে সকলে এ করব, ও করব, সে করব এ সব কথা না বলে নিজ নিজভাবে বিভার হয়ে নিজ খেলাঘরের দিকে এগিয়ে যেতে থাক।

প্রশ্ন ঃ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির পরে তো অহংকার রয়েছে?

উত্তর ঃ এটা যখন জানতে পারবে তখন। এটা জিজ্ঞাসাবাদ নয়। অহংকার থাকবে কেন?

প্রশ্ন ঃ বুদ্ধির পরে তো অহংকার?

উত্তর ঃ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি মানেই হচ্ছে তোমার অহংকার তোমার পথ আগলে আছে। সোহং এ যেতে দিচ্ছে না। সেটা বুঝতে পারবে। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি কাটিয়ে দেবে।

প্রশ্ন ঃ মনেরই অপর নাম ইচ্ছাশক্তি বললেন। এছাড়া মনের আর কোন ব্যাখ্যা যদি দয়া করে বলেন—

উত্তর ঃ আমরা যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি যে কর্মই করি না কেন, সেই সব কর্মের পেছনে থাকে সংকল্প। প্রত্যেক কর্মেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। বিনা সংকল্পে কোন কাজ হয় না। সংকল্পই একমাত্র ইচ্ছাশক্তি। এই সংকল্প আর ইচ্ছাশক্তি একই মনের দুই রূপ।

প্রশ্ন ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে "সংকল্পো বিকল্প ত্যাগঃ যোগঃ।" বিকল্প কি?

উত্তর ঃ বিকল্পটাও ইচ্ছাশক্তি। আমি ওটা করব না, ও কাজ করব না বলেই যখন আমার প্রবল ইচ্ছা হবে তখনই সেটা হচ্ছে বিকল্প। কিন্তু সংকল্প না করলে কাজ করতে পারবে না, সংকল্প আমাদের অধীন করে রেখেছে।

এখানে কথা হচ্ছে সংকল্পটা যে ইচ্ছাশক্তি, এটা যেন ক্ষুদ্র না হয়। সংকল্পটা যদি বিরাট হয় তবে বিরাটের আসনে বসাতে হবে তাকে। তখন তাকে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি অন্তঃকরণকে বিরাটের আসনে বসিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছাশক্তিটা আর খেলা করবে না। সংকল্প আর ঐ ইচ্ছাশক্তি একই শুধু ডানে, বামে ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু বিরাটের আসনে বসেও তো অনেকে ক্ষুদ্রে সংকল্পে ডুবে যাচ্ছে। এটি হয় কেন?

উত্তর ঃ দেখতে হবে সংকল্পটা আসছে কেন? এই সংকল্প সংকল্পবিহীন কর্মের দ্বারাই শেষ হবে। সংকল্পবিহীন কর্ম একমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস। এছাড়া বিশ্বে আর সংকল্পবিকল্প নাই।

প্রশ্ন ঃ প্রাণকর্মই কি সংকল্পবিহীন কর্ম?

উত্তর ঃ ইহা ধ্রুব সত্য! সকালে উঠে কেউ কি বলে যে, আমাকে নিশ্বাসটা নিতে হবে? তা কেউ বলে না। কর্ম করতে করতে কেউ কি বলে আমার নিশ্বাসটা নিতে হবে? সংকল্পবিহীনভাবে আপনি কর্ম হচ্ছে। এছাড়া বিশ্বে আর সংকল্পবিহীন কর্ম নেই। এই সংকল্পবিহীন কর্ম দ্বারা সংকল্পবিহীন রাজ্যে গিয়ে প্রভুর সঙ্গ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ বিশ্বস্রষ্টা ভগবান কি তাহলে আমাদের এই কর্ম করতে পাঠিয়েছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, কিন্তু তরঙ্গ না থামলে, সমুদ্রের তলে সংকল্পবিহীন রাজ্যে যাবে কি করে? উপরে তো তরঙ্গ আছে, বুদ্‌বুদ্ আছে, ফেনা আছে, কত কি আছে। ইত্যাদির দ্বারা আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে! কিন্তু সমুদ্রের তলা যে শান্ত। তলায় ডুবার ইচ্ছা হলে ভিতরে যেতে হবে।

প্রশ্নঃ ভিতরে যাবার কৌশলটা কি?

উত্তর ঃ সেটাই হল প্রাণকর্ম। তা গুরুমুখী। ঐ প্রাণকর্মকে অবলম্বন করেই আমরা বেঁচে আছি। যাকে অবলম্বন করে বেঁচে আছি সেইটাই নিষ্কাম কর্ম। আর কোন অবলম্বন নেই আমাদের। ঐ একমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস।

প্রশ্ন ঃ তাহলে প্রাণকর্মের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ করে আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে অন্তর্মুখী করতে হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ইচ্ছাশক্তিকে বহির্মুখী না হতে দিয়ে অন্তর্মুখী অর্থাৎ কূটস্থে নিয়োগ করতে হবে। তবেই সেই পরমপুরুষের, পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে আমরা পৌঁছাতে পারি।

প্রশ্ন ঃ এখানে পরম ঈশ্বর বলা হল কেন? ঈশ্বর বললে তো হোত। পরম বলা হল কেন?

উত্তর ঃ পরম বলা হল কারণ তাঁর চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ নাই।

প্রশ্ন ঃ সেই একই পরমেশ্বরকে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্নরূপে, বিভিন্নভাবে কি আস্বাদন করতে চাইছে?

উত্তর ঃ যে যেভাবেই আস্বাদন করুক না কেন, তিনি সেই একই আছেন। শ্বাসকে তুমি যেভাবেই নাও, শ্বাসতো বটে। তার কোন ভেদবুদ্ধি নেই, সাম্প্রদায়িকতা নেই। যে পথে সাম্প্রদায়িকতা, ভেদবুদ্ধি নেই, যে পথে গেলে কোন সর্বশ্রী নষ্ট হয় না সেই পথই বিরাট সত্যের পথ! এবং তা বিরাটেই পৌঁছে দেয়। ম্যাগনেটাজড্ ভক্তকে ম্যাগনেটের পথে নিয়ে যায়, ম্যাগনেটাইজড্ করিয়ে দেয়। তার চেয়ে আর বড় জিনিষ নাই।

প্রশ্ন ঃ ম্যাগনেটাইজড্ কি গুরুদেব?

উত্তর ঃ কর্ম করতে করতে তার একটা আকর্ষণ আসে। আকর্ষণ আসছে এবং আমি তাতে মশগুল হয়ে যাচ্ছি। নেশা করলে যেমন মানুষ মশগুল হয় তেমনিভাবে আমরা সাধনায় মশগুল হচ্ছি। সেটাই হচ্ছে ম্যাগনেটাইজডহয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন ঃ বহির্জগতের মানুষেরাও কর্ম করে মশগুল হয়ে যাচ্ছে। ওরাওতো তার মধ্যে আনন্দ পেতে চাইছে। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ সে আনন্দটা কিছুই নয়। গাঁজা, মদ খেলে একটু নেশা হয় বটে, কিন্তু সেটা কিছু নয়। সেটা ভ্রান্তির খেলা। মশগুল হবে কোথায়? যে নেশা করে বেঁচে আছি, যে নেশা করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে তাতে মশগুল হয়ে আছি। শ্বাস, প্রশ্বাস— এ নেশা না করলে আমরা বাঁচতে পারি না। এ নেশার সংকল্পবিকল্প নেই। কর্ম কর, সাধু গুরুসঙ্গ কর। তবে এসব ঠিক বুঝবে। নিজেকে নিজে বুঝে ফেলেছি বলে মনে করো না। তাহলেই সব ঠিক হবে।

প্রশ্ন ঃ তাহলে শ্বাসকে ধরেই কি আমাদের শাশ্বতগতিতে পৌঁছতে হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। শ্বাসকে অবলম্বন করেই আমাদের শাশ্বতগতিতে পৌঁছতে হবে। এটাই ধ্রুব ও চিরন্তন এবং শাশ্বত সত্য। মনের বিষয়মুখী গতিকে বন্ধ করতে না পারলে শাশ্বত গতির দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। যেমন মনে কর তুমি চোখ বন্ধ করলে। চোখ বন্ধ করে অন্ধকার লাগতে পারে, কিন্তু মন তো বন্ধ করতে পারনি। চোখ বন্ধ করলেই ইচ্ছাশক্তি তো বন্ধ হয় না, অন্তঃকরণ তো বন্ধ হয় না। তবে বন্ধ কি হয়? বন্ধ হয় তোমার গতি। এই গতিকে নষ্ট করতে না পারলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেতে পারবে না। চোখ বন্ধ করে আমি

সবদিক দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছি। সেজন্য অন্তঃকরণ নিয়ে আমাদের চলতে হবে। অন্তঃকরণই হচ্ছে আমাদের পাথেয়স্বরূপ। আমরা কথায় বলি লোকটার অন্তঃকরণ ভাল। উঃ বড় অন্তঃকরণ। এই যে আমরা ব্যাখ্যা করি তা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহংকার নিয়ে অন্তকরণ তৈরী হয়।* মন, বুদ্ধি, চিত্ত তারপর হচ্ছে অহংকার। আমরা অনেক সময় বলি আমার মত কেউ সাধনা করে না, আমি তিন ঘন্টা আহ্নিক করি ইত্যাদি। এটা অহমিকা, অহংকার।

** ভাবার্থ— প্রাণ দেহে অবস্থান করিয়া কিভাবে চতুষ্টয় অন্তঃকরণরূপে ক্রিয়া করে তাহা বলা হইতেছে। মন অনিত্য ও নিরবয়ব; কিন্তু উৎপন্ন বস্তু। কপিল ঋষি বলেন "মন একটি দেহস্থ বস্তু। মনদেহাশ্রিত পদার্থ বটে; কিন্তু অস্থি-মাংসাদির ন্যায় নহে। অবয়বের ধ্বংস হয়, অর্থাৎ তাহা পঞ্চ ভূতে বিলীন হয়। মন অবয়ব নহে বলিয়া উহা ক্ষণবিধ্বংসী নহে। তবে শরীরের বিনাশ হইলে, মন তাহাতে থাকে না। মন সূক্ষ্ম দ্রব্য। বায়বীয় পরমাণুর ন্যায়। মন এককালে বা ততোধিক বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। জীবের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত মন জীবিত। মন নিরাকারা না হইলে কাহারও সহিত সংযুক্ত হইত না। তাই শাস্ত্রে আছেঃ—*

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্বিষয়ং স্মৃতম্।।"

মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ—বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের হেতু এবং নির্বিষয়মন মুক্তির হেতুরূপে চিন্তিত হয়। সমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গ উত্থিত হইয়া পুনঃ সমুদ্রেতেই বিলীন হয়, ব্রহ্ম সমুদ্রেও তেমনই নামরূপময় জগৎ তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইয়া পুনরায় তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। ব্রহ্মের বহু হইবার সংকল্প হইতেই এই নামরূপময় জগদাদির প্রাদুর্ভাব হয়। ব্রহ্মইচ্ছা করিলেই তাঁহার মধ্যে যে স্পন্দন হয়, তাহাই জগৎযোনি প্রাণশক্তি। সেই প্রাণশক্তি চঞ্চ ল হইয়া সংকল্পময় মন উৎপন্ন করিয়া থাকে। প্রাণশক্তির যে চাঞ্চ ল্য তাহাই পঞ্চ প্রাণরূপে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে প্রবাহিত হইতেছে। শ্বাস- প্রশ্বাসের প্রবাহ হইতে প্রাণের সুপ্ত সংস্কারসমূহ জাগরিত হইয়া মন আকারে পরিণাম লাভ করে। মনের কোন প্রকার রূপ দৃষ্ট হয়না। কেবল তাঁহার নামই শুনা যায় এবং তজ্জনিত এক প্রকার জ্ঞানও হইয়া থাকে। আকাশের ন্যায় মনের কোনও আকার বা রূপ নাই। ভ্রম জ্ঞানই তাহার আকার অর্থাৎ যাহা অন্তরে ও বাহিরে বস্তুর আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই মন। এতদ্‌ভিন্ন মনের অন্য আকার নাই অথবা সংকল্পই মন। যেমন দ্রবত্ব হইতে জল ভিন্ন নহে, সেইরূপ মনও সংকল্প হইতে ভিন্ন নহে। এই মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকাররূপে চারিটি অবস্থায় চারি প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে। যখন তোমার মন কোন বস্তু বা দৃশ্য দেখিয়া সংকল্প-বিকল্প বা সংশয় সন্দেহ করিতে থাকে, মনের সেই অবস্থার নাম "মন"। মনে কর তুমি একটি বাঘ দেখিতে পাইলে, এই বাঘ দেখিবামাত্র তোমার মন সংশয় বা সন্দেহ করিতেছে যে, "ইহা কি বাঘ না শিয়াল? এই যে মনের সন্দেহজনক অবস্থা ইহারই নাম "মন"। ঠিক পরক্ষণেই এই মন বুদ্ধিরূপে আসিয়া বিচার করিল যে, "ইহা বাঘ"। এই যে মনের বিচারশক্তি বা নিশ্চয়াত্মক অবস্থা, ইহার নাম "বুদ্ধি"। এই বুদ্ধি বাঘ বলিয়া নিশ্চয় করিতে করিতেই, সেই মন চিত্তরূপে আসিয়া চিন্তা করত পূর্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিল, "বাঘে মানুষ খায়"। এই যে মনের ধারণাশক্তি, ইহারই নাম "চিত্ত"। তৎপরে তোমার মন অহংকাররূপে আসিয়া পূর্বের বদ্ধসংস্কার বশে বলিয়া উঠিল— শুনিয়াছি, "বাঘে মানুষ খায়", আমি মানুষ, অতএব আমাকে বাঘ খাইবে। এই বলিয়া ভয়ে দৌড়াইয়া তুমি (মন) পলায়ন করিলে। "আমি মানুষ" এই বলিয়া মনের যে দেহাভিমান ইহারই নাম "অহংকার"। এইভাবে মনক্রিয়া করিতে থাকে।

মন যতদিন না স্থির হয়, ততদিন জীবের আত্ম-প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত। চঞ্চলতাই মনের জীবন। ঐ চঞ্চলতা যতক্ষণ না বোধহয় ততক্ষণই এই সংসারের সুখঃদুঃখের খেলা চলিতে থাকে। তাই মদীয় শ্রীগুরুদেব স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজ বলিয়াছেন যে, মনের অপর নাম "ইচ্ছাশক্তি"। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে সর্বপ্রথম সাধকের ইচ্ছাশক্তিকে অর্থাৎ মনের গতিরোধ করিবার জন্য প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিতে হইবে। সাধক হইতে হইলে সর্বাগ্রে ইচ্ছাশক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। অর্থাৎ মনকে বহির্মুখীন না করিয়া অন্তর্মুখীন করিতে হইবে। প্রাণক্রিয়া দ্বারা প্রাণ মস্তকে চড়িয়া বসিলে তবেই মন শান্ত হইবে। ইচ্ছাশক্তি অমোঘ। ইচ্ছাশক্তিকে সমগ্র প্রাণের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতে না পারিলে জীব কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা না করিয়া মনকে নিজেই চাবুক মারিয়া ঘোড়ার মত ছুটাইতেছি আর বলিতেছি শান্তি কই, সুখ কই? ঈশ্বর দর্শন কিরূপে হইবে? প্রাণের স্থূল অবস্থার নাম শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাস দর্শনই ঈশ্বর দর্শনের সূত্রপাত। শ্বাসে চৈতন্য, শ্বাস দর্শনই চৈতন্যদর্শন। শ্বাস গেলেই চৈতন্য গেল। শ্বাস দেখি, শ্বাস গণি তাকে বলে অজপাজপ। এই অজপাজপ করাই সুখশান্তি পাইবার একমাত্র উপায়। "আমি দেহ ত নয়, আমি শ্বাস চৈতন্য আকাশময়।"

আমি শ্বাস চৈতন্য শূন্যবাসী।
নাসাপথে দেহে আসি।।
শ্বাস বন্ধ করিয়াই দেখ আমি দেহে নাই।
শ্বাসে শ্বাসে কি করছি,
শ্বাসে শ্বাসে আকাশময় প্রাণ ধরে টান্‌চি।

প্রাণসাগরে ঢেউগুলি সব বুকের মধ্যে আন্‌চি।
আকাশময় মহাপ্রাণে "অহং" যুক্ত করচি।
প্রাণপূর্ণ আকাশের গায় শ্বাস ধরে ঝুলচি।।
প্রাণের সাগর হইতে শ্বাস টেনে নিচ্ছি।
প্রাণের সাগরে আবার শ্বাস ফেলে দিচ্ছি।।

অতএব, প্রাণ না দিলে প্রাণকে পাওয়া যায় না। এই প্রাণকে পাইতে হইলে প্রাণক্রিয়া অর্থাৎ প্রাণায়াম করিতে হইবে তবেই শ্বাসে লক্ষ্য পড়িবে এবং সাধক মুক্তিলাভ করিবে। পুজ্যপাদ যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন—

"কূটস্থে দৃষ্টি ভাল শ্বাসে দৃষ্টি আরো ভাল।
শ্বাসে কর লক্ষ্য, আমি দিব সাক্ষ্য—এই পথে মোক্ষ।।"

প্রশ্ন ঃ এটা অহংকার?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এটা অহংকার। সেজন্য বলছি এগিয়ে যাও।

মনরে আমার! তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়
হালে যখন আছেন হরি, যেমন ফাগুন তেমনি
যখন যুঝবে তরী স্রোতের সনে,
টানিস আরো পরাণ পণে,
যখন পালে লাগবে হাওয়া— মনরে আমার
সময় পাবিরে জিরোবার।
মাঝির সেই গানের তালে
চল্ সাথীর সনে সমান টানে,
মনরে আমার, মনরে আমার
চাসনেরে তুই আকাশ-পানে,
হোক-না ফরসা, হোক না আঁধার।।
কখন ঘাটে নাও ভিড়াবি
মনরে আমার—
কখন গাঙে লাগবে ভাঁটা,
কখড় ছুটে আসবে জোয়ার।
মনে রাখিস নিরবধি—
যাঁহারি নাও, তাঁরি নদী,
ভোলা মনরে আমার, মনরে আমার—
যে ফেলবে তোরে বাণের মুখে,
সেই তো তরীর কর্ণধার।।

আমাদের জিরোবার সময় আছে। কিন্তু এখন যুদ্ধ করতে যেতে হবে। দাঁড় বেয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কি হবে, আলো আসছে কি অন্ধকার আসছে, ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছি, কি পাব এসব বিচার না করে বেয়ে যেতে হবে। অনবরত শরণাগত হয়ে সেই শাশ্বত গতির দিকে আত্মনিবেদন কর। এছাড়া আর কোন উপায় নাই। শ্বাসকে অবলম্বন করে একেবারে তাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে যেতে হবে।

আর সেই গতিতে কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি এই তিনটিকে সমন্বয় করে নাও। অহংকার তখন দূরে যাবে। অহংকার দূরে সরে না গেলে প্রকৃত শাশ্বত গতিতে মতি দিয়ে জন্ম সার্থক করার কোন উপায় নেই। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই তিনটিকে সমন্বয় কর। এখন কর্ম, জ্ঞান নিয়ে আগে এগিয়ে যাও। তারপর ভক্তিটা হচ্ছে শেষ সময়। শেষে আমাদের ইন্দ্রিয় বিদায় হয়ে যাবে ঠিক, কিন্তু অন্তঃকরণ বিদায় হবে না। এই যে আমার অন্তঃদৃষ্টি, অন্তঃকরণ এ আমাকে একেবারে সারেণ্ডার করে দিয়ে বিরাটের পথে পৌঁছে দিবে। সেজন্য আমাদের গুরু সন্নিধানে থেকে, গুরুকে সঙ্গ করে পুনঃ পুনঃ তাঁর কাছে তত্ত্বের ও সত্যের অনুশীলন করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত সাধনার একমাত্র পথ।

প্রশ্ন ঃ কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এই তিনটির উৎপত্তি কি থেকে?

উত্তর ঃ এই তিনটি আমাদের ভিতর আছে। কর্ম দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে অনুশীলন করতে হবে। ঠিক ঠিক ভাবে সংকল্পবর্জিত কর্ম আমাকে অনুশীলন করতে হবে। যে কর্ম করলে দাবী থাকবে না, যে কর্মে আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, যে কর্মে সংকল্প থাকবে না সেই কর্মই আমাকে বিরাটের পথে নিয়ে যাবে। বেদে এই কর্মর কথাই উক্ত আছে। কর্মে সংকল্প থাকার জন্যই ঘুরপাক খেতে হয়। বিরাটের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

প্রশ্ন ঃ সংকল্প বর্জিত কর্মটা কি ঠাকুর?

উত্তর ঃ সেটা প্রাণায়াম। তারজন্য সংকল্প আমাদের করতে হয় না। আমি বা কেউ প্রস্তুতি নেয় না যে আমাকে এটা করতে হবে। শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে। শ্বাস প্রশ্বাস না নিলে আমার চলবে না। এ বেহুঁশে হচ্ছে। সংকল্পবিহীন হয়ে আমরা এই কর্মে স্থিত হয়ে আছি। আমরা যখনই সংকল্পবিহীন কর্মের অনুশীলন করব তখনই সংকল্পবিহীন রাজ্যে আমরা অবস্থান করব। প্রাণকর্মই হ'ল একমাত্র সংকল্পবিহীন কর্ম। এছাড়া বিশ্বে আর কোন সংকল্পবিহীন কর্ম কিছু নেই। এই কর্মের প্রস্তুতি দ্বারাই আমরা বিরাটের পথে পৌঁছাব। সুতরাং এই প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের এগুতে হবে।

প্রশ্ন ঃ কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান—এই তিনটির কথা বলেছেন। এই তিনটির মধ্যে

কোনটিকে আমাদের আগে অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর ঃ সর্বপ্রথম কর্মকে অবলম্বন করতে হবে। করে বুঝতে হবে কেন কর্ম করছি, এতে কি হবে? ক্রমে জ্ঞানের পথ পরিস্ফুট হবে। শাশ্বত গতিতে যাবার জন্য, স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার জন্য গুরুর কাছে কর্ম নিতে হবে। পরে এই কর্মের দ্বারাই ক্রমশঃ বিচার, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি উপস্থিত হবে। কর্ম করতে করতে যখন জিজ্ঞাসা আসবে যে, তুমি কর্ম করছ কেন? এতে কি পাচ্ছ, কি পাবে, তখন বিচারে সাব্যস্ত হবে যে তোমার জ্ঞানের প্রয়োজন। বিশ্বে তুমি এসেছ, তুমি ক্ষুদ্র নও, বিরাট তুমি! এই বিরাট বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই তোমার এই কর্মের প্রয়োজন। সেজন্য বেদে দুটো অংশ আছে। একটা কর্মকাণ্ড ও অন্যটা জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডই চরম নয়। কর্ম জ্ঞানে গিয়ে সমাপ্ত হয়। তাই বেদের কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের দিকেই নির্দেশ দেয়। উপনিষদ বলে যে কর্মই শেষ নয়, তোমাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে হবে। তবে কর্ম এবং জ্ঞান এই দুটিকেই অবলম্বন করে আমাদের চলতে হয়। দুটি অবলম্বন না করলে অগ্রসর হওয়া যায় না। যেমন এক হাতে কাজ করা যায় না, এক পায়ে হাঁটা যায় না, বা শুধু বক্তা থাকলেই হয় না, একজন শ্রোতা বা বোদ্ধা চাই তেমনি সাধন পথেও কর্ম, জ্ঞান দুটিকেই অবলম্বন করতে হয়।

জ্ঞান ও কর্ম হল পাখীর ডানা এবং ভক্তি হল পুচ্ছ। দুটি ডানা, একটি পুচ্ছ। শেষে এই যে পুচ্ছটা আছে, সেটা হল হাল। কোনদিকে যাবে, কোথায় যাবে এই সমস্যার সমাধান করে হাল ঠিক নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে নিয়ে যায়। ভক্তিই সাধককে ঠিক লক্ষ্যপথে পৌঁছিয়ে দেয়।

প্রশ্ন ঃ ভক্তি হল হাল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। দুই ডানা ও একটি পুচ্ছ অবলম্বন করে পাখী যেমন বিরাট সত্বায় বিচরণ করতে পারে, তেমনি সাধকও কর্ম, জ্ঞান ভক্তির সমন্বয় করে বিরাটে অবস্থান করে তার জন্ম সার্থক করতে পারে। আমরা কর্ম জ্ঞান এই দুটো অবলম্বন করলাম বটে কিন্তু সারেণ্ডার করতে হবে শেষে ভক্তিতে। ভক্তিতে সারেণ্ডার না করলে শেষ পর্যন্ত আমাদিগকে বিপথগামী করে তুলবে অহংকার।

প্রশ্ন ঃ অহংকার কি সাধককে নীচের দিকে নামিয়ে দেয়?

উত্তর ঃ অহংকার সাধককে নিম্নদিকে এমন নামিয়ে দেয় যে, সেখানে সোহং স্থান পায় না। সেজন্য আমাদের সেবাবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করতে হবে। আমাদের পুনঃ পুনঃ চিন্তা করতে হবে যে, আমরা তাঁর সেবক, সেবা করতে

এসেছি, পূজা করতে এসেছি, পূজক আমরা। তখন আর অহংকার থাকবে না। আমরা যদি এই ভাব নিয়ে থাকি তবেই আমরা এগিয়ে যাব। তা না করে যদি মনে করি আমার মত সাধনা বা কর্ম কেউ করে না, সকলে আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে তাহলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। সাধকের এইরকম অহংকার তাকে পতনের দিকে নিয়ে যায়। সেজন্য একমাত্র ভক্তি দ্বারা তাঁর কাছে সারেণ্ডার বা সমর্পণ করে থাকতে হয়। আর এই ভাব রাখতে হয় যে, আমি পূজা করতে এসেছি, পূজা করব। আমার ঐশ্বর্য কিছু নাই, আমার মাধুর্যই একমাত্র শ্রেয়।

প্রশ্ন ঃ মাধুর্যটা কি?

উত্তর ঃ মাধুর্য হল যা মধুময়। সমস্ত বিশ্বটাকে মধুময় দেখতে হবে। তাতে ঐশ্বর্য, অহংকার থাকে না। আর আমার অট্টালিকা, আমার ধন, সম্পদ, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদি হল ঐশ্বর্য।

'ঐশ্বর্য মাধুর্য দুই হয় সমতুল।

শেষেতে অক্ষয় স্বর্গ অন্যে নরকের মূল'।।— এই একটা ভাষা আছে। ঐশ্বর্য, মাধুর্য দুই সমতুল বটে, এক সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু মাধুর্যই তাকে মধুময় রাজ্যে পৌঁছে দেয়। আমরাও যেন ঐশ্বর্যের মোহে না পড়ে, অহংকারের খেলাতে মত্ত না হয়ে মাধুর্যকেই অবলম্বন করে, বিরাট সত্ত্বাতে সত্ত্বাবান হয়ে জন্ম সার্থক করতে পারি।

প্রশ্ন ঃ শ্রেয় এবং প্রেয় এই দুটি কথার প্রকৃত অর্থ কি?

উত্তর ঃ বিশ্বটা প্রেয়তে আবদ্ধ হয়ে আছে। আপাততঃ যেটা তৃপ্তি, আনন্দ প্রদান করে, ইন্দ্রিয়ের সুখকর হয়, তাকেই প্রেয় বলে। ইন্দ্রিয়ের ভোগে মানুষ আত্মহারা হয়, কিন্তু সে ভোগ কি সব সময় করতে পারে? চোখ রূপ দেখছে। কিন্তু অনবরতই কি রূপ দেখে থাকতে পারে? তেমনি নাসিকা যে ঘ্রাণ নিচ্ছে, জিহ্বা যে রস আস্বাদন করছে তারও একটা সীমা আছে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু ক্ষণস্থায়ী এবং তাতে যে তৃপ্তি বা আনন্দ পাওয়া যায় তাও ক্ষণস্থায়ী। শাস্ত্রকারগণ তাকেই প্রেয় নামে অভিহিত করেছেন।

শ্রেয় হচ্ছে আলাদা জিনিষ। যার গতি শাশ্বত, যা আমাদের বিরাটে পৌঁছে দেয় তাই হল শ্রেয়। ইন্দ্রিয়ের সুখ, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিরাটে পৌঁছে না। তা ক্ষণভঙ্গুর, খানিকটা দূরে গিয়ে তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে আমরা বিশ্বের মানুষ তবু প্রেয়তে আবদ্ধ হয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে আছি। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, যশখ্যাতি প্রতিপত্তি যতরকমভাবে আপাতঃ সুখকর যেটা, সেটাকে নিয়ে সকলে উন্মাদ হয়ে আছে। এই উন্মাদনাটা বিশ্বের মানুষকে হীন স্তরে নামিয়ে দিচ্ছে। এতে কেউ প্রকৃত তৃপ্তি পায় না, শান্তি পায়

না। বিফলকাম হয়ে পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মানুষ মনে করে যে, সে তার স্ত্রী, পুত্র কন্যা নিয়ে সুখী হবে কিন্তু সে সুখী হতে পারে না। কেউ কারো দিকে তাকায় না। যে যার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এদেরকে দেখার জন্য পাগল হয়ে আছে। এভাবে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা খেলা করছি। সেজন্য আমাদের প্রকৃত শ্রেয় কিসে হবে তা আমাদের চিন্তা করতে হবে। প্রেয়তে মুগ্ধ হলে চলবে না। আমি ঐশ্বর্যবান, যশস্বী। কোটি কোটি লোক আমার যশকীর্তন করে আমার প্রশংসা করে। কিন্তু এতে আমার কি হল? আমি কি পেলাম? এটা যদি আমরা ঠিক করে চিন্তা করি তবে দেখব যে শুধু একটা ভ্রান্তির খেলা চলছে। এই ভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি। সেজন্য এটাকে প্রেয় বলে। এটা শ্রেয় নয়। সেই বিরাট সত্তাতে যখনি আমার গতি হবে, তখনি আমার শ্রেয় লাভ হবে। কেননা তার ছন্দপতন নেই, বাধা-বিপত্তি নেই, অবসাদ নেই। শেষ পর্যন্ত সে আনন্দময় রাজ্যে আমাদিগকে পৌঁছে দেবে। সেই আনন্দময় রাজ্যে যাবার জন্য, বিরাট সুখের অধিকারী হওয়ার জন্য সর্বোপরি জন্ম সার্থক করার জন্য আমাদের শ্রেয়ের অভিমুখী হতে হবে। সেজন্য আমাদের একমাত্র শ্রেয় হচ্ছে ভগবদ্‌গতিতে যাওয়া। তবেই আমাদের জন্ম সার্থক হবে। মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব সবই অর্জন করে আমরা পূর্ণ আনন্দে অবস্থান করতে পারব।

কিন্তু সেই অবস্থানকে ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্ধকার কারাগৃহে লুকোচুরি খেলছি। এই হীন স্তরে খেলার জন্য আমরা সর্বদাই উত্তপ্ত হয়ে অবস্থান করছি। এ খেলাতে প্রকৃত তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। অভাব অভিযোগ সর্বদাই আমাদের ঘিরে রেখেছে। সবরকম অভাব আমাদের বিভ্রান্ত করে তুলেছে। সেজন্য আমাদের সকলের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের সেই স্বভাবি হওয়া যাতে বিরাট সত্তায় সত্তাবান হয়ে আমরা জন্ম সার্থক করতে পারি। ক্ষুদ্র লুকোচুরি খেলায়, অন্ধকার কারাগৃহে অভিনয় দেখানো একটা বোকামি মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্ন ঃ তাহলে শ্রেয়টা প্রাপ্ত হলেই কি মানুষের জীবন সার্থক হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। মানুষের জীবন তাতে পূর্ণভাবে সার্থক হবে। তার প্রতিবন্ধকতা, ছন্দপতন থাকবে না।

প্রশ্ন ঃ তখন সে কি অবস্থায় বিচরণ করবে?

উত্তর ঃ "তৃপ্তোহস্মি'—আমি তৃপ্ত হলাম। সে তখন সব অভাবের উপরে অবস্থান করবে। বিরাট বিশ্বে অমৃতত্বের স্রষ্টা যিনি তার সে উত্তরাধিকারী হবে। এবং এই উত্তরাধিকারীসূত্রে সেই সত্তায় সত্ত্বাবান হবে। যেমন আকাশে সূর্য্যের উদয় হয়। সেই সূর্য্যের আকর্ষণে এই বিশ্ব, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সব খেলা করছে।

এই সূর্য্য যে কত দূরে আছে তার ঠিক নেই কিন্তু তার কিরণ এসে পৃথিবীতে পড়ছে। আমরা কাঁচখণ্ডের ভিতর সেই কিরণকে ফেলে তাকে control করে কেন্দ্রীভুত করে যদি কাগজে ফেলি তবে সঙ্গে সঙ্গে আগুন তৈরী হয়ে যায়। কোথায় সে সূর্য্য আর কোথায় কাঁচখণ্ড অর্থাৎ সূর্য্য এত বড় এবং এত বিরাট সত্তায় প্রতিষ্ঠিত যে তার আলো পৃথিবীতে ধরে অগ্নি সৃষ্টি হচ্ছে। তেমনি আমাদের ভিতরে সর্বশক্তি আছে। আমরা সেই শক্তিকে হারিয়ে অন্ধকার কারাগৃহে লুকোচুরি খেলছি এবং একটা হীনস্তরে এসে অভিনয় করছি। নিজেকে নিজে হারিয়ে সবটাই পাবার চেষ্টা করছি। এর চেয়ে দুঃখের আর কিছুই নাই।

প্রশ্ন ঃ এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় কি?

উত্তর ঃ এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের সাধু, গুরু সঙ্গ করতে হয়। আমরা তো পশুপক্ষী নই। মানুষ যখন আমরা, তখন আমাদের শ্রেয়লাভ করতে হবে। জন্ম সার্থক করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। নেতি নেতি বিচার করে প্রকৃত মহাসত্যকে উদঘাটন করবার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা মানুষ। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। সুতরাং আমরা সব হারিয়ে এই হীন অবস্থার সৃষ্টি করি কেন? সেজন্য আমাদের উচিৎ হল সেই বিরাট সত্তায় সত্ত্বাবান হওয়ার জন্য, জন্ম সার্থক করার জন্য নিরন্তর প্রার্থনা জানানো—"অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতংগময়"—অর্থাৎ তুমি আমাকে অসৎ থেকে সতে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে চল এবং মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে চল।

প্রশ্ন ঃ শরীরের সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ কি?

উত্তর ঃ অগ্নি আর অগ্নিশিখা। আগুন আছে বলে তার দাহিকা শক্তি আছে, উজ্জ্বলতা আছে। অগ্নি না থাকলে তার দাহিকা শক্তি বা উজ্জ্বলতা থাকবে না। সেই রকম দেহ আছে বলেই প্রাণ কথাটা আছে। দেহের সঙ্গে প্রাণ ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত। প্রাণকে অবলম্বন করে দেহ আছে এবং দেহকে অবলম্বন করে প্রাণ আছে। উভয়ে উভয়ের পরিপোষক।

প্রশ্ন ঃ প্রাণ আছে বলে দেহ আছে, ঠিক। কিন্তু দেহ আছে বলে প্রাণ আছে—এটা কি রকম?

উত্তরঃ হ্যাঁ। দেহ আছে বলে প্রাণ। প্রাণটার অবস্থান কোথায়? দেহে অবস্থান। অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের পরিপোষক অবস্থা। অগ্নি না থাকলে তার দাহিকা শক্তি থাকে না। অগ্নি আছে বলেই ধোঁয়াও আছে। এতে অনুমান হল ধোঁয়াটা কোথা থেকে উঠছে। অগ্নি আছে। না হলে ধোঁয়া উঠবে কোথা হতে? সেই হিসাবে দেহ আছে বলেই প্রাণ আছে। প্রাণটা এইভাবেই আসছে। দেহ আছে বলে প্রাণ আছে অর্থাৎ দেহ না থাকলে 'প্রাণ' অনুভব করবে কে?

একজন অনুভব কর্তা চাই। জীবাত্মা দেহ অবলম্বন করেছেন বলেই প্রশ্নটা আসছে। নচেৎ প্রশ্নই আসত না। জীবাত্মারূপে দেহ না থাকলে পরমাত্মারূপী প্রাণকে কে কিভাবে অনুভব করবে? প্রাণই দেহকে অবলম্বন করেছে। তাই জীবাত্মারূপী দেহ প্রাণকে জানতে চাইছে। দেহ না থাকলে কি প্রাণ থাকে এটা দেহধারী প্রাণেরই প্রশ্ন। সেই প্রাণকে অবলম্বন করে দেহের ভিতরে প্রাণকে খোঁজো। দেহকে ছেড়ে দিয়ে প্রাণকে কি খোঁজা যায়?

প্রশ্ন ঃ দেহ না থাকলে কি প্রাণবায়ু থাকে না?

উত্তর ঃ না। দেহ না থাকলে প্রাণবায়ু থাকবে কি করে? কোথায় থাকবে?

প্রশ্ন ঃ প্রাণের উৎপত্তি কোথা থেকে?

উত্তর ঃ অব্যক্ত থেকে প্রাণের উৎপত্তি। 'অব্যক্তাৎ জায়তে প্রাণঃ'। উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানিচ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।।"

—ইহা হইতেই অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকেই প্রাণ, মন, সমুদায় ইন্দ্রিয় আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবীর উৎপত্তি হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ মানুষ যখন দেহত্যাগ করে তখন প্রাণ যায় কোথায়?

উত্তর ঃ প্রাণ যায় কোথায় সেটা আলাদা কথা। স্থূল দেহ বাদ দিয়ে আরও ভিন্ন প্রকার দেহ আছে। সূক্ষ্ম দেহ, কারণ দেহ, তূরীয় দেহ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনি বলতে চাইছেন দেহ ব্যতিরেকে প্রাণ থাকতে পারে না।

উত্তর ঃ দেহ ব্যতিরেকে প্রাণ স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহ অবস্থান করে। মৃত্যুর পর এই স্থূলদেহ আর কার্য্যকরী হয় না। কাজেই তখন প্রাণ সূক্ষ্মে চলে যায়। এবং আমাদের সূক্ষ্ম ও কারণ এই দুটী দেহ ধরতে হয় এবং আমাদের অনুভূতি রাজ্যে যেতে হয়।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু একথা সত্য যে, আত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে পৃথক।

উত্তর ঃ পৃথক হবে কখন? সাধনার দ্বারা স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাবে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে যায়। এটা সাধনা না হলে হয় না। একসঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আছে, কিছুই বুঝতে পারবে না। সেইজন্য আমাদের সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাওয়া। সূক্ষ্মে গিয়ে অনুভূতি রাজ্যে অনুভব করা। এটা সূক্ষ্মের খেলাঘর। তারপরে কারণ। যখন আমাদের নিদ্রা আসে তখন আমরা সূক্ষ্ম শরীরে চলে যাই। সূক্ষ্মকে আবার ত্যাগ করে আমাকে চলে যেতে হয়। কোন সময়, যখন কোন স্বপ্ন নাই, তখন আর একটা অবস্থা আসে। সেটা কারণ শরীর। কারণ ত্যাগ করে আর একটা অবস্থা আছে। সেটা তূরীর অবস্থা অর্থাৎ একটা মহাতৃপ্তির আসন।

প্রশ্ন ঃ সেখানে কি কোন শরীর থাকে না?

উত্তর ঃ শরীর তো নেই। সেটা (শরীর) এখানে পড়ে আছে।

প্রশ্ন ঃ সে অবস্থাটা কেমন?

উত্তর ঃ সেটা বলবার কিছু নেই। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিনটি অবস্থা আমরা অনুভব করি, কিন্তু স্থায়ী কোনটাকে অধিকার করতে পারি না। স্থূলটাকে অধিকার করে আছি আমরা। আর সূক্ষ্ম, কারণকে অধিকার করতে পারছি না। সূক্ষ্মে আমরা যখন অধিকার স্থাপন করব তখন আমাদের উদ্ধ্বগতি হবে। স্থূলে ঊর্দ্ধগতি হয় না। সূক্ষ্মে ঊর্দ্ধগতি হবে। স্থূলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা বেশী আছে কিন্তু সূক্ষ্মে কম আছে, নেই বললেই হয়। কারণে আরও হাল্কা হয়ে যায়। আমরা অনেক সময় বলি 'আজকে চমৎকার ঘুমটা হয়েছে, ঘুমের মধ্যে ভীষণ একটা তৃপ্তি পেয়েছি'— এই যে ঘুম একে গাঢ় নিদ্রা বলে। এই ঘুমের মধ্যেই স্থূল, সূক্ষ্ম কারণে অবস্থানের ছোঁয়া পাওয়া যায়। স্থূলকে ত্যাগ করে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মকে ত্যাগ করে কারণে গেলাম। কারণকে ত্যাগ করে তূরীয় একটা অবস্থা আছে। সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। সেটা নিজ বোধগম্য অর্থাৎ বোধানুরূপ ধ্যান না হলে হয় না। ধ্যানে অবস্থান করতে পারলে তখন সবটাই তূরীয় অবস্থা বলা যেতে পারে। এর জন্য বেশী সময় ধ্যানে অবস্থান করতে হয়। তখন স্থূলটাকে বাদ দিতে হয়। কর্মের দ্বারা স্থূলে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে যেতে হয়। এই হচ্ছে সাধনার ক্রম। এটা বাক্য বা ভাষার দ্বারা বোঝান যায় না। সম্পূর্ণ নিজ বোধগম্য।

প্রশ্ন ঃ এর জন্য কি প্রাণের সাধনা করতেহবে?

উত্তর ঃ প্রাণের সাধনা করতে হবে এটা ঠিক কথা। তবে প্রাণের সাধনা করতে হলে প্রাণের আবগারিকে আগে খোঁজ করতে হবে। প্রাণের আবগারি হচ্ছে একমাত্র প্রাণবায়ু। বায়ুকে অবলম্বন করে প্রাণ আছে, এজন্য প্রাণবায়ু বলে। বায়ু যদি চলে যায় আর প্রাণও থাকবে না। ও আছে বলে প্রাণটা আছে। ওকে অবলম্বন করেই সেই প্রাণের কাছে যেতে হবে। এ হচ্ছে সূক্ষ্ম কৌশল। সেইটাই হল প্রাণায়াম। মনকে স্থির এবং সংযত করার জন্য প্রাণায়াম ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উপায় নাই। এতে এক মুহূর্তে মাইণ্ড চেঞ্জ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ প্রাণের সাধনাতেই কি জ্ঞানোৎপত্তি?

উত্তর ঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রত্যেকেই প্রাণের সাধনা করে। কেহ বহিঃপ্রাণায়াম করে, আর কেহ বা অন্তঃপ্রাণায়াম করে। এই অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারাই প্রাণবায়ু স্থির হয়। প্রাণবায়ু স্থির হলে মনস্থির হয়। মনস্থিরে চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের পবিত্রতা বা মনের পবিত্রতা জন্মে। মনের পবিত্রতা থেকে ভক্তিলাভ হয় আর শেষে ভক্তিলাভ হলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন ঃ কিন্তু প্রাণের সাধনা করা সত্বেও অনেকের জ্ঞানোৎপত্তি হয় না কেন?

উত্তর ঃ কারণ তাতে অনেক বাধা রয়েছে।* সে বড় হতে চায়, অহংকার নিয়ে খেলা করতে চায়। কিন্তু বুদ্ধি মার্জিত না হলে এ পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সে বুঝতে পারে না যে অহংকার তাতে নীচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছে।

*বিশদার্থ—জ্ঞানলাভের জন্য প্রয়োজন শুদ্ধ চিত্ত। শুদ্ধ মন বা শুদ্ধ চিত্ত হইতে না পারিলে জ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়া যায় না। জ্ঞানলাভ অর্থে আত্মদর্শন বুঝিতে হইবে। আচার্য শঙ্কর সম্যক জ্ঞান অর্থে যথাযথরূপে আত্মদর্শনকেই বুঝাইয়াছেন। ধাতুপ্রসাদ না হইলে আত্মদর্শন করা যায় না। সাধকমাত্রেরই সর্বাগ্রে চাই ধাতুপ্রসাদ। মহাপ্রভু চিত্তদর্পণ বা বুদ্ধিদর্পণ মার্জনার কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। কারণ আধার শুদ্ধি না থাকিলে বিকৃত আধারে সত্যও বিকৃতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সত্যের মুখকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে বিভিন্ন প্রতিবন্ধক। সর্বাগ্রে চাই এই প্রতিবন্ধকের দূরীকরণ।

আমাদের আধারের তিনটি গুণময় উপাদান হইল দেহ, প্রাণ এবং মন। এই দেহে, প্রাণে এবং মনে যদি কোন মালিন্য না থাকে, যদি এই উপাদানগুলি শুদ্ধ স্বচ্ছ হয় তবেই আত্মদর্শন বা জ্ঞানলাভ হয়। সুতরাং আত্মা যে করণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবেন, সেই করণগুলি বিশুদ্ধ হওয়া চাই। দেহ প্রাণ এবং মন যেন সত্যের বাহন হয় এবং কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। প্রথমে লক্ষ্য রাখিতে হইবে দেহশুদ্ধির দিকে। দেহে সাত্ত্বিক উপাদান সৃষ্টি করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রয়োজন আহারশুদ্ধি। অর্থাৎ শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় হইল প্রাণের শুদ্ধি। প্রাণ শুদ্ধ হয় প্রাণায়ামে। প্রাণের চঞ্চলতা, প্রাণবায়ুর বক্রগতি প্রাণায়াম কুম্ভক ব্যতীত দূরীভূত হয় না। সুষুম্না-নালে প্রাণের ধারাকে প্রবাহিত করিতে হইবে। প্রাণায়াম রূপ যোগক্রিয়া ব্যতীত প্রাণশুদ্ধি হয় না বা প্রাণের বক্রগতি নিরুদ্ধ হয় না। প্রাণের এই বক্রগতি নিরুদ্ধ হইলে সুষুম্না নালের পথ আপনি খুলিয়া যায়।

ধাতুপ্রসাদের তৃতীয় গুণময় উপাদান হইল মন। মন বহিশ্চর। সংকল্প-বিকল্প তাহার ধর্ম। এই মনকে স্থির করিয়া মনের যে নিজ নিকেতন, সেই স্থানে তাহাকে উন্নীত করিতে হইবে? তাহাকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে। মন অন্তর্মুখী না হওয়া পর্যন্ত অন্তঃস্রোতের বা সমাধি পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। এই মনকে লইয়াই যত গোলযোগ। এই মনই একদিকে যেমন সমস্ত বন্ধনের কারণ আবার অন্যদিকে এই মনই মোক্ষের হেতু। তাই বলা হইয়াছে—'মন এবং মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। মনের বৃত্তি সঙ্কল্প-বিকল্প। "সংকল্প-বিকল্প ত্যাগো যোগঃ।" (হিরণ্যগর্ভসংহিতা)। মন সদাই জাগতিক বিষয় ভোগের জন্য বহুবিধ সংকল্প-বিকল্প করিতেছে। সেই সংকল্প-বিকল্প ত্যাগ করিয়া মনকে নির্বিকল্প অর্থাৎ কল্পনা রহিত করার নামই যোগ। আবার অন্যরূপে বলা যাইতে পারে যে, মন রূপ জীব দেহে অহং বুদ্ধিতে সর্বদাই নশ্বর ভোগ্য বিষয়ের সহিত ঐক্য স্থাপন পূর্বক বহির্মুখী হইয়া রহিয়াছে। সেই বহির্মুখী জীবকে অন্তর্মুখী করিলে জীব আর আত্মা যে একই বস্তু এই ঐক্যবোধ জন্মে। ইহারই নাম যোগ।

সাধক প্রাণক্রিয়া দ্বারা যখন ভগবৎমুখী হয় তখন মন বাধার সৃষ্টি করিয়া বিষয়ের দিকে টানিয়া আনে। প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক আজ্ঞাচক্রে মনের স্থিতি করেন। কিন্তু মনের স্থিতিভাব আজ্ঞাচক্রে স্থায়ী থাকে না। কারণ বিষয়সংস্কার এত সুদৃঢ় যে অভ্যাসে একটু অমনোযোগী হইলে মনকে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে বাধ্য করায়। সংকল্প ত্যাগ ব্যতীত ভগবৎ স্বরূপের জ্ঞান ফুটিয়া উঠিতে পারে না। "নান্যাঃ কশ্চিদুপায়োহস্তি সংকল্পোপশমাদৃতে"—সংকল্পের উপশম ব্যতীত সত্যজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবার আর কোন উপায়ই নাই। চিত্তের সর্বপ্রকার বৃত্তি নিরোধই যোগ। বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইবামাত্র চিত্ত যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম বৃত্তি। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি— চিত্তের এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি।' প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ" (পাঃ দঃ "সমাধি পাদ)।

১। প্রমাণ বৃত্তি ত্রিবিধ, যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ইন্দ্রিয়ের সহিত বহির্বস্তুর সংযোগ হইবার পরেই যে মনোমধ্যে তদ্‌বস্তুর অনুরূপ বৃত্তি জন্মে, সেই বস্তুর নাম 'প্রত্যক্ষ'। এক বস্তুর প্রত্যক্ষের পর তৎ সহচর অন্য অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতীতি হইলে (যেমন ধূম প্রত্যক্ষের পর তৎসহচর বহ্নির প্রতীতি) তাহা 'অনুমান'। বিশ্বস্ত বাক্য শ্রবণ করিবার পর তদ্বাক্য বোধ দ্বারা পদার্থের জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ তদাকারা বৃত্তি জন্মিলে তাহা 'আগম'।

২। বিপর্যয় বৃত্তি ঃ—সেই জ্ঞান মিথ্যা, যে জ্ঞান তদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিষয় দেখিতে গেলে অন্যথা হইয়া যায়, সেই জ্ঞানের নাম 'বিপর্যয়'। মিথ্যাকে মিথ্যা না বলিয়া অর্থাৎ সত্য বলিয়া গণ্য করা রূপ প্রকৃত ভ্রান্তির নাম বিপর্যয় বা বিপতরীত বোধ। রজ্জুতে সর্প বা মরুতে মরীচিকা ভ্রান্তি হইল বিপর্যয় নামক ভ্রমের দৃষ্টান্ত।

৩। বিকল্পবৃত্তি— ইহাতে বস্তু নাই অথচ শব্দ শূন্য একপ্রকার মনোবৃত্তি জন্মে। এতাদৃশ মনোবৃত্তির নাম বিকল্প অর্থাৎ অনাসন্ন কল্পনার নাম বিকল্প। বস্তু নাই, অথচ শব্দের প্রভাবে মনোবৃত্তি জন্মে। ইহার দৃষ্টান্ত 'আকাশ কুসুম'। আকাশ কুসুম বাস্তবিক নাই। কিন্তু তাহা শুনিবামাত্র মনোমধ্যে একপ্রকার বৃত্তি জন্মে। এককথায় শব্দাদিজন্য যে জ্ঞান তদনুসারী অর্থাৎ কথায় প্রতিপন্ন কিন্তু প্রকৃত বস্তুশূন্য তাহাই বিকল্প বা কল্পনামাত্র।

৪। নিদ্রা—বাহ্যবোধের নিরোধের নাম নিদ্রা। সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলেও সুষুপ্তি অবস্থা অনুভূত হয়। বস্তুতঃ নিদ্রাও একপ্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশ স্বভাব সত্ত্বগুণের আচ্ছাদক, তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির অবলম্বন। যখন তমোময় অজ্ঞানময় নিদ্রাবৃত্তির উদয় হয়, তখন সর্বপ্রকাশক সত্ত্বগুণটি অভিভূত থাকে। সেইজন্যই

তৎকালে অন্য কোন বস্তুর প্রকাশ থাকে না। থাকে না বলিয়াই লোকে বলে, 'আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না'। বস্তুতঃ তাহার জ্ঞান ছিল না এমন নহে। অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছিল। সেইজন্যই সে নিদ্রাভঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞানবৃত্তি স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণের দ্বারাই তাহার বৃত্তিত্ব নির্ণীত হয়।

৫। স্মৃতিবৃত্তি— যাহা পূর্বে অনুভূত হইয়াছে তাহার স্বরূপ ধারণার নাম স্মৃতি। বস্তু একবার অনুভূত অর্থাৎ প্রমাণবৃত্তিতে আরূঢ় হইলে তাহা আর যায় না। সংস্কাররূপে থাকিয়া যায়। তাহাকে আমরা স্মৃতি নাম দিয়া উল্লেখ করি। জাগ্রত অবস্থায় যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, যাহা কিছু অনুভব করা যায়, চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। উদ্বোধক (উদ্বোধ সঞ্চারক বা স্মারক) উপস্থিত হইলেই সেই সকল সংস্কার প্রবল হইয়া চিত্তক্ষেত্রে পূর্বানুভূত বস্তুর স্বরূপ পুনরুদিত করিয়া দেয়। সংস্কার সমুৎপন্ন সেই সকল মনোবৃত্তির নাম স্মরণ।

রজোস্তমোগুণের ক্ষয় ব্যতীত চিত্তে সত্ত্বগুণ উদিত হয় না। সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তকেই শুদ্ধচিত্ত বলে। এইরূপ সম্যক্ শুদ্ধচিত্তে আর কোন বৃত্তির উদয় হয় না। মনকে নিষ্পাপ অবস্থায় রাখিতে মনের পাপরূপ মলগুলির সহিত পরিচয় থাকা আমাদের একান্ত প্রয়োজন কারণ এইগুলি সমাধির অন্তরায় এবং চিত্ত বিক্ষেপ সৃষ্টি করে। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে সেইগুলি হইল "ব্যাধিস্ত্যান সংশয় প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তি দর্শনা লব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষোপাস্তে-হন্তরায়াঃ।' —(সমাধিপাদ)। অর্থাৎ চিত্ত বিক্ষেপের হেতু হইল নয়টি, সেগুলি হইল—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব। চিত্তবৃত্তিসকলের সহিত ইহারা উদ্ভূত হয় এবং ইহাদের অভাবে চিত্ত বৃত্তি সকল জাগরিত হয় না। ইহাদের মধ্যে প্রথম হইল ব্যাধি অর্থাৎ ধাতুরস ও ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য। স্ত্যান—চিত্তের অকর্মণ্যতা অর্থাৎ সাধনাদি শিক্ষা করিয়াও তৎ সাধনে আলস্য। সংশয়—উভয়দিকস্পর্শী বিজ্ঞান অর্থাৎ ইহা এরূপ হইবে কি হইবে না, যোগসাধন করা উচিত না অনুচিত এই সমস্ত সন্দেহ উদ্রেক করে। প্রমাদ—সমাধি সাধনে ভুল ধারণা থাকা বা ভাবনা না করা। আলস্য— শরীরের ও চিত্তের গুরুত্বশতঃ সাধনে অপ্রবৃত্তি। অবিরতি— বিষয় সন্নিকর্ষের জন্য তৃষ্ণা অথবা বিষয় ভোগরূপ স্পৃহা। ভ্রান্তিদর্শন—বিপর্যয় জ্ঞান। অলব্ধভূমিকত্ব— সমাধিভূমির অলাভ বা অপ্রাপ্তি। অনবস্থিতত্ব—লব্ধভূমিতে প্রযত্নের শিথিলতাবশতঃ চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা। সমাধির প্রতিলম্ভ (নিষ্পত্তি) হইলে চিত্ত অবস্থিত হয়। উক্ত নয়প্রকার চিত্তবিক্ষেপই হইল যোগমল। ইহারাই যোগের অন্তরায় অর্থাৎ যোগের বিঘ্নকর। প্রতিবন্ধক দূর না করিয়া সাধনপথে অগ্রসর

হওয়া বৃথা। সুতরাং সর্বাগ্রে যাহা পথের বাধাস্বরূপ তাহাকে দূরীভূত করিতে হইবে। প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে সিদ্ধিলাভে আর বেগ পাইতে হয় না। চিত্ত বিক্ষেপকর এই অন্তরায়সকল অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা দূরীভূত হয়। সেইজন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইহাদিগকে নিরোধ করিতে হয়। সুতরাং জানা প্রয়োজন অভ্যাস ও বৈরাগ্য কি?

যোগসূত্রে বলা হইয়াছে 'তত্রস্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ'। (সমাধি পাদ), অর্থাৎ সেই মনাতীত স্থানে বা পরমাত্মাতে স্থিত থাকিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টার (প্রযত্ন বা উৎসাহ) নামই অভ্যাস। অন্যভাবে বলা যায় যে সেই স্থিতির সম্পাদন ইচ্ছায় তাহার সাধনের যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তাহার নাম অভ্যাস! বৈরাগ্য— 'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্'—(সমাধিপাদ)। দৃষ্টবিষয় ও শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয় যুগপৎ এই উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হইতে পারিলে 'বশীকার' নামক বৈরাগ্য জন্মে। অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলে উৎ কৃষ্ট বৈরাগ্য জন্মায়। বশীকার বৈরাগ্য একেবারেই সিদ্ধ হয় না। 'বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করিব না' —এই চেষ্টা করিতে থাকাই হইল 'যতমান বৈরাগ্য'। ইহা কিঞ্চি ৎ সিদ্ধ হইলে যখন কোন কোন বিষয় হইতে রাগ অপগত হয় ও কোন কোন বিষয়ে ক্ষীয়মান হইয়া থাকে, তখন ব্যতিরেক পূর্বক বা পৃথক করিয়া ক্বচিৎ ক্বচিৎ বৈরাগ্যাবস্থা অবধারণ করিবার সামর্থ জন্মিলে তাহাকে ব্যতিরেক বৈরাগ্য বলে। অভ্যাসের দ্বারা তাহা আয়ত্ত হইলে যখন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যবিষয় হইতে সম্যক নিবৃত্ত হয়, কিন্তু কেবল রাগ ঔৎসুক্যরূপে মনে থাকে তখন তাহাকে 'একেন্দ্রিয়' বলা যায়। একেন্দ্রিয় অর্থে যাহা কেবল মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে থাকে। যখন ইচ্ছাপূর্বকও আর রাগকে নিবৃত্ত করিতে হয় না, যখন সহজাত চিত্ত ইন্দ্রিয়গণ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে, তখন তাহাকে 'বশীকার' বৈরাগ্য বলে। তাহা বিষয়ের পরম উপেক্ষা।

সুতরাং জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ 'যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্' অর্থাৎ যোগ হইতেই জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। তপস্যার হোমকুণ্ড অন্তরের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেবলমাত্র বহির্যজ্ঞের দ্বারা শাশ্বত শান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। বায়ুকে উপযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা সুষ্ঠুভাবে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে ভিতরটা আনন্দে প্লাবিত হইয়া যায়। প্রকৃত যোগীর প্রাণ আনন্দরসে অভিষিক্ত। প্রাণপ্রবাহ যতক্ষণ ঈড়া ও পিঙ্গলায় প্রবাহিত হয়, ততক্ষণ সংসার বাসনা বা ফলকামনাশূন্য হইবার উপায় নাই। সুতরাং প্রাণের ধারাকে ঈড়া বা পিঙ্গলার চির অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া নূতন পথে যাত্রা শুরু করিতে হইবে। প্রাণায়ামের দ্বারা যাঁহার প্রাণ সুষুম্নাবাহিনী হইয়া সহস্রারে স্থির হইয়া

...স বুঝতে পারে না কেন?

...র ঃ কারণ তার সাধনার ঠিক ঠিক পরিপক্ক অবস্থা হয় নি।

প্রশ্ন ঃ এটা কি প্রারব্ধ কর্মের ফল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ! সাধনা অর্থ কি? সাধনা মানে শ্বাস+ধন=সাধন। যে সম্পদটার আমার স্বাদ আছে, যে সম্পদলাভ করলে আর অন্য কোন সম্পদের প্রয়োজন হয় না তাতেই চিরতৃপ্তি লাভ করা যায় সেই বস্তুকে লাভ করার অহর্নিশি প্রচেষ্টা। এই তৃপ্তি হল—

"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানে না মণি,
তাহারি খানিক আমি মাগি নতশিরে।"

আমরা সেই মাণিকই চাই যে মাণিক আমাদের বিরাট সত্ত্বায় পৌঁছিয়ে দেবে। আমরা বিরাট সম্পদের অধিকারী হই। সেজন্য আমাদের কর্তব্য হল তৃপ্তি, আনন্দ, শান্তি, প্রেম-ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা এগুলো অর্জন করা। কারণ এগুলো মানুষকে উন্নত করে।

প্রশ্ন ঃ শাশ্বত গতি কি?

উত্তর ঃ শাশ্বত গতি অর্থাৎ যা সব সময় চলছে। তা হল ঐ শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাস+গতি=শাশ্বতি। সে তো চলছে সবসময়। কিন্তু আমি কি তাতে মন দিয়েছি? না সে আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে বলে আমি তার সঙ্গে করছি? আমি তার সঙ্গ করি কি? করি না।

প্রশ্ন ঃ আমরা তাতে মনোনিবেশ করতে পারি না কেন?

উত্তর ঃ এইটি আমাদের অজ্ঞতা, এইটি ভ্রান্তি। ভ্রান্তিতে বিষয়ে মত্ত হয়ে গেছি। যেটার সঙ্গ করছি তার কিন্তু কোন মূল্য নেই। যেটা কিছুই নয় সেটার সঙ্গ করে কি লাভ? যদি যশ, মান, খ্যাতি প্রতিপত্তির পেছনে সর্বদা ছুটি, বা সকলে যদি আমার গুণকীর্তন করে তাতে আমার কি লাভ হোল, আমি কি পেলাম—এগুলো বিচার করবার আধার নেই। আধার নেই বলেই বিশ্বউন্মাদ। এই উন্মাদনার বশে নিজেকে হারিয়ে বিভ্রান্তির পথে ছুটছে মানুষ।

প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনার কথার সারমর্ম হোল যে, শ্বাসে মন রাখলেই শাশ্বত গতি হবে, নতুবা শাশ্বত গতি হতে পারে না।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, শ্বাসে মনযুক্ত হলেই শাশ্বত গতির পথ ধরা যেতে পারে।

গিয়াছে, যিনি ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অতীত হইয়া শিবশক্তির সম্মিলনে পরম শিবস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন. তিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারই আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে। 'আমি কিছু নই' আমার কিছু নয়' এই জ্ঞান দ্বারা সর্বপ্রকারে আত্মাভিমানশূন্য হইয়া তিনি পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

তাই শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু শ্বাসটা আমাদের বেহুঁশে চলে যাচ্ছে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রাণবায়ু বলে। প্রাণ আছে বলেই আমার অস্তিত্ব আছে। দেহে যদি প্রাণ না থাকে তবে প্রাণকে আমরা ধরতে পারি না। প্রাণ যে কি, তার স্বরূপ কি? কোনটাই বুঝি না। এটা বুঝি যে, আমার একটা অস্তিত্ব আছে। সেই প্রাণকে ধরতে হলে প্রাণায়াম করতে হবে। প্রাণের বহিঃপ্রকাশ হয় শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে। তাই শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রাণবায়ু বলে। শ্বাস-প্রশ্বাস আছে বলে আমার দেহেরও প্রাণ আছে। আবার শ্বাস-প্রশ্বাস যখনই শেষ হয়ে যাবে তখনই আমার চিত্তবৃত্তি সব লোপ পেয়ে যাবে। এইভাবে প্রাণবায়ুকে অবলম্বন করলেই প্রকৃত প্রাণকে ধরা যাবে। কিন্তু যে প্রাণবায়ুকে ধারণ করে আমরা বেঁচে আছি সেই প্রাণবায়ুতে আমাদের মন নাই। অসাড়ে হাফরের মত আপনা আপনি চলছে, বেহুঁশেই চলছে। এইভাবে লক্ষ্যহীন হয়ে চলার জন্য কত জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন সৃষ্টি করে নানারকমভাবে বিভোর হয়ে এই বিশ্বে অভিনয় চলছে। এই অভনয় চলার ফলে মানুষ নিজেকে নিজে হরিয়েছে। নিজেকে হারিয়ে সে সব পেতে চাইছে। আমাকে হারিয়ে আমি সব পেতে চাই এটা যেমন মূর্খতার কথা তেমনি এই বিশ্বে এসে যদি আমরা প্রকৃত সত্যকে হারিয়ে চলি তাহলে আমাদের মানবজন্মের কোন সার্থকতা হোল না। কারণ এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম আমরা বেহুঁশেই কাটাচ্ছি। তাই এতে হুঁশ আনবার জন্য কর্ম একটা চাই। কি কর্ম না প্রাণকর্ম। সেই প্রাণকর্ম কি? তা হোল সংকল্পবিহীন কর্ম। শ্বাসটা সংকল্পবিহীন কর্ম। তাতে কোন সংকল্প নেই। সকালে ওঠে কেউ বলে না যে তাকে শ্বাসটা নিতে হবে। বা শ্বাসটা ঠিক আছে কিনা তা কেউ দেখতে চায় না। অথচ আমি যখন যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমি যত কিছুই করি না কেন, যে আমাকে সব সময় ধরে রেখেছে, এমন যে দরদীবন্ধু তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই না। কারণ আমরা সব হারিয়ে বসেছি। শ্রদ্ধা কি জানাব? আমরা বিষয়ে উন্মত্ত হয়ে শাশ্বত গতিটাকে হারিয়ে বসে আছি। এটা শুধু আজকের নয়। অনাদি অনন্তকাল ধরে ওই কায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে, মায়ার আচ্ছন্ন হয়ে আমি নিজেকে নিজে হারিয়ে বসেছি। সেজন্য আমাদের সব সময় কর্তব্য হচ্ছে আত্মস্থ হয়ে চলা। শ্বাসচৈতন্য করলে প্রাণচৈতন্য হবে। প্রাণচৈতন্য হলে মন চৈতন্য হবে। মন চৈতন্য হলে আত্মচৈতন্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বুদ্ধিচৈতন্যযুক্ত হবে। তখন প্রকৃত বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি উৎপন্ন হবে। এইভাবে সব যখন চৈতন্যযুক্ত হয়ে প্রকৃত মহাসত্যের অনুধাবন করার চেষ্টা করবে তখন আর লুকোচুরি খেলতে পারবে না। তখন 'চেতোদর্পণমার্জনং' অর্থাৎ চিত্তদর্পণের মত মার্জিত হবে। চিত্তে যে সংস্কার খেলা করে তাও পরিষ্কার

হয়ে যাবে দর্পণের মত। তখন যত্র জীব তত্র শিব। যাহা যাহা নেত্র হেরে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে। তখন অহং হয়ে যাবে সোহহং। অহং তখন দ্বারমুক্ত হয়ে যাবে সোহং। সাধক তখন মুক্ত বিহঙ্গের মত অনন্ত আকাশে শাশ্বতগতি নিয়ে জন্ম সার্থক করার প্রয়াস পাবে। এই ক্ষুদ্রবোধ থেকে বৃহতে যাবে। এইজন্য আমাদের সাধনার প্রয়োজন হয়। শ্বাস+ধন=সাধন। শ্বাস+ধন পেলে আমার জন্ম সার্থক হবে সুতরাং প্রতিমুহূর্তে আমরা যেন সেই চেষ্টা করি যাতে তার সঙ্গ নিতে পারি তাহলেই আমার সব ঠিক হবে।

প্রশ্ন ঃ তাহলে সাধন মানে শ্বাস+ধন। অর্থাৎ যে ধন প্রাপ্ত হলে আর কোন বিরহ-বিচ্ছেদ থাকবে না বা ছন্দপতন হবে না তাই সাধন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। সে তো বটেই। শ্বাসযুক্ত যে ধন তাকে অবলম্বন করেই আমাদের চলতে হবে। সেই তৃপ্তি, শান্তি প্রদান করবে, আনন্দ প্রদান করবে। আমাকে হারিয়ে আমি যখন সবকিছু পেতে চাই— এটা যেমন পাগলামি তেমনি শ্বাসযুক্ত সম্পদকে হারিয়েও আমি বিপদের সম্মুখীন হয়ে ভ্রান্তিতে খেলা করি। এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে?

সে জন্য দুঃখ, সন্তাপ, অশান্তি যত রকমের কিছু সবটাই আমাকে ঘিরে ধরেছে। আমি কোথাও কিছু পাচ্ছি না। আমার গতিও নাই, স্থিতিও নাই। এইটি একটি উন্মাদ বা পাগল অবস্থা। পাগল যেমন রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে যেমন বলতে পারে না যে সে কোথায় যাচ্ছে তেমনি আমরাও শ্বাসধন হারিয়ে, সর্বদাই উদ্দেশ্য হারিয়ে বিধেয় নিয়ে চলছি। কোথায় যাচ্ছি, কোথায় বেড়াচ্ছি কোনটাই ঠিক নেই। সংকল্পবিহীন হলেই আমরা উদ্দেশ্য হারা হই। এটা বার বার বলছি। সুতরাং একমাত্র কর্ম হোল শাশ্বত কর্ম। তা যদি আমরা গ্রহণ করি আর কিছু ভাবতে হয় না। তখন যে বুদ্ধি আসবে তা হোল বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যা আমাকে সুন্দরের পথে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ সংকল্পবিহীন হলে যদি উদ্দেশ্য হারা হয় তবে যে বললেন সংকল্পবিহীন কর্ম করতে?

উত্তর ঃ সংকল্পবিহীন কর্ম অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য বিরাটে যাওয়া। বিরাটে যেতে হবে আমাকে। তখন উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র নয়। বিরাটে যখন যেতে হবে তখন সেই শাশ্বত গতিটাকে নিতে হবে। তাতে ছন্দপতন হয় না। একমাত্র তাঁর শরণাগতি নিয়ে চলতে হবে। তাতে তৃপ্তি, আনন্দ, শান্তি সবটাই পাওয়া যাবে। এজন্য নিজে জেনেছি, বুঝে ফেলেছি, আর বুঝবার প্রয়োজন নেই এ হীন ভাব আমাদের মনে যেন স্থান না পায়। তাহলে আমি ওখানে পঙ্গু হয়ে যাব। কিছুই বুঝি না, বুঝতে পারি না— এ ভাব নিয়ে যদি আমরা চলি তবে কিছু কিছু তাঁর

আশীর্বাদ আমাদের প্রতি বর্ষণ হবে। সুতরাং এটা পুনঃ পুনঃ আলোচনা কর, পুনঃ সঙ্গ কর, বিচার কর। প্রতি মুহূর্তে শ্বাসটা এমনি চলে যাচ্ছে। এটার সঙ্গ নেওয়ার চেষ্টা কর। গতিহীন অবস্থায় চলে যাচ্ছে।* ওর গতিতে মতি দাও। তাহলে তুমি সেই বিরাটের পথে যাত্রা করতে পারবে। মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে ওটা। সুতরাং ওটাকে হারাতে পারবে না, হারনো চলবে না। ওকে ধরেই চলতে হবে। তবেই আমার ভ্রান্তি দূর হবে।

**ভাবার্থ—যোগীরা বলেন, জীবের প্রতি মুহূর্তে জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি ও লয় হইতেছে।[১] জীবের জন্মারম্ভ কাল হইতে শ্বাসের গতি শুরু হয়। এই শ্বাস একবার নাসাপথে আসিতেছে ও একবার যাইতেছে। এই শ্বাস যাইয়া যদি না আসে, তাহা হইলে মৃত্যু। যদি পুনরায় আসে তবেই জন্ম। অতএব দেখা যাইতেছে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত আমাদের অজস্র জন্ম-মৃত্যু হইতেছে। এই শ্বাসের গমনাগমন কাল প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা নিয়মিত ও বর্দ্ধিত হয়। প্রাণায়াম বহুবার হইলেই অর্থাৎ বহুবার টানাফেলা করিলেই অনেকবার জন্ম হইয়া যায়। এইরূপে সাধক অনেক জন্ম অর্থাৎ অনেক প্রাণায়াম দ্বারা সংসিদ্ধি লাভ করেন। যোগদর্শনে আছে 'তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ'—যোগসূত্র। যাঁহার তীব্র সংবেগ আসিয়াছে তাঁহার সমাধি লাভে ও তৎ ফল জ্ঞানলাভে কালবিলম্ব হয় না। প্রযত্ন তীব্র হইলে সাধকের বহু প্রাণায়াম করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রাণায়াম অল্প করিতেই করিতেই তাঁহার মনে নেশা আসে। তাঁহার মন ভিতরে ডুবিতে থাকে। সাধারণতঃ উহার নিয়ম হইল, মন দিয়া ১২টি প্রাণায়াম করিলে প্রত্যাহার হয়, ১৪৪টি প্রাণায়ামে ধারণা, ১৭২৮ বার প্রাণায়ামে ধ্যান ও ২০৭৩৬ বার প্রাণায়ামে সমাধি হয়। একটি সঙ্গীত এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—*

"ঐ যে চলে যায় ঈড়ায় পিঙ্গলায়।
একুশ হাজার ছয়শত বার অজপারূপ বায়।।
গুরুদত্ত কৌশলে তারে ধর সবলে,
একটি তার যায়না যেন বিফলে চলে।
অজানাতে গেলে পরে কালদরিয়ায় ডুববি হায়।।
তাই বলি, ভোলা মন সদা রাখরে স্মরণ,
গুরুর নিকট পেয়েছ যোগ সাধন সন্ধান।
সৎসঙ্গ কয় দুঃখ নাশি হবে নিত্য সুখোদয়।।"

১। এই শরীরের কেহ বিনাশ না করিলেও তাহার হননক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে। প্রতি শ্বাসের সহিত এই দেহ বিনাশের দিকে ছুটিতেছে। কেহ বিনাশ না করিলেও শ্বাস ফুরাইয়া গেলে এই শরীর আর ক্ষণমাত্র থাকিবে না।

কাল অনন্ত। সেই কাল খণ্ড স্থ হওয়ার তাহার সংখ্যা হয়। জীব দিবারাত্রে ২১৬০০ বার অজপা জপ রূপ বহিঃপ্রাণায়াম করিয়া থাকে। ইহাই জীবের আয়ু। প্রাণের স্থূলাবস্থার নাম শ্বাস-প্রশ্বাস, যাহা জীবদেহে আপনা আপনিই হইতেছে। সেই দিকে লক্ষ্য না থাকায় জীবকুল অজ্ঞানে সংসারে যাতায়াত করিতেছে। সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না, জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া পৃথিবীতে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতেছে। শান্তি কিছুতেই পাইতেছে না।

"যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।।"

—(মোহমুদগর)

জন্মগ্রহণ করিলেই পুনরায় মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম—এই প্রকারের জন্ম-মৃত্যু প্রবাহরূপ দোষ সংসারে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। অতএব হে মনুষ্য, তোমাদের সন্তুষ্টি বিষয় কি আছে?

"চলে যাচ্ছে যা—কাল শব্দে তা
কালের সঙ্গে হায়—মন যেন না যায়।
তারে ধরে রাখি স্থির নয়নে দেখ।
মন প্রাণ যদি পড়ল ধরা তবেই অমর নইলে মরা।।"

কালস্রোতে সবই চলিরা যাইতেছে। এই "চলিয়া যাওয়াটাই" কাল। ঐ কালের বশে তোমার মনটি যেন না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খেচরী মুদ্রা সহ প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ যখন মস্তকে চড়িয়া বসে, তখন প্রাণ সহ মনস্থির হইয়া যায়। প্রাণে শান্তি আসে। এই যে প্রাণে একান্ত শান্তি ও স্থিরতা আসে সেইটিকে যোগের 'পরাবস্থা' বলে। তাহাতে অহংবোধ থাকে না। আত্মানুভব হয়। তাহাকে অনুভব পদ বলে। প্রত্যক্ষ অনুভূতি লইয়া বলিতে পারি যে, এই অবস্থায় মন প্রাণকে ধরিয়া রাখা সম্ভব। ঐ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে আজ্ঞা ভেদ করিয়া সহস্রারে পৌঁছাইলে, শিব-শক্তির সম্মিলনে সাধক শিবস্বরূপ হইয়া যান। তারপর যখন আজ্ঞায় নামিয়া আসেন, সাধক তখন অনুভব করেন যে শূন্যই মহাচৈতন্য। মহাচৈতন্যে থাকিবার স্থান আর নাই। মহাশূন্যে মহাচৈতন্যে এক হইয়া আছে। তাহাতে যদি মন যুক্ত হইয়া সুস্থির থাকিল তবেই সাধক অটল চৈতন্যে স্থির থাকিয়া অটল ও অমর হইলেন। আর তাহা না হইলেই কালের স্রোতে পড়িয়া অহরহঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

বায়ুর দুইটি অবস্থা। তন্মধ্যে একটি হইল স্থূল বা চঞ্চল আর অন্যটি হইল সূক্ষ্ম বা স্থির। স্থূল বায়ু সূক্ষ্ম বায়ুর আবরণ মাত্র। আবরণটির উপর দৃষ্টি দিলে ক্রমে অভ্যন্তরে সারবস্তুতে দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু ইহাতে স্থির দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জীবের সর্বস্ব যে আয়ু, সেই আয়ুর সর্বস্বই বায়ু। আর দেহস্থ বায়ুর সর্বস্ব শ্বাস। এই শ্বাসই জীবের সর্বস্ব। শ্বাসেই চৈতন্য। শুদ্ধ শ্বাসই শুদ্ধ চৈতন্য। এই প্রাণবায়ুই

প্রশ্ন ঃ নিষ্কাম কর্ম কি? কিভাবে এই নিষ্কাম কর্ম করা যায়?

উত্তর ঃ নিষ্কাম কর্ম হল কামনাবিহীন কর্ম। অর্থাৎ যে কর্মে কোন রকম কামনা থাকে না। যে শাশ্বত গতির কথা পূর্বে আলোচনা করেছি সেই শাশ্বত গতিতে মতি দিয়ে আমাদের বিরাট সত্তায় পৌঁছতে হবে। ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হীনতা সবটাই নষ্ট করে বিরাটের পথেযাত্রী হতে হবে। বিরাট থেকেই যখন আমরা ক্ষুদ্রতা, নীচতা হীনতার দিকে এসেছি তখনি আমরা ঠকেছি। তখনি আমরা মায়ার পাকে পড়েছি। অতি হীন স্তরে নেমেছি। সেজন্য আমাদের এই অবস্থা হচ্ছে। প্রভু বিশ্বস্রষ্টা ভগবান। তিনি আমাদের অন্তর দেবতা। আমাদের ভিতরে প্রাণপুরুষ, তিনি বিরাটও বটে আবার ক্ষুদ্র হয়ে আমার ভিতরে খেলা করছেন। সেই বিরাট সত্তাকে জানার জন্য তিনি আমাদের একটা সেতু দিয়ে রেখেছেন। সেটা হল যোগসূত্র। সেই সেতুটি হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ সেতুকে অবলম্বন করে আমাদের এগোতে হবে। সেই সেতুটি এমন সুন্দর দিয়েছেন প্রভু। সেই সেতুকে ধরে উর্দ্ধ দিকে উঠতে হবে আমাদের। তখন আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারব। আমাদিগকে এই কর্মটাই ভগবান দিয়েছেন। অর্জুনকে বলেছেন দেখ কর্ম তোমাকে করতে হবে। কর্ম না করলে কোন দাম নেই। কর্ম যখন করতেই হবে, যে কর্ম না করে উপায় নেই সেই কর্ম করতে তোমার এত কাতরতা? কি কর্ম? না নিষ্কাম কর্ম। কামনাবিহীন

জীবের জীবত্ব। মহাশ্বাস আছে, তাই আমিও আছি, তাই দেহ আছে। মহাশ্বাস সেই মহাচৈতন্য। তিনি আছেন তাই চেতনা আছে। তিনি গেলেই আমি (দেহ) অচেতন।

অতএব 'দেহ আমিটা' এই বোধ ছাড়িয়া দিয়া 'শ্বাসে আমি' এই বোধ ধরিয়া শ্বাসের সেবায় অর্থাৎ শ্বাসে দৃষ্টি ও মন দিয়া থাকিলে শ্বাসের প্রতি মমতা জন্মিবে। দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখায়, জড় দেহে যদি একান্ত মমতা হয় তবে চৈতন্যরূপ শ্বাসে মন রাখিতে রাখিতে শ্বাসের প্রতি মমতা কেন না হইবে অর্থাৎ নিশ্চয়ই হইবে। জড়ের সঙ্গে নশ্বর বস্তুতে মায়া হয়, ক্ষণিক ভালবাসা হয়। চৈতন্যস্বরূপ শ্বাসরূপী চিরস্থায়ী অবিনশ্বর প্রাণের সহিত মনের মিলন করিয়া রাখিলে অপূর্ব চিরানন্দময় প্রেম প্রতিষ্ঠা হইবে। ইহাকেই মনেপ্রাণে এক করা বলা হইয়া থাকে। তাই গুরুদেব বলিয়াছেন—'শ্বাস গতিহীন অবস্থায় চলে যাচ্ছে। ওর গতিতে মতি দাও। অর্থাৎ শ্বাস বেহুঁশে চলে যাচ্ছে। এই চঞ্চল শ্বাস বর্হিমুখী জগতে সৃষ্টিমুখে ছুটিতেছে। সেই চঞ্চল শ্বাসকে স্থির করিয়া তাহাতে মতি দাও অর্থাৎ প্রাণের সহিত মনের মিলন করিয়া চলিতে থাক। তাহা হইলে তুমি বিরাটের পথে যাইতে পারিবে। প্রাণময় হরিকে পাইয়া জীবন সার্থকতায় ভরিয় উঠিবে।

কর্মের দ্বারা কামনাবিহীন রাজ্যে তোমাকে যেতে হবে। নিষ্কাম কর্ম একমাত্র আমি যে সূত্র দিলাম অর্থাৎ এই শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাস অবলম্বন করেই বেঁচে থাকবে আর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস অবলম্বন করে প্রত্যেক মানুষই বেঁচে থাকে। এটা কামনাবিহীন কর্ম। কামনাবিহীন কর্মের দ্বারা কামনাবিহীন রাজ্যে আমাদিগকে যেতে হবে।

এতবড় নিষ্কাম কর্ম আমাদের ভিতরে আছে! বিশ্বে আর কোন কর্ম নাই, যা এত নিষ্কামভাবে করা যায়।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই কর্ম হচ্ছে, যেটা আমি সূত্র ধরে দিলাম। এ সূত্রকে ধরে, অবলম্বন করে গতি স্থির কর তাহলে ঠিক হবে। কামনাবিহীন কর্মের দ্বারা কামনাবিহীন রাজ্যে যেতে হবে। বিশ্বে কামনাবিহীন কর্ম কিছু নেই। একমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাস।। শ্বাস-প্রশ্বাস গতিঃ বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। শ্বাস-প্রশ্বাস গতি আপনা আপনি বিচ্ছেদ হবে। শ্বাস হচ্ছে প্রাণবায়ু। শ্বাস হচ্ছে ছায়া, প্রাণ হচ্ছে কায়া। এই কায়ার ছায়া। এই কায়ার কাছে যেতে হলে ছায়াকে অবলম্বন করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস অবলম্বন করলে প্রাণের কাছে যাওয়া যায়। এই শরীর রূপ সাকারের ভিতরে চলছে শ্বাস-প্রশ্বাস। মনকে ধরতে হবে, মনকে সংযত করতে হবে। শ্বাসকে না অবলম্বন করলে প্রাণের কাছে যেতে পারবে না। প্রাণের কাছে না গেলে মনকে ধরতে পারবে না। শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ এই সূত্র ধরেই আমার কাছে এস। তাহলে আর কোন বাধা নেই, বিঘ্ন নেই। মনকে ধরতে পারবে। প্রাণকে ধরতে পারবে। অন্তঃকরণকে ধরতে পারবে, যা সর্বদা সাক্ষী স্বরূপ।

প্রশ্ন ঃ শ্বাসকে অবলম্বন করে শাশ্বত গতিতে মতি দিলে কি সব ভ্রান্তি কেটে যায়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, তখনই সব ভ্রান্তি কেটে যায়। তখন ভ্রান্তি বা কি কিছুই নেই।

প্রশ্ন ঃ কিছুই নেই, তবুও মানুষ যাচ্ছে কি আশায়?

উত্তর ঃ ওষ্ঠ থেকে ভ্রূদ্বয় পর্যন্ত এইটুকু জায়গায় এক বিঘতের খেলা। এতে কি বা পাবে, পাচ্ছেই বা কি, কেন যে উন্মাদ তাও বুঝি না। ঐ জায়গাটুকু ছবিতে বা সিনেমার পর্দাতে তুলি দ্বারা বা কালি দিয়ে এঁকে তাকেই দেখে উন্মাদ হচ্ছে। এটা বিটলামি ছাড়া আর কি? কিছুই নাই শুধু ভ্রান্তি। তবু মানুষ একেবারে উন্মাদ পাগল। সেই পর্দায় কালি দিয়ে একটা মূর্তি তৈরী করে তাতে উন্মাদ হয়ে মাথা খুঁড়ছে। সেজন্য বলছি—মহামানব, অতিমানব, শ্রেষ্ঠ মানব, বিরাট মানব একমাত্র সেই যে স্রষ্টার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করবার প্রয়াস পেয়েছে।।

সেই সৌর জগতে চারটি মানব আছে মহামানব, অতিমানব, শ্রেষ্ঠ মানব, বিরাট মানব।

অতিমানব—জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকের স্বভাবে মানুষ যখন ক্ষুদ্রতা থেকে বিরাটে যায় তাকে বলে অতিমানব।

মহামানব— অর্থাৎ এই পর্যায়ে মানুষ নিজেকে নিজে অনুভব করে যে এই মানুষ কেন যে ভ্রান্তির পথে ছুটেছে। কি পাচ্ছে কি বা পাবে, কি পাওয়ার জন্য ব্যস্ত আছে। এইটুকু হচ্ছে একটা মহামানবের বিচারের শক্তি। প্রভু বিশ্বস্রষ্টা ভগবান মানুষকে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই এইভাবে বিচার কর, তুমি বিচার করে প্রকৃত পথ ধর। ভ্রান্তিতে আছে বিশ্বটা। এই বিশ্বটা বিশ্বাসে ভ্রান্তির খেলা করছে।

প্রশ্ন ঃ বিরাট মানব কি?

উত্তর ঃ বিরাট মানব অর্থাৎ সীমা নাই, অসীম আনন্দ। আবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌। এইভাবে তিনি খেলা করছেন সেজন্য বলছি, সত্যিকার বলছি আমি কোথায় ছুটেছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝবার চেষ্টাও করছি না। কি একটা হয়েছি! এত হীনস্তরে যদি মনুষ্য জনম খেলা করে ভগবান দুঃখ অনুভব করেন। আমি মানুষকে সর্বশক্তি দিয়ে (জ্ঞান বিবেক) পাঠালাম সে তার বিচার আসনে বিচার করে চলবে; তা না হয়ে কামনায় অধীর হয়ে দানবীয় খেলা খেলছে। দানব মানব-দেবতা এই তিন নিয়ে তো খেলা।

প্রশ্ন ঃ দানব, মানব, দেবতা—এসবের প্রকৃত অর্থ কি?

উত্তর ঃ দানব হচ্ছে ঐ আসুরিক ভাব নিয়ে খেলা করা। মানব মানে প্রকৃত সত্যকে অনুভব করা জন্য প্রয়াস অর্থাৎ সর্বাদাই বিচারে সমাসীন থাকা, এবং বিচার দ্বারা এই সৌর জগতের প্রকৃত সত্যকে উদঘাটন করা। সৌর জগৎও শুধু মানুষই বিচার করবে। আর তো করার কেউ নেই। যিনি মনুষ্যত্ব অর্জন করছেন এবং বিচারে প্রকৃত সত্যের অনুশীলন করতে শিখেছেন তিনিই মানব। দেবতা—নিষ্ক্রিয় অবস্থা, প্রকৃত সত্যকে সত্যে সমাসীন থেকে জগৎটাকে অনুভব করা। দিব্যভাবে ভাবিত হয়ে থাকতে হবে। তার নাম দেবতা।

প্রশ্ন ঃ নিষ্ক্রিয় থাকতে আপনি তো বলছেন কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকলে কি দেব-দানবের সংগ্রাম হয়?

উত্তর ঃ তা সংগ্রাম হয় না। নিষ্ক্রিয় মানে এখানে চলবার পথে যখনি মানুষ বাধার সৃষ্টি হচ্ছে তখনি তাকে সক্রিয় হতে হচ্ছে। দিব্যভাবে ভাবিত হয়ে চলতে হচ্ছে। দিব্য ভাবটা নিতে হবে। তা না হলে দেবতা হয় না। এইভাবে আমাদের সংগ্রাম চলছে বিশ্বে অনাদি অনন্তকাল ধরে। কিন্তু কিছু পাচ্ছে না অথচ উন্মাদ। এ বলবার কিছু নেই। অথচ মানুষ যদি সংগ্রাম করে, বিচার করে কি করতে আসছে, তাহলে তার জীবনধারা পরিবর্তিত হয়। তা না করে মানুষ চামড়া, ঘাম চাঁটছে।

প্রশ্ন ঃ ঘাম চাঁটছে এ কথা কেন বলছেন?

উত্তর ঃ চামড়া আছে আর মাংস আছে; তাতে ঘাম বেরুচ্ছে তো, ঘাম চাঁটছে। চামড়া থেকে ঘাম ঝরে যাচ্ছে; ঘাম চাঁটা কোথায়? মুখ চুম্বনে চাঁটা হচ্ছে। ঐ চেঁটে পাওয়ার আনন্দ। এই (চামড়াটা) নিয়ে উন্মাদ বিশ্ব।*

**রহস্যার্থ—আমাদের দেহ প্রকৃতিটি প্রকৃতপক্ষে কি এবং কিসের সমবায়ে গঠিত তাহা জানা প্রয়োজন। ইহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে আমাদের স্বদেহ বা পরদেহের প্রতি যে আসক্তি, যে কারণে আমরা এই কলেবর লইয়া মোহগ্রস্ত হই তাহা দূরীভূত হইতে পারে।*

পঞ্চভৌতিক উপাদানে গঠিত জীব দেহ। ইহা মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থা হইতে পার্থিব সংসারে পুনঃ নবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে বিকাশলাভ করিয়া ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। ক্রম পরিণতিযুক্ত এই দেহই সুখ-দুঃখ ভোগের আস্পদ। মানুষ মাত্রেরই স্বীয় দেহের স্বরূপ, ইহার তত্ত্ব ও ইহার নশ্বরতা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়ের সুখই চরম সুখ নহে। উহা নিতান্ত স্থূল। এই স্থূলের অন্তরালে রহিয়াছে সূক্ষ্ম অতিন্দ্রীয় জগৎ। মানুষই সাধনা দ্বারা অতিন্দ্রীয় জগতের রহস্য উন্মোচন করিতে এবং ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দলাভে সমর্থ হয়। এই অতিন্দ্রিয়ের রহস্য উন্মোচিত হইলে সাধকের আর স্থূল, পার্থিব, নশ্বর ভোগ্যবস্তুতে আকর্ষণ থাকে না। আমাদের শাস্ত্রসকল জীবকে আপন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া থাকে। জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্রে বলা হইয়াছে—

"শুক্রশোণিতমজ্জা চ মেদো মাংসঞ্চ পঞ্চমম্।
অস্থিত্বক চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ।।"

—(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র)

অর্থাৎ শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি এবং চর্ম এই সপ্তধাতু দেহমধ্যে অবস্থিত আছে। দেহকে অর্থাৎ ভূত শরীরকে আত্মা, মনকে অন্তরাত্মা, শূন্যময়কে পরমাত্মা বলা যায়। মন ঐ শূন্যময় পরমাত্মায় বিলীন হয়।

"রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎপিতা।
শূন্যধাতুর্ভবেৎ প্রাণো গর্ভপিণ্ডং প্রজায়তে।।"

—অর্থাৎ রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা এবং শূন্যধাতু প্রাণস্বরূপ। এই তিনের সংযোগে গর্ভপিণ্ডের উৎপত্তি হয়। গুরুদত্ত কর্মের দ্বারা এই প্রাণকে কূটস্থে স্থিতি করিতে পারিলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। তাহা না হইলে, অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া এই সংসার রঙ্গভূমিতে আসিয়া জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রে আছে—

"কলেবরমিদং স্থানং বিগ্রহো মূর্তিমানসৌ।

পঞ্চভূত নিবাসোহয়ং কথং তত্র সুখী ভবেৎ।।"— (বোধসার)

—এই শরীর কলহের অথবা অধর্মবহুল কলিকালের শ্রেষ্ঠ দুর্গ অর্থাৎ কলিকালে শরীর রক্ষণ ও শরীরের সুখ সাধনই মনুষ্যের মুখ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত। এই দেহ মূর্তিমান কলহস্বরূপ অর্থাৎ ইহাতে বায়ু পিত্ত, কফ এই ত্রিধাতুর নিরন্তর যুদ্ধ চলিতেছে। এই দেহ পাঁচটি ভূতের আবাসভূমি, একটি ভূতের আবাসভূমিতে যেমন সুখের সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ পাঁচটি ভূতের বাসস্থানে যে সুখের আশামাত্রও নাই তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তাই ভক্ত সাধক গাহিয়াছেন—

একটা ভূতে রক্ষা নাই মা, পাঁচটা ভূতে বসত করে।
ভেবে সারা ওমা তারা, কেমন করে ধৈর্য ধরে।।
আমি ভূতের রাজ্যে করি বাস, ভূত দেখে আর হয় না আশ।
এ দেহ যে ভূতের আবাস, ভূতে ভূতে লড়াই করে।।
ভূতের জ্ঞানে সদাই ফিরি, আর ভূতের আজ্ঞা ছাড়া চলতে নারি।
আমি ভূতের বেগার খেটে মরি, দুঃখের কথা বলব কারে।।

"কারাগৃহং গর্ভবাসো বাল্যং কেবল মূঢ়তা।
তত্রাপি দুঃসহাত্যন্তং পরাধীন তয়া স্থিতি।।" —(বোধসার)

অর্থাৎ মাতৃগর্ভে বাস কারাগার নিবাসের ভুল্য। শৈশবকাল মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই শৈশবেও আহার বিহারাদি সম্বন্ধে পরাধীন হইয়া থাকা একান্ত অসহ্য। অতঃপর আসে যৌবন। যৌবনে মদনের সম্মোহন প্রভৃতি বাণ দ্বারা আহত হইয়া পীড়িত হইতে হয়। যে যৌবনে নারীর অপ্রাপ্তি হেতু সন্তাপ উপস্থিত হয়, যে যৌবনে সর্বদুঃখ কারণভূত বিবিধ পাপ সঞ্চয় হইয়া থাকে, সেই যৌবন বিপদেরই বন। তাহাতে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? তারপর আসে বার্দ্ধক্য। বৃদ্ধের শরীর (লাঠি ধরিয়া গমনকালে) কখন উন্নত কখনও অবনত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং সারা জীবন সংসার জ্বালায় দগ্ধ হওয়ার পর জরা আসিয়া সেই সংসার জ্বলনের নিদর্শন ভূত ভস্মের ন্যায় ধূসর বর্ণ কেশরাজি দ্বারা মস্তক ও সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখে এবং দেহটি তখন শুষ্ক কুষ্মাণ্ডের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য হইয়া বিরাজ করে। সেই কারণে সেই দেহকে তখন আর কেহ আদর করে না। অতঃপর মরণে যে দুঃখ তাহার কথা আর কি বলিব। ইহা সর্বজন বিদিত ও বর্ণনাতীত। মরণের পর আবার যমদূতের ভয়। যদি নরকে যাইতে হয়, তাহা হইলে সেই স্থান হইতেও পতনের ভয় আছে। স্বর্গাদি সুখভোগ শেষ হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কাজেই আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার দুঃখ আবার ভয়। জীব এইরূপে অজ্ঞানান্ধকারে ও দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া সর্বপ্রপঞ্চের অতীত যে মোক্ষরূপ অবস্থা আছে তাহা বুঝিতে পারে না।

পৃথিবী সূর্যের দ্বারা সম্যকভাবে পরিরক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইলেও আকাশে বা ব্যোমে ওতপ্রোতভাবে নিমজ্জিত থাকিয়া স্বীয় বিকাশ লাভ করে। সূর্য নিজে যেমন আকাশ হইতে স্বীয় বিকাশ ও শক্তি সংগ্রহ করে, পৃথিবীও সেই আকাশ হইতে বিকাশ ও শক্তি সংগ্রহ করে। তদ্রূপ নাভিদেশ দ্বারা হৃদপিণ্ড চালিত হইলেও আকাশ উহাকে বিকাশ শক্তি দিয়া থাকে। মানবশরীরে কণ্ঠদেশ হইল আকাশ তত্ত্বের স্থান। কণ্ঠদেশ হইতে ব্যোমতত্ত্ব হৃৎপিণ্ডের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের ভিতরকার আকাশ বা শূন্য গহ্বর অনবরত রক্তপ্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতেছে। সেই শূন্য গহ্বরে এক অপূর্ব শক্তি আছে, সেই শক্তি বলে আমাদের প্রাণের ভাব প্রবাহ রক্তকণাকে এবং পরস্পরভাবে সমস্ত দেহকে অনুপ্রাণিত করিয়া যথাযথভাবে সংঘটিত হইতে অবসর বা আশ্রয় দেয়। জীবের স্ব স্ব ধর্ম বা প্রকৃতি অনুযায়ী যে দেহ গঠিত হয়, এই আকাশই তাহার সাক্ষাৎ কারণ। তারপর ভাব। ভাবের উৎপত্তি শব্দ হইতে এবং বাহ্যপ্রকাশ ও বাহ্যশব্দরূপে বা বাক্যরূপে। শব্দ হইতে ভাব উৎপত্তি লাভ করিয়া হৃদয় গঠিত করে। হৃদয় ভাব সমষ্টিমাত্র। আর ভাব শব্দ সমষ্টিমাত্র। শব্দ শূন্য ভাব হইতে পারে না। আবার সেই ভাব ব্যঞ্জনার উৎপত্তিস্থান কণ্ঠ বা বিশুদ্ধ চক্র। সুতরাং কণ্ঠের উপর হৃদয়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে। শব্দ না হইলে ভাব জন্মায় না। প্রথমে শব্দ তাহার পরে ভাব। তুমি যত প্রকারের অর্থযুক্ত শব্দ জান যদি সেইগুলিকে ভুলিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমার ভাবরূপ কোন উপলব্ধি থাকিবে না। তোমার হৃদয় থাকিবে না। প্রথমে শব্দের উৎপত্তি, তারপর ভাবের এবং শেষে পদার্থের উৎপত্তি হয়। বৃক্ষ বলিলে যে পদার্থটি বুঝায় তাহাতে প্রথমে 'বৃক্ষ'রূপ একটি শব্দের উৎপত্তি ও পরে বৃক্ষরূপ একটি ভাবের ও শেষে বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বৃক্ষকে আমরা চক্ষু মেলিয়া দেখি।—ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। সর্বপ্রথম আমাদের ও অন্যজাতীয় মনুষ্যের কণ্ঠে একটি সাধারণ শব্দতরঙ্গ রচিত হয় এবং তাহা প্রকাশ হইবার কালে আমাদের যান্ত্রিক তারতম্যবশতঃ "গো" শব্দাকার গ্রহণ করে। বিশুদ্ধচক্রে মাতৃবেদন বা প্রণবরূপ নাদ আকার গ্রহণ করিয়া অহর্নিশ ধ্বনিত হইতেছে। সেই নাদ মাতৃবেদনেরই সংঘাতের তারতম্যে বিভিন্ন শব্দে বিশেষিত হইয়া বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন পদার্থের জনক হইবার জন্য যে প্রকার শব্দাকার গ্রহণ করে, সেই প্রকার ভাব হৃদয়ে পরিপুষ্ট হয় এবং পরম পদকে আমরা সেই পদার্থরূপে দেখি বা হৃদয়ে অনুভব করি। বিশুদ্ধচক্রে শব্দাকার সৃজন তারপর বুদ্ধির দ্বারা তাহা সংগৃহীত ও হৃদয়ে ভাবাকারে উদ্বেলিত হওয়া রূপ কার্য ঘটিয়া থাকে। বিশুদ্ধাখ্য-বেদনের স্থান, উহা জড় ও চৈতন্যের সন্ধিস্থল। জড় ও চৈতন্য বলিয়া সাধারণে যে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বশবর্তী সেই উভয়বিধ বিজ্ঞানের সম্মিলন স্থান কণ্ঠ। নাদ সেই চৈতন্য বেদন হইতে সঞ্জাত হইয়া শব্দাকার

বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় । মায়ের বেদন হইতেই সমস্তের উৎপত্তি। সেই বেদনই বেদাকারে মাতৃ নিশ্বাসবৎ প্রবাহিত হয়। এই বেদনই সেইজন্য ব্রহ্মপদ বাচ্য। পাঞ্চ ভৌতিক সৃষ্টির ইহাই সাক্ষাৎ সর্বপ্রথম বিকার আবার এই বেদন হইতেই ভাবসৃষ্টি ও অপরদিকে বাহ্যসৃষ্টি হয়। বেদন শব্দাকার গ্রহণ করিয়া ললাটস্থানে মনোরূপ একটি গণ্ডী রচনা করে। এই কণ্ঠদেশ জড় ও চৈতন্যের সন্ধিস্থল। জড় ও চৈতন্যের সন্ধিস্থল কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে মানুষ যখন সদ্‌গুরুর কৃপায় ধীরে ধীরে- আত্মবোধের সমীপস্থ হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়া ইন্দ্রিয়দের অত্যাচার উপলব্ধি করিতে থাকে। ক্ষণেক্ষণে চৈতন্যময় ভাবটি ফুটিয়া উঠে, আবার ক্ষণেক্ষণে আসুরিকভাবে বা জড়ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তদবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গের উভয়মুখী ভাব পরিলক্ষিত হয়। একদিকে যেমন চৈতন্য প্রিয়, অপরদিকে তেমন জড়ত্বমুগ্ধ। এক কথায় এই জড় চেতনের যুদ্ধই দেবাসুর সংগ্রাম। মনুষ্যকূলে আসিবার পূর্ব পর্য্যন্ত জীবের এই সংগ্রাম উপলব্ধি হয় না। তখন ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতাবৃন্দও সম্যক জড় ভাবাপন্ন থাকে। অতঃপর জীব যখন মানুষ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে, ক্রমশঃ তাহার জড়ভাব অপনীত হইতে থাকে। ইহা সত্য যে জড়কর্তৃক চৈতন্য উৎপীড়িত। ইহাই দেবাসুর সংগ্রামের প্রকৃত রহস্য। জড়ত্ববোধের নাম বন্ধন। ইহাই অসুরভাব। আর চৈতন্যমাত্র উপলব্ধির নাম মুক্তি। উহাই দেবভাব। শাস্ত্রে আছে—যে আপনাকে জানে না এবং অন্যকেও জানিতে পারে না, তাহার নাম জড়। এই হিসাবে গুণএয় বা বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় অবধি যাবতীয় দৃশ্যবর্গের নাম জড় এবং যিনি এই যাবতীয় দৃশ্যের দ্রষ্টা বা প্রকাশক তিনিই চেতন। অতএব সেই চৈতন্যময় রাজ্যে পৌঁছাইতে হইলে আমাদিগকে আজ্ঞা চক্রে (কূটস্থে) প্রাণের স্থিতি করিতে হইবে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধাখ্য, আজ্ঞা এই লইয়া দেহের ষট্‌চক্র। দেহস্থ ষট্‌চক্রের বিশুদ্ধাখ্যচক্র কণ্ঠস্থানে এবং আজ্ঞাচক্র ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে। এই দু'য়ের মধ্যে মনোদৃষ্টি স্থির থাকিলে সত্ত্বগুণ জন্মায়। সত্ত্বগুণের মধ্যস্থ চৈতন্যই বিষ্ণু।

"বিষ্ণুতেই চিত্ত রাখ কহে, আর্য্যগুরু।
বিষ্ণু শুদ্ধ সত্ত্বগুণ কণ্ঠ হ'তে ভুরু।।"

অতএব কূটস্থ চৈতন্যে স্থিতি হইতে হইলে-যোগপথ অবলম্বনীয়। জীবাত্মা পরমাত্মার যোগকে (মিলনকে) যোগ বলে। আবার দুঃখ সংযোগের বিয়োগ বা ধ্বংসকেও যোগ বলে। কারণ জীব যখন বিশুদ্ধাখ্যে বা কণ্ঠের নিম্নে থাকিয়া জগতের মাঝে খেলা করিতে থাকে। তখন মান, অপমান, হাসিকান্না সুখদুঃখ ইত্যাদি বোধ করিতে থাকে। জড়ের সংযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া যে দুঃখ, সেই দুঃখকে বিরোগ করার নামই যোগ। সুতরাং কণ্ঠের নীচে মনকে না নামাইয়া কণ্ঠের উপরিভাগে আজ্ঞাচক্রে স্থিতি করা; ইহাকে চৈতন্যে অবস্থান করা বলা

হয়। যতদিন চিত্ত শ্রীভগবানে সমাহিত না হয়, ততদিন চিত্ত দুঃখের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু চিত্ত আনন্দময়ের সহিত যুক্ত হইলে দুঃখসংযোগ হইতে চিত্তের বিয়োগ হয়। এইজন্য বিয়োগকে যোগ বলা হইল। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"তং বিদ্যাদ্দুঃখ সংযোগ বিয়োগং যোগ সংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিন্ন চেতসা।।" (৬। ২৩)

অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধে দুঃখ সংযোগের বিয়োগ হয়। "বিয়োগ" হয়, তথাপি ইহা যোগ শব্দবাচ্য। এই যোগ অধ্যবসায়ের সহিত শৈথিল্যরহিত চিত্তে অভ্যাস করা কর্তব্য। যাহা হউক কণ্ঠের নিম্নভাগে ভৌতিক অধিকার (ভৌতিক শৃঙ্খলা ও শক্তি), এবং কণ্ঠের উপরিভাগে আত্মিক অধিকার ও শক্তি। সেই ভৌতিক অধিকার ও শক্তির সহিত ব্যবহার কারতে কর্মেন্দ্রিয় ও ঊর্দ্ধে সেই আত্মিক অধিকার ও শক্তির সহিত সম্বন্ধ বাঁধিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল প্রতিষ্ঠিত। যত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান কণ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধভাগে আর যত কর্মেন্দ্রিয়ের স্থান কণ্ঠ হইতে নিম্নভাগে। অবশ্য ত্বক্‌রূপ প্রাণেন্দ্রিয় নিম্নেও আছে। কিন্তু ত্বকের (চামড়া) ধর্ম যে স্পর্শ সুখ তাহা সর্বাঙ্গীণ হইলেও মুখেই উহা প্রধানভাবে কার্য্যকরী। চুম্বনই স্পর্শধর্মের সর্বপ্রধান বিকাশ। উহা কণ্ঠের ঊর্দ্ধেই অবশ্য সংসাধিত হইয়া থাকে। তাই আমার গুরুদেব বলিতেন—"ওষ্ঠ অধর থেকে ভ্রূদ্বয় পর্য্যন্ত একবিঘত জায়গা, তাহাতে চামড়া ও মাংস আছে, সেটা খানিক চাঁটছে আর কামড়াচ্ছে।"

"চর্ময়ন্তি মহামাংসগতে প্রাণে পিশাচকাঃ।
জীবৎ পরস্পরং মাংসং স্ত্রীপুংসাশ্চতুরাননাঃ।।"—(বোধসার)।

অর্থাৎ প্রাণগত হইলে, পিশাচেরা মনুষ্য মাংস চর্বণ করে, পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষেরা জীবিতাবস্থায় পরস্পরের মাংস চর্বণ করে, কিন্তু তাহা কাহারও দুঃখদায়ক হয় না। (ইহাই আননের বা পরস্পরের মুখের চাতুর্য্য)।

পিশাচগণ রাত্রিকালে শ্মশানে মনুষ্যদেহ লইয়া নৃত্য করে, কিন্তু গৃহবাসিগণ গৃহেতেই বিচিত্র অঙ্গবিন্যাস সহকারে নরদেহ লইয়া নৃত্য করে।

"লিহতি স্পৃশতি ভ্রান্তো মুহুর্জিঘ্রতি খাদতি।
গ্রাম সিংহানুরূপেয়ং গ্রাম্যধর্ম ব্যবস্থিতিঃ।।" (বোধসার)।

এই সংসারে স্ত্রী পুরুষের ধর্ম কুকুরের ন্যায় দৃষ্ট হয়, যেহেতু ভ্রান্ত মনুষ্য বারবার লেহন করে, স্পর্শ করে, আঘ্রাণ করে ও উপভোগ করে। গাত্র কণ্ডূয়ণ করিয়া (চুলকাইয়া) যে সুখ হয় এবং পরে যাহা কষ্টদায়ক হয়, তাহা কি প্রকারে সুখ হইতে পারে? বিষয়ভোগজনিত সুখও তদ্রূপই হইয়া থাকে।

"নাদাসক্তং মৃগং ব্যাধশ্ছিনত্তি নিশিতৈঃ শরৈঃ।
রূপাসক্তং নরংনারী রতিচ্ছুরিকয়াহসকৃৎ।।"

ব্যাধ বংশীনাদমুগ্ধ মৃগকে তীক্ষ্ণবাণ দ্বারা বধ করে, আর নারীরূপে আসক্ত নরকে রতিচ্ছুরিকা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তবে বধ করে অর্থাৎ অনেক কষ্টপ্রদানের পর বধ করে। সুতরাং প্রমদারূপিণী নারী মানুষকে সহজেই মাতাল করিয়া ফেলে। একদিকে রূপজ আকর্ষণ অন্যদিকে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দুর্নিবার আকাঙ্খা এই দুইয়ের পীড়নে মানুষ দিশাহারা হয়। আসঙ্গ লিপ্সাই চরম সুখ বলিয়া প্রতিভাত হয় আর সেই আসক্তিতে বদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া চলে নর-নারীর এই ভানের খেলা। মহামায়ার ইহা এক অদ্ভুত লীলা। এই মায়ার বন্ধন যিনি প্রদান করেন তিনিই আবার সময়ে কৃপা করিয়া বন্ধনমোচন করিয়া দেন। অর্থাৎ মায়ার পাকে বদ্ধ মানুষই যখন জিজ্ঞাসু হয়, জীব জগতের রহস্য সন্ধানে বদ্ধপরিকর হয়, তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাধনসংগ্রামে অবতীর্ণ হয় জগজ্জননীই তখন সাধককে মুক্তির উপায় বলিয়া দেন অর্থাৎ গুরুরূপে শিষ্যকে সাধনাদি শিখাইয়া কৃপা করিয়া থাকেন। তাহাকে মুক্তির আলোকে উন্নীত করেন। সাধক দেহতত্ত্ব, দেহরহস্য অবগত হন। সর্বপ্রকার আসক্তি হইতে তিনি মুক্ত হন। জড়ের মোহ কাটাইয়া, জড়ের গ্রন্থি মোচন করিয়া তিনি চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত হন। সর্বত্র সেই চৈতন্যকেই প্রত্যক্ষ করেন। সাধারণ মানুষ জড় দেহ লইয়া মোহগ্রস্ত হয় আর সাধক জড়ের মাঝে চৈতন্যকে লক্ষ্য করেন কিন্তু জড় দেহের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ থাকে না।

আমাদের মানব শরীরে ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে মস্তিষ্ক ও চক্রসকল শিরোদেশ হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত এক শৃঙ্খল আকারে গঠিত হইয়া রহিয়াছে ও সেই বেদন সর্বত্র এই চক্রদি অবলম্বনে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কণ্ঠদেশ হইল জড় ও চৈতন্যরাজ্যের সন্ধিস্থল। এই স্থলেই জড়ের সহিত চৈতন্য মিলিত হইয়াছে। কণ্ঠদেশ এইরূপে জড় ও চৈতন্যরাজ্যের সন্ধিস্থল বলিয়াই আমাদের শাস্ত্রে শক্তিপূজাদিতে পশুবলিতে কণ্ঠদেশ ছেদনের ব্যবস্থা। চৈতন্যকে জড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার নিদর্শনস্বরূপই কণ্ঠদেশে পশু ছেদিত হইয়া থাকে। নতুবা হত্যা করিবার অভিপ্রায় থাকিলে অন্যপ্রকারে সহজে সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যাইত। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে যে শক্তিপূজায় হোমমন্ত্রে বলা হইয়াছে "দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা" দক্ষের ছাগমুণ্ড ছিল অর্থাৎ ঘোরপশুভাব ছিল। তাই দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন। শিবতত্ত্বই ব্যোমতত্ত্ব। যতক্ষণ মানুষ আজ্ঞাচক্রের উপর হইতে সহস্রারে মধ্যে থাকিতে না পারে ততক্ষণ শিবহীন যজ্ঞ হইয়া থাকে।

ন তত্র বাক্ গচ্ছতি, ন মনঃ ন বিদ্মো।
ন বিজানীমো যথৈতৎ উপশিষ্যতে।। (কেন উপনিষদ্)

অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষ অবাঙ্‌মনসগোচর অবস্থায় না যাইতে পারে, ততক্ষণ দক্ষযজ্ঞ। শিব যজ্ঞে যাইতে পারিলেই প্রকৃত যজ্ঞ। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে, হে মা, তুমি আমার দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কর, আমার ঘোর মোহাচ্ছন্ন ভাব দূর কর, আমার মধ্যেকার কোটি জীববৃত্তি লোপ কর এবং সেই কোটি কোটি জীববৃত্তির মধ্যে যে তুমি পরিবৃত আছো তাহা আমার উপলব্ধিতে আনাইয়া দাও। তুমিই যে ভদ্রকালী নির্গুণ নিরূপা মহাশক্তি আমার মধ্যে সদাবিদ্যমান—এই বোধ জাগ্রত কর।

পঞ্চভৌতিকনির্মিত আমাদের শরীর। প্রাণছাড়া তাহা মৃত। আর শবদেহ মানেই পশুবৎ। এই পশুর প্রাণস্বরূপ মহাশক্তি আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলপদ্মে অবস্থান করিতেছেন। তিনিই পশুর চালক, পালক, ধারক, পোষক। অতএব পতি। আজ্ঞাচক্রে সেজন্য শিবের নাম পশুপতি। আমরা জানি সাধককে তিন গ্রন্থি ভেদ করিতে হয় ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি। ব্রহ্মগ্রন্থি অর্থাৎ মূলাধার হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত ভোগ দিয়া আমাদের ভুলাইয়া রাখিয়াছ। বিষ্ণুগ্রন্থি অর্থাৎ মণিপুর থেকে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত তুমি শক্তি ও প্রাণ দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াই। রুদ্রগ্রন্থি অর্থাৎ বিশুদ্ধের ওপর হইতে দ্বিদল পর্য্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছ। এই তিনগ্রন্থি ভেদ করিয়া এখন তুমি দ্বিদলপদ্মের ওপরে অব্যক্তময়ী শিবদুর্গা হইয়া রহিয়াছ। হে পরমেশ্বরী, এই সহস্রদল কমল হইল তোমার উৎকৃষ্ট স্থান বা স্বস্থান।

অতএব বিশুদ্ধাখ্য বা কণ্ঠের নিম্নে থাকিলে পশুভাব এবং আজ্ঞাচক্রে মনের স্থিতি হইলে পশুপতি ভাব অর্থাৎ পশুপতিকে অনুভব করা যায়। তাই মন্ত্রে আছে—পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ। এখানে তাঁর শক্তির নাম পশুপতিগোহিনী। আজ্ঞাচক্রের উপরে আছে সহস্রদলপদ্ম। ঐখানেই মহাকাশ। ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা জীব সেখানে পৌছাইতে পারিলে সব কাজের ভিতর থাকিয়াও তার মন বুদ্ধি অহংকার চিত্তের মধ্যে সেই জ্ঞানস্বরূপ শিবের আস্বাদন পাইয়া থাকে। তাই সপ্তমচক্রে যে শিব রহিয়াছেন তাঁহার নাম মহাদেব। তাই মন্ত্রে আছে—মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। এখানে তাঁহার শক্তির নাম মহাদেবী। ক্রিয়াযোগ সাধনের দ্বারা কুলকুণ্ড লিনীশক্তি জাগ্রত হইলে শিবস্পর্শ উপলব্ধি ও শিবজ্যোতি দর্শন হয় ও ওঁ ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। দেহবোধ আর থাকে না। জীব যে শিবভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, এরকম বিদেহ অবস্থা আসে এবং অনুভূতি হয় যে, আব্রহ্মস্তম্ভ শুধুই ব্যোম্ বা আকাশ। যে মহাশক্তি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন তিনিই ঈশান। "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং" (ঈশোপনিষদ্)। ইহাই শিবের ব্যাপক মূর্তির বর্ণনা। অষ্টশিবের শেষ শিবের নামও ঈশান। তাই মন্ত্রে আছে ঈশানায় সূর্য মূর্তয়ে নমঃ। তার শক্তির নাম ঈশানী। এখানে যে সূর্য্যের কথা বলা হইল তা সূর্য্যগ্রহ নয়। "সুবতিকর্মসু ইতি সূর্য্য।" ইনি শিবরূপ আত্মসূর্য্য।

এই আত্মসূর্য্য না থাকিলে মানুষের পক্ষে কোন কর্মই করা সম্ভব নয়। তাই জীবগণ জড়ভাব হইতে নিজেকে আলাদা করিয়া চৈতন্যে বিশ্রামলাভ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া শুধু মাংস ও চামড়া লেহন করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ভ্রান্তির খেলা খেলিতেছে। এইভাবে একদিকে জীবকুল জগতের ভোগ্যবস্তুসমূহকে স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। অপরদিকে বলবান কাল (কালরূপী ঈশ্বর) একলাই তাহাদের সকলকে গ্রাস করিতেছেন। তাই বলি, বিষয়াসক্ত হইয়া কালমুখে প্রবেশ করিও না। পূজ্যপাদ যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন যে "অকালমৃত্যু বলিয়া শোক করিও না। জীবের পক্ষে কালাকাল মনে হয়, কালের অকাল নাই। এজন্য জীবের কর্তব্য সমস্তকালেই কালরূপী হংসের শরণাপন্ন হইয়া থাকা। একারণ আমি সকলকেই সাবধান ও নানাপ্রকার উপদেশ বাক্যদ্বারা কালের শরণাপন্ন হইয়া থাকিতে বলিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় অনেকে সেই উপদেশ পালন করেন না।"

কিভাবে এই কালরূপী হংসের শরণাপন্ন হইতে হইবে তদুত্তরে মদীয় গুরুদেব স্বামী ভবানন্দ গিরি বলিয়াছেন যে, "শাশ্বতগতিকে অবলম্বন করিতে হইবে অর্থাৎ শ্বাসকে অবলম্বন করিয়া সর্বদা সাধনায় ডুবিয়া থাকিতে হয়, তবেই ভ্রান্তি কাটিয়া যায়। শ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে কূটস্থে ধারণ করিতে পারিলেই আত্মদর্শন হয়, ফলে ভ্রান্তি থাকে না।

সুতরাং রূপরসাদি বিষয় যাহা অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া জীবকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, যাহার জন্য জীবকুল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভোগাসক্ত তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রাণের বহির্মুখী বৃত্তিই ইহার মূল কারণ। প্রাণের যে বহির্মুখী বৃত্তি দ্বারা এই মহা অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মূল উৎপাটন করিতে হইলে, নিজের স্বরূপাবস্থায় ফিরিতে হইলে আমাদিগকে যে পথ দিয়া বাহিরে আসিয়াছি, সেই পথ দিয়াই ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে। বিশ্বসংসার প্রাণরূপী ঈড়া ও পিঙ্গলা এই দুই পায়ে এবং তৃতীয় পদ সুষুম্নায় অবস্থিত। যেইস্থানে সমান বায়ু সেইস্থানে সদা থাকিলে সাধক অমৃত পদ পায়। সংসার মানে যাহা অস্থির, যাহা চঞ্চল। ঈড়া ও পিঙ্গলায় যখন শ্বাস বহে তখনই সংসার কার্য-জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি অসংখ্য দুঃখ চলিতে থাকে। ঈড়া ও পিঙ্গলায় যতক্ষণ শ্বাস বহিতে থাকিবে ততক্ষণ এই ঘোররূপ দর্শনের বিরাম নাই। কিন্তু সুষুম্নায় যখন শ্বাস চলে তখন এই সংসার অসংসার হইয়া যায়, এই মৃত দৃষ্টি অমৃত দৃষ্টিতে পরিণত হয়। তখন সব স্থির। সেই অবস্থায় জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখাদি শত শত পরিণাম কিছুই নাই। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। এই অবস্থা যাহার হয় নাই তাহার বোধগম্য হইবে না। অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যন্তিকী সুখকে অনুভব করিয়া সাধক কৃতার্থ হয়। তৃতীয় পাদ সুষুম্নায় ক্রিয়া করিতে করিতে ঊর্দ্ধে মস্তকে স্থিতিরূপ এক অবস্থা বা পুরুষের উদয় হইয়া থাকে। ক্রিয়ার

প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে আজকে মহামূল্যবান কথা শুনতে পেলাম। আগের থেকে শুনেছিলাম জগৎ ভ্রান্তিতে সৃষ্টি হয়েছে। আজকে বললেন যে বিশ্বাস থেকে বিশ্ব হয়েছে। সেটা কিরকম গুরুদেব?

উত্তর ঃ বিশ্বাস মানে বিগত শ্বাস। অর্থাৎ শ্বাস ঝড়ের মত বইলেই তাকে বলে বিগত শ্বাস এবং বিগত শ্বাস থেকে যৌবনের উন্মাদনায় ভ্রান্তিতে সৃষ্টি কার্য হয়। তখন বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধি সবই রহিত হয়ে যায়। কি করছে, কি পাচ্ছে, কি পাবে, কি পাবার জন্য ব্যস্ত আছে কোনটাই বুঝতে পারছে না। কি করছে, কি পাবে, কি পেলে তার চাওয়া-পাওয়া শেষ হবে, কোনটাই সে ধরতে পারছে না। এই ভ্রান্তি অনাদি অনন্তকাল ধরে চলছে। এই ভ্রান্তিতেই সকলে ছুটেছে। তখন যদি কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করে বাবা কোথায় যাচ্ছ? ঐ যে যাচ্ছে ওরা, ঐ যে যাচ্ছে ওরা মানে? কোথায় যাচ্ছে? তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি জানি না বাবা, আমি ওদের পিছনে ছুটেছি ; ওরা যেমন করছে আমিও তেমন করছি। এই গতিকেই জগৎ বলে। এই জগৎ কথাটা ভ্রান্তি থেকেই হয়েছে, সেজন্য বলি ভ্রান্তিতে উন্মাদ হয়ে ছুটছে, পাগল হয়েছে। তখন আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে মনীষিরা এই দুটো আসন দিয়েছেন। একটা জন্মাশুচি আর একটা মৃতাশুচি। অশুচি এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ এই দুইটি আসন দেওয়ার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ঃ মানুষ যাতে ভ্রান্তিকে ধরতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। ভ্রান্তিটা ধরবার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে বংশের মধ্যে একটা বাচ্চা তৈরী করল; আচার্যদেবকে, শুক্রকে গর্ভে নিক্ষেপ করল। তা থেকে ভ্রান্তিতে বাচ্চা হল। কোথায় সে বিরাটের চিন্ময় রাজ্যে গিয়ে প্রকৃত সত্ত্বায় সত্ত্বাবান হয়ে জন্ম সার্থক করবে তা না করে তাকে গর্ভে ফেলছে। এই যে উন্মাদ পাগল অবস্থা এই উন্মাদনার ফলে তার মূর্তি ধরে সে বেরিয়ে আসছে। মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র একমাত্র শুক্রাচার্যের জানা আছে। এইজন্য তিনি একমাত্র স্রষ্টা। তাঁকে পূজা

পরবস্থায় থাকিতে থাকিতে কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র, তন্মধ্যে গুহা, সেই গুহায় প্রবেশ করিলে যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই আকাশের অনুর মধ্যে সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজমান। সেখানে সকলই আছে, অথচ কিছুই নাই— প্রথমে 'আমার' এই অনুভব হয়, শেষে 'আমি'ও থাকে না, তখন সব একাকার, ইহাই সমস্ত কারণের কারণ—অব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় থাকার নামই জ্ঞান। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইল সেই জ্ঞান লাভ করা। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে সমস্ত আসক্তি, সমস্ত বন্ধন কাটিয়া যায় ও সর্বপ্রকার দুঃখের অবসান ঘটে।

করা কর্তব্য। কোথায় পূজা করবে? গর্ভে না ফেলে তাকে কূটস্থ চৈতন্যে নিয়ে যেতে হবে। সেইটিতো পূজা করতে হবে। তাকেই বলে প্রকৃষ্ট পুত্র।* একটা কথা হচ্ছে আসা যাওয়া দুটো পথ আছে। এসেছি, যাব। যাওয়াটাই ভুলে যাই কেন? আসাটা এসেছিলুম সেও নানা রকম দুর্যোগের ভেতর দিয়ে এসেছি। আবার দুর্যোগের সৃষ্টি করে যেতে হবে।

**ভাবার্থ—শাস্ত্রে বলা হইয়াছে 'শুক্র ধাতু ভবেৎ প্রাণঃ' অর্থাৎ শুক্রই প্রাণ। এই শুক্রই হইল বীর্য বা প্রাণ। ইহাই অমৃত। প্রাণস্বরূপ বীর্যকে সংযম শিক্ষা দ্বারা ধারণ করিতে হইবে। তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বনীয়। শরীরের তেজ রক্ষা হইলে তবেই ব্রহ্মচর্য পালন হয়। বাহিরের প্রাণ সূর্য এবং অন্তরের প্রাণ বীর্য। এই প্রাণরক্ষায় ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন না করিলে প্রকৃষ্ট পুত্র লাভ করা যায় না। পিণ্ড দ্বারা পুৎ নামক নরক হইতে যে উদ্ধার সাধন করে সেই হইল পুত্র। এই প্রসঙ্গে গুরুগীতায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।*

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

পিণ্ডং কুণ্ড লিনী শক্তিঃ পদং হংসমুদাহৃতম্।
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতং নিরঞ্জনম্।।

— (গুরুগীতা-৭৪)

শ্রীশঙ্কর বলিলেন, কুণ্ড লিনীশক্তিকে পিণ্ড, হংসকে পদ, বিন্দুকে রূপ এবং নিরঞ্জন পুরুষকে রূপাতীত বলে।

*এই কুণ্ড লিনীই সুষুম্নাস্থিত প্রাণশক্তি। ইনি প্রচণ্ড স্বর্ণবর্ণরূপা, তেজস্বরূপা ও দীপ্তিমতি। ইনিই সত্ত্ব রজঃতম এই তিন গুণের প্রসূতি ব্রহ্মশক্তি। এই ব্রহ্মশক্তিকে প্রকৃতিও বলা হয়। ব্রহ্মপ্রকৃতিস্থ হইয়াই সৃষ্টিকার্যে রত হন। শরীরের মধ্যে এই শক্তি মূলাধারে সুপ্তবস্থায় আছেন। এই মহাশক্তি কুলকুণ্ড লিনী যোগীদের হৃদয়কমলে নিত্য তত্ত্বের দ্বারা নৃত্য করেন এবং সমস্ত প্রাণীগণের মূলাধারচক্রে স্ফুরিতা হইয়া থাকেন।** তিনি বিদ্যুদাকৃতি। প্রাণবায়ু নিরোধের দ্বারা তিনি জাগরিত হন। প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিবার যে কৌশল তাহার নাম ক্রিয়া। মেরুমধ্যস্থ মূলাধারে এই শক্তি প্রসুপ্তাকারে বিরাজিত রহিয়াছেন। শরীরাদি সমস্ত অবয়ব ইহারই শক্তিতে স্থির হইয়া আছে। এই শক্তি হৃদয়ে আসিলেই সাধক স্থিতিপদ লাভ করেন। সেই স্থিতিপদের নাম 'হংস'। এই শক্তি মৃণালতন্তুর ন্যায় হৃদয়ে গমনাগমন করে। তাহা যখন ভ্রূমধ্যে যায় ও বিন্দুরূপ দেখায় তাহারই নাম 'রূপ'। এই বিন্দুই প্রকাশের দিক দিয়া আদিরূপ বা কূটস্থ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের*

** কুলকুণ্ডলিনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মৎ প্রণীত 'যোগ ও সাধন রহস্য' নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ঃ দুর্যোগ সৃষ্টি করে যেতে হবে সেটা কিরকম?

উত্তর ঃ শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করে। শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করে এই বিরাট সত্তার দিকে যাবে। আর কি বলব। এটা জানবে যে শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন না করে শুধু বুদ্ধি দ্বারা, শুধু জ্ঞানের দ্বারা যে মিলবে তা হয় না। দুটো একসঙ্গে নিতে হবে। তবে গিয়ে পাওয়া যায়। ঝড় তুলতে হবে:ভাবতে হবে যে আমি সেই আমাকে পর্বত শিখরে উঠতে হবে। তখন আনমনা না হয়ে উঠবার জন্য আকুলি-বিকলি হয়ে কি করে কি কৌশলে চট করে উঠা যায় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সেই রকম এই পর্বত শিখরে উঠবার মত আমাদের সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ভগবৎ পথে যেতে হলে অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুটো যেমন থাকে আর কিছু দরকার হয় কিনা জানি না। অভ্যাস আর বৈরাগ্য। সর্বদাই বৈরাগ্য। কোথায় যাচ্ছি; কোথায় যাব, ক্রমে ক্রমে এ হবে, এই সব ফিকির করা ভাবগুলো নিয়ে কখনও বিরাট সত্তায় যেতে পারবে না। সেজন্য বলছি আমাদের শাশ্বত গতিটাকে লক্ষ্য করে চলা উচিত।

প্রশ্ন ঃ শ্বাস+গতি=শাশ্বতগতি?

নামরূপ এই কূটস্থ হইতেই হয়। ক্রিয়ার পরবস্থাই হইল ব্রহ্মনিরঞ্জনের রূপ বা রূপাতীত অবস্থা।

প্রাণের সর্বশক্তি সম্মিলিত হইয়া ওহ্যদেশে যেন পিণ্ডাকারে প্রসুপ্ত রহিয়াছে। ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করাইতে হয়। এইভাবে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থে স্থিত হইবেন। সাধক যখন মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, বিষ্ণুপাদপদ্মে (আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থে) স্থাপিত করেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়। তখনই তিনি প্রবোধরূপ (প্রকৃষ্টজ্ঞানরূপ) পুত্র লাভ করেন। এই জ্ঞানরূপ প্রকৃষ্টপুত্র দ্বারা সাধক মুক্তি লাভ করেন। শুধু তাহাই নহে, সাধক নিজে এবং তদীয় ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষ সেই পুত্র দ্বারা নরক হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। সুতরাং আত্মকর্ম দ্বারাই এতাদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং তাহার দ্বারাই প্রকৃত পিণ্ড দান ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। ইহার ফলস্বরূপ 'কুলং পবিত্রং ও 'জননী কৃতার্থা' অর্থাৎ সাধকের সমস্ত কুল পবিত্র হইয়া থাকে, জননী কৃতার্থা হন। মানবজন্ম সার্থকতায় ভরিয়া উঠে।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এটা খুব লক্ষ্য করবে। এটা হারিয়ে যদি শুধু বচসা নিয়ে চল তাহলে বৃথা বাক্যাড়ম্বর হয়। তাতে কি হবে?*

**ভাবার্থ—জীবদেহে পরমাত্মা প্রাণরূপে শ্বাস-প্রশ্বাসের পথে আসিতেছেন এবং ঐ পথেই যাইতেছেন। অর্থাৎ 'আগম নিগম' হইতেছে। ঐ পথে তুমিও বিচরণ কর। "শ্বাস স্থির, দৃষ্টি স্থির, তবেই হবে মনস্থির।" প্রাণ ক্রিয়া দ্বারা প্রাণবায়ু স্থির হইলে মনস্থির হয়। বায়ু থামিলেই সিন্ধু আর উদ্বেলিত হয় না। তখন প্রশান্ত মহাসাগর অর্থাৎ অনন্ত প্রশান্তির পরশ পাওয়া যায়! চিৎ-চৈতন্য চিদাকাশ, চিরস্থির সুপ্রকাশ। তাই আমার গুরুদেব বলিতেন—"জগতের দিকে তাকিয়ে কি হবে? চৈতন্য সত্তার দিকে তাকাও।" অর্থাৎ চঞ্চল ভৌতিক যে জগৎ তাহার অন্তরালে রহিয়াছে সূক্ষ্ম চৈতন্য সত্তা। এই চৈতন্য সত্তাকেই আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা না করিয়া সাধারণ জীব পাঞ্চ ভৌতিক জগতের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া ভ্রান্তির পথে ছুটিতেছে। হাড়, মাংস লইয়া নৃত্য করিতেছে। তোমারও দেহে হাড়, মাংস আছে। তাহার দিকে তাকাইয়া কি হইবে? দেখিতে যদি হয় তবে তোমার মধ্যে যে 'প্রাণ' আছে, 'জ্ঞান' আছে, বিশুদ্ধ 'চৈতন্য' আছে তাহার দিকে লক্ষ্য কর, তাহাকেই জান। তাই শ্রীগুরুদেব সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—*

"আমারে কি খুঁজরে জীব তোর কাছে আমি
শ্বাসে শ্বাসে দিচ্ছি সাড়া, কেন ভ্রান্ত হও তুমি।
শ্বাসে শ্বাসে দিচ্ছি সাড়া, কেন খুঁজ আমায় ভক্তি ছাড়া,
আমি ছাড়লে হবি মড়া তাজা করবি জন্মভূমি।।
কেন খুঁজ জীব তীর্থে ছুটে আমি রে তোর চিত্তপটে।
বলেছি অর্জুনের নিকটে, রজঃ বিন্দু হই আমি।।
কেন খুঁজ জীব দেশ বিদেশে, আমি রে তোর চিদাকাশে
আছি আত্মানন্দে বসে, হই যে আমি তত্ত্বজ্ঞানী।
আমি ব্যাপ্ত হই সর্বত্রে ষোল আনায় যথাবৃত,
আমায় জানেন প্রেমিক ভক্ত, জানবি কিরে অল্পজ্ঞানী।
ভেবে ভবানন্দ বলে, আছি রে তোর হৃদ্‌কমলে
আমি রে সহস্রদলে মণিকোঠায় চিন্তামণি।।"

অতএব আমাদিগের শ্বাসকে অবলম্বন করিয়া শাশ্বতগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। আমরা গুরুদেবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, আমি দেহ তো নয়, শ্বাস চৈতন্য আকাশময়। শ্বাস হইল প্রাণবায়ু। এই প্রাণবায়ুই জীবের প্রাণচৈতন্য। এই প্রাণচৈতন্যই জীবের মধ্যে ঈশ্বরাংশ। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন —"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" অর্থাৎ আমারই অংশ জীবের মধ্যে আছে। এই প্রাণচৈতন্য দেহমধ্যে আসিলেই জন্ম। প্রাণচৈতন্য দেহ ছাড়িয়া

গেলেই মৃত্যু। প্রাণবায়ু নাসাপথে আসিতেছে ও যাইতেছে। একেবারে যাইতেছে না। এই শ্বাসে মন দিয়া শ্বাসকে ধীরে ধীরে স্থির ও সুদীর্ঘ করার যে প্রণালী তাহা অভ্যাস করার নামই সাধন।

আমরা যে 'আমি আমি' করি তাহার দুইটি বিভাব! একটি 'দেহ আমি' ও অন্যটি "আত্মা আমি।" 'দেহ আমি' হইল কেবল দেহে দৃষ্টি, আর 'আত্মা আমি' হইল আত্মায় দৃষ্টি। 'আত্মা আমি'টা আছে বলিয়াই দেহ আমিটা আছে। এই আত্মাই পরমাত্মা এবং চৈতন্য ঈশ্বর চৈতন্য স্বরূপ। এই পরমাত্মা প্রাণচৈতন্যই ঈশ্বর। যিনি গুরুপদেশমত মূলাধার হইতে আজ্ঞা পর্যন্ত প্রতি চক্রে চক্রে মন্ত্রজপ সহ প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাস টানা ফেলা করিতে করিতে আজ্ঞা ভেদ করিয়া সহস্রারে পৌঁছাইতে পারেন তিনিই সেই তত্ত্বাতীত নিরঞ্জনকে জানিতে পারেন। তাঁহাকে জানিয়া তিনি আপনাতে আপনি স্থিত হন। তাই গুরুদেব বলিয়াছেন, "শাশ্বত গতি হারিয়ে শুধু বচসা নিয়ে চলে বৃথা বাগাড়ম্বর হয় মাত্র। ইহাতে কিছু হবে না। শাস্ত্র পাঠ, আলোচনা, আলোচনা হয়ে থাকবে।

"শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ।
যস্তুক্রিয়াবান্-পুরুষঃ স এব বিদ্বান্।।
সুচিন্তিতঞ্চৈ ষধমাতুরাণাম্।
নামমাত্রেন করোত্যরোগম্।।"

অর্থাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও লোক মূর্খ থাকে। কিন্তু যিনি ক্রিয়াবান তিনিই বিদ্বান। ঔষধ সুনির্দিষ্ট হইলেও সে ঔষধের নাম করিতে থাকিলে রোগ নাশ হয় না। ঔষধ সেবন করিতে হয়।

তাই শাশ্বত গতিতে যাইতে হইলে আমাদের যোগক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে, নচেৎ জ্ঞান হইবে না। 'যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরি?'— হে পরমেশ্বরি, যোগবিহীন জ্ঞান কিরূপে মোক্ষদায়ক হইতে পারে? তাই গোরক্ষনাথ বলিলেন—

"যাবন্নৈব প্রবিশতি চরন্ মুরতো মধ্যমার্গে,
যাবদ্বিন্দুর্নভবতি দৃঢ় প্রাণবাত প্রবন্ধাৎ।।
যাবদ্ ধ্যানং সহজং সদ্‌শ্যং জায়তে নৈব তত্ত্বং।
তাবজ্জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভ মিথ্যা প্রলাপঃ।।"

—অর্থাৎ যে পর্যন্ত প্রাণবায়ু সুষুম্নামধ্যে প্রবেশ না করে, এবং যে পর্যন্ত প্রাণবায়ুর পূর্ণ স্থিরতাহেতু অন্তর্বিন্দু স্থির না হইয়া যায় এবং যে পর্যন্ত চিত্তে ধ্যানভাব স্বাভাবিক হইয়া না যায়, তাহার পূর্বে যে জ্ঞানের কথা বলা, তাহা দম্ভ ও মিথ্যা প্রলাপ মাত্র।

সুতরাং সাধককে শুধু জ্ঞানসূচক কথায় নিযুক্ত থাকিলেই চলিবে না। অমৃতচেতনায় ভাস্বর হইতে গেলে একদিকে যেমন তত্ত্ববিচার করিতে হইবে

প্রশ্ন ঃ শাশ্বত গতি বলিতে কি অন্তর্জগতের গতির কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অন্তর্জগতের গতির কথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ সেটা কি রকম?

উত্তর ঃ (সেটা) শ্বাস যেমন চলছে তাকে অবলম্বন করে তেমনি আমাকেই চলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ দেহকে অবলম্বন করে তিনি আছেন। আবার নূতন কি অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর ঃ অবলম্বন তো হয়েই আছে। নেচারে হয়ে আছে। তাতে আবার আমাকে মনোযোগ দিয়ে গতিসৃষ্টি করে চলতে হবে। আমাকে গতি সৃষ্টি করতে হবে। তা না হলে হবে না। গতি সৃষ্টি হচ্ছে। আপনি চলছে। আপনি চললে হবে না, আমাকে চলতে হবে।

প্রশ্ন ঃ সেটা কি গুরুমুখী বিদ্যা? শ্বাসকে কি অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। শ্বাস আছে, কিন্তু সে গতিটা আমার নয়। সেটা নেচারের গতি। নেচারের গতিতে তাল মিলিয়ে চললে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। সেজন্য অন্তর্মুখী গতি করতে হবে। নিজেকে গতি সৃষ্টি করতে হবে। সেই গতিটার নামই শাশ্বত গতি। শ্বাসটা হচ্ছে। সেটা তুলতে হবে, ফেলতে হবে। তা না হলে হাঁটা যায় না। তেমনি ভাবে শ্বাস চলছে আমার ঠিক কথা। কিন্তু কি কায়দায় শ্বাসকে চালাতে হবে, সেটিই আমাকে শিখতে হবে। তখন বায়ু স্থির, দৃষ্টি স্থির, মন স্থির সব হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ প্রাণায়াম কি অনবরত হচ্ছে?

উত্তর ঃ প্রাণায়ামতো হয় নি। নূতন করে না করলে হয় না। এর মধ্যে কি আছে, শ্বাস চলছে—চলছে। প্রস্তুতি নিতে হবে তো। সব কাজেই প্রস্তুতি নিতে হয়। প্রস্তুতিটি আমাদের কর্মের প্রেরণা যোগায়। গতির প্রেরণা যোগয় প্রস্তুতি। যখন ঠাকুর পূজা কর তখন পঞ্চ গুঁড়ি দিয়ে বেষ্টনী করে ধূপধূনা নানারকম দিয়ে তার প্রস্তুতিটি আগে সৃষ্টি করতে হয়। প্রস্তুতি সৃষ্টি না করলে তার কাছে যাওয়া যায় না। কীটানু দংশন করে তাকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। একবার সন্ধ্যার সময় বসব; আর কিছু আমার দরকার নেই। এরকম হলে হবে না। সব সময়

অন্যদিকে তেমনি কর্মযোগ অবলম্বন করিতে হইবে অর্থাৎ যোগক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। এই যোগক্রিয়াই সাধকের সাধন বা অন্তর্যজ্ঞস্বরূপ। সুতরাং তত্ত্বলাভের জন্য যেমন চাই নিরন্তর যোগক্রিয়া রূপ তপস্যা তেমনি চাই অহর্নিশ তত্ত্ববিচার। এই দুইয়ের সমন্বয়ে সাধকজীবন কৃতকৃতার্থ হইয়া উঠে।

প্রস্তুতি নাও। সেটা (শ্বাস) অবলম্বন করে জোর কদমে এগিয়ে যেতে হবে।* তাকে জানতে হলে শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন করে চলতে হবে। যেমন শ্বাসকে নিতে হলে শরীরটা যে উপর দিকে উঠে নীচু হয় না। ছাড়তে হলে শরীরটা যে নেমে যায়। সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা শ্বাস নিতে হলে নীচে নেমে যায়। স্বাভাবিক নেমে যায়। কিন্তু এটা শ্বাস নেওয়ার সময়ে উপর দিকে উঠে যায়। এবং ছাড়ার সময় নীচের দিকে নামছে। তুমি নিজে কর্ম করে অনুভব কর। অনুভব করে কথা বল। তুমি কি নিজেকে বিচার করে অনুভব কর? অনুভূতির রাজ্যে যেটা ঠিক হবে সেটাই উত্তর।

---

*ভাবার্থ—কাল নিরবধি। এই অনন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে মনুষ্য জীবনের পরিমান অত্যন্ত অল্প। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাল্য, বার্দ্ধক্য ইত্যাদিতে জীবনের অনেকটা সময় ব্যয়িত হইয়া যায়। তদুপরি আছে শারীরিক ব্যাধি, নিদ্রা, আলস্য ইত্যাদি। কাহার কখন কোনদিক হইতে কি বিপদ উপস্থিত হইবে কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় এই স্বল্প সময়ের মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তুলাভ তথা ভগবৎ দর্শন নিতান্ত সুদুর্লভ। জন্ম-জন্মান্তরের সুকোঠর সাধনা ও গুরুকৃপাতেই তাহা সম্ভব। তাই এই পরিমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে একটি মুহূর্তও যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য শ্রেয়স্কামী মানুষকে সদা হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মহাজনবাক্য স্মরণীয়—

"অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চকালো বহবশ্চবিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ।।"

অর্থাৎ অনন্তশাস্ত্র, জ্ঞাতব্য বিষয়ও অনেক, কিন্তু আয়ুষ্কাল অতি অল্প এবং বিঘ্নও বহু। তাই হংসের ন্যায় অর্থাৎ হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলটুকু বাদ দিয়া শুধুমাত্র দুধটুকুই গ্রহণ করে তেমনি এই পরিমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে অনন্ত শাস্ত্রভাণ্ডার হইতে সারটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে। সদ্‌গুরুর নিকট হইতে সাধনাদি শিক্ষালাভ করিয়া, সাধনসম্পন্ন হইয়া চরম জ্ঞাতব্যকে জানার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। এই জীবনেই সত্যকে লাভ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। কারণ এ জীবনে যদি তাঁহাকে লাভ করা না যায় তবে আছে মহাবিনাশ। তাই উপনিষদ্ বলিতেছেন "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।" —কেনোপনিষৎ, ২।৫। মনুষ্য জন্মে তাঁহাকে না জানিতে পারিলে যে মহাবিনাশের মধ্যে পড়িতে হইবে। তাই সময়, অসময় নাই, কালাকাল নাই। যখন সময় পাওয়া যাইবে তখনই সাধনে বসিতে হইবে। প্রতিটি মুহূর্তকেই ভগবৎ সাধনের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। শ্বাসকে ধরিয়া, শ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইবার চেষ্টা

করিতে হইবে। শুধু সকাল, সন্ধ্যায় প্রত্যাশায় থাকিলে চলিবে না। প্রস্তুতি লইতে হইবে সর্বদা। সব সময়েই হুঁশিয়ার, সদা জাগ্রত থাকিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মহাজন পদাবলী স্মরণীয়—

সাধু গেল গেল কাল।
এই প্রাণরূপী হংস তাহারে সামাল।।
না করে সাধন, গেলরে জীবন।
তবু গুরুবাক্যে তোর হ'ল না খেয়াল।।
মাতৃগর্ভে যখন তাঁহারে হেরিতে
ঊর্দ্ধ জিহ্বা করি আনন্দে ভাসিতে।
করজোড় করি কত কি বলিতে
তব সাধনায় কাটাব কাল—
সে সকল কথা কেন গেলি ভুলে
দারাপুত্র লয়ে আছ কুতূহলে,
বল তুমি খোকা কতবার হ'লে।
তোর খোকা হওয়া সাধ কি রবে চিরকাল।।

সাধু শব্দটি স্ আ ধ্ উ এই চারিটি বর্ণের সংযোগে উৎপন্ন। 'স' অর্থে সূক্ষ্মশ্বাস, 'আ' অর্থে আসক্তি, 'ধ' অর্থে ধর্ম (ভগবান) এবং 'উ' অর্থে স্থিতি। এইজন্য সূক্ষ্মশ্বাসে আসক্তি দিয়া ধর্মে অর্থাৎ ধর্মক্ষেত্র সহস্রারে যিনি স্থিত হইয়াছেন, তিনি সাধু পদবাচ্য। যাঁহার সংসর্গে আসিলে মানুষের সূক্ষ্ম শ্বাসের প্রতি আসক্তি বা লক্ষ্য উৎপন্ন হয় এবং ধর্মে স্থিতি লাভের চেষ্টা সমুৎপাদিত হয় তিনিই সাধু। তাঁহাকে আত্মারাম বা গুরু বলে। আবার সাধুর সংসর্গে আসিলে যাঁহাদের সূক্ষ্মশ্বাসে আসক্তি বা লক্ষ্য উৎপন্ন হয়, তাঁহারাও সাধু পদবাচ্য। কিন্তু তাহাতে স্থিতিলাভ না করায় তাঁহারা নিম্নস্তরে অবস্থান করেন। এজন্য তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সাধু না বলিয়া 'সৎ' বলা হয়। বস্তুতঃ সাধু এবং সৎ একই অর্থ প্রকাশ করে। এজন্য সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ একই জিনিষ।

জীব যতদিন মাতৃগর্ভে থাকে ততদিন তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বতন্ত্রক্রিয়া থাকে না। মাতৃ শরীরের ক্রিয়া দ্বারাই নাড়ীসহযোগে তাহার শরীরে প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই সময়ে শরীরের প্রাণপ্রবাহ অতি সূক্ষ্মরূপে তাহার ব্রহ্মনাড়ীতে বহিতে থাকে। তাহা হইতে সপ্তধাতু পুষ্টিলাভ করে! শিশু মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহার নাড়ী কাটিয়া দেওয়া হয় ও জিহ্বা যাহা যোগাবস্থায় কণ্ঠ গহ্বরে প্রবিষ্ট থাকে তাহা নাড়াইয়া দেওয়া হয়। নাড়াইয়া দিবামাত্র শিশু ক্রন্দন করিয়া ওঠে এবং তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি শুরু হয়। যখনই নাসাপথে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকে তখনই অন্তরের প্রাণপ্রবাহ ঐ নাসাপথে প্রবাহের সহিত মিলিয়া ক্রমে বহির্মুখ হইয়া যায়। জীবের তখনই স্বপ্নবৎ পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত

হয়। বাহিরে বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া সে মোহিত হইয়া যায়। ক্রমে শৈশব, যৌবন ইত্যাদির মধ্যদিয়া পরিণতি লাভ করিতে থাকে। দারা, পুত্র লইয়া, হাসি-কান্না, সুখ দুঃখাদির মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করে।

তাই সাধুগুরুগণ বলিতেছেন, যে শ্বাসের পুঁজি লইয়া তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ, যাহাকে লইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছ, সেই শ্বাসের সঙ্গ তুমি একবারও করিলেনা। মাতৃগর্ভে উর্দ্ধজিহ্বা করিয়া (যোগস্থ হইয়া) তুমি বলিয়াছিলে—আগামী জন্মে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রভু তোমার সাধনা করিয়া তোমাকে জানিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইব। কিন্তু সে কথা এখন মনে নাই। "বল তুমি খোকা কতবার হ'লে"—অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশু হইয়া তুমি কতবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার ইয়ত্তা নাই। জন্মগ্রহণ করিবার সময় কাঁদিয়াছিলে, আবার মরণের সময় কাঁদিয়া চলিয়া যাইতেছ। এইভাবে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এই আসা যাওয়ার খেলা চলিতেছে। কিন্তু পূর্বস্মৃতি বিলুপ্তিহেতু তাহা মনে পড়িতেছে না এবং অনন্ত কালপ্রবাহে মানবজীবন ভাসিয়া চলিতেছে। আসা-যাওয়াই সার হইতেছে। কিন্তু কদাচিৎ কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহার সুকর্মের ফলে কোন মহাত্মা বা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সন্ধান পাইলে তাহার কৃপায় এই অনন্ত মোহজাল হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় জানিতে পারেন। সাধনা করিয়া জীবনে সোনা ফলাইয়া মানবজীবন ধন্য করিতে পারেন।

"কভু এটা কভু সেটা, ন্যাংটা খোকা খেলচে ভবে
মলমূত্র গায় মেখেছে, ক্রিয়া পেলেই ব্রহ্ম হবে।"

অর্থাৎ যে মানুষ কালের হস্তে ক্রীড়নকের ন্যায় রহিয়াছে সেই আবার উপযুক্ত ক্রিয়া কৌশল দ্বারাই আপনস্বরূপ অবগত হইতে পারে। মলমূত্রমাখা খোকাই বড় হইয়া যখন যোগের ক্রিয়া করিবে তখন 'সোহহম্' অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।

ভবসমুদ্র হইতে নিষ্কৃতি পাইতে এবং অনন্ত কর্মজাল ছিন্ন করিয়া তাহা হইতে বাহির হইয়া আপনস্বরূপ অবগত হওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিলেন—

"তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ঃ।।— (গীতা ৮। ৭)

ভগবান বলিলেন—সর্বকালে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আমার স্মরণ লও এবং যুদ্ধ কর। ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার দ্বারা অন্তর্মুখী কর। আমাতেই মনবুদ্ধি অর্পণ কর। সর্বদা, সর্বকালের জন্য আমাকে চিন্তা কর। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সতত স্মরণ হইতে পারে না। অতএব চিত্তশুদ্ধির জন্য যুদ্ধাদি স্বধর্মের অনুষ্ঠান কর। এইরূপে সংকল্পাত্মক মন এবং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইলে আমাকেই পাইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ভগবান বলিতেছেন, আমাকে অর্থাৎ প্রাণকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর অর্থাৎ স্বধর্মানুষ্ঠান কর। স্বধর্ম হইল আত্মধর্ম। প্রাণের যাহা ধর্ম তাহাই স্বধর্ম বা আত্মধর্ম। তাহার অনুষ্ঠান কর। বস্তুতঃ এই যুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়া নহে। উহা সাধন সমর বা সহজ ক্রিয়ারূপ প্রাণাপানের সংঘর্ষ। ইহা হইল প্রাণক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান চঞ্চল প্রাণকে জয় করিয়া স্থিরেতে লয় করা এবং ইন্দ্রিয় ও মনের আসুরিকভাবসমূহকে জয় করা। প্রাণের গতিবিচ্ছেদ অবস্থাই কাল। সেই স্থিররূপ কালেতে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণায়ামরূপ সাধন সমরে নিযুক্ত হইতে ভগবান বলিয়াছেন। অতঃপর আমাতে অর্থাৎ স্থির প্রাণেতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিতে বলিতেছেন। ঐরূপ করিলে ভগবান বলিতেছেন যে, তুমি নিঃসন্দেহে আমাকে পাইবে এবং তোমার জীবভাব লয় হইয়া আমার শিবভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তোমার তুমি আমি অর্থাৎ স্থিরপ্রাণ, ভগবান হইয়া যাইবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে যাবজ্জীবন ভগবৎচিন্তা না করিয়াও মরণকালে একবার তাঁহাকে ভাবিতে পারিলেই তো সব হাঙ্গামা মিটিয়া যায়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। সারাজীবন ফাঁকি দিয়া মরণ আসন্নকালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া পার হইয়া যাইবে ইহা ভাবিও না। যদি বা কদাচিৎ কোন বিশেষ ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবনে ইহা ঘটিলেও, দুই একটি ঘটনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করা নিতান্ত মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাধককে মনে রাখিতে হইবে যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণ করা যায় না। পূর্ব-পূর্ব সংস্কারের বেগাধিক্যবশতঃ মন বহু বাসনায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। ইচ্ছা থাকিলেও সর্বদা স্মরণ করিতে পারা যায় না। তাই তীব্রসংবেগ লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তীব্রসংবেগসম্পন্ন হইয়া, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যসমীপে গিয়া দিব্যজ্ঞানলাভে ধন্য হইতে হইবে। জীবনের লক্ষ্য নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যান্ত উজ্জ্বল রাখিতে হইবে। তাই গুরুদেব বলিয়াছেন— "একবার সন্ধ্যায় বসব, আর কিছুই আমার দরকার নাই, এরকম হলে হবে না। সব সময় প্রস্তুতি নাও.....জোর কদমে এগিয়ে যেতে হবে।"

যে সর্বদা মন দিয়া ক্রিয় করে, তাহার মন আত্মস্থ হইয়া যায়। মন আত্মস্থ হইয়া বিলীন হইলেই তখন আর কোন সংস্কার থাকে না। এক অখণ্ড আত্মসত্তায় সমস্ত ভরিয়া যায়। উহাই পরমাত্মার স্বরূপ। এইজন্য প্রত্যেকটি শ্বাস যাহাতে বিফলে না যায় তদ্বিষয়ে সাধকের অবহিত হওয়া কর্তব্য। তাই কবির বলিয়াছেন—

"হরি সে লাগ রহ ভাই
তু বনত বনত বনি যাই।।"

—ভাই তুমি নিরন্তর হরির চরণে পড়িয়া থাকে। তাহা হইলে দিন দিন ক্রমশঃ উন্নত হইবে এবং পরিণামে একদিন সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।

আমাদের বিচারের দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে সেটিই ধরতে হবে। সেটা অবলম্বন করতে হবে। বাণীটা গুরুর আসনে দাও। বিরাট আসনে দিয়ে বিচার কর তা না শুধু কে মস্ত বড় সাধু। কে মস্ত বড় বিরাট এ নিয়ে তুমি নিজেকে নিজে হারিয়ে চলবে এটা সমীচীন নয়।

বিশ্ব নিষ্প্রয়োজনে নৃত্য করছে। লোকের কোটী কোটী টাকা আছে। ব্যাংকে জমাচ্ছে কোটী কোটী টাকা। অভাব নাই। টাকা দিয়ে খেলা করছে। তোমার পিপাসা পেয়েছে। সেখানে সোনাদানা যশমান দিয়ে কি তোমার পিপাসা নিবৃত্ত হবে? নিশ্চয় নয়। জলই প্রয়োজন। একটা নেশা। ওটা প্রয়োজন নয় নেশা। আমাকে সকলে পূজা করুক। যশৈষণা যশখ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান। ৩টী এষণা। বিত্তৈষণা, লোকৈষণা, যশৈষণা। এইভাবে উন্মাদ হয়ে গেছে অথচ এতে কিছু নাই। যদি আমি উন্মাদ হয়ে ছুটে বেড়াই কিছু পাব না। ঊর্দ্ধদিকে গতি হলে কাম তখন প্রেমরূপে সেবা করে। প্রণবধ্বনি শুনতে পাবে, ঊর্দ্ধগতিতে প্রণবধ্বনি শুনতে পাবে। এই ধ্বনিই তাকে ঊর্ধবদিকে নিয়ে যাবে।*

**রহস্যার্থ—বিধাতা ইন্দ্রিয়সকল বহির্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই ইন্দ্রিয়সকল বহির্মুখী। জলের গতি যেমন নিম্নমুখী তেমনি ইন্দ্রিয়ের গতিও হইল বিষয়ের দিকে। বিষয়মুখী অথবা বহির্মুখী গতি হওয়ার জন্য ইন্দ্রিয়সকল বহির্বিষয়েই আকৃষ্ট হয়। অন্তর্মুখী হইয়া অন্তরাত্মার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে না। উপনিষদের ঋষি বলিলেন—*

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু—
তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।।

—কঠোপনিষদ্ ২।১।১

অর্থাৎ 'স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কারণে জীব বাহ্যবস্তুসমূহই দর্শন করে, অন্তঃস্থিত অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায়না। কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতত্বলাভের আকাঙ্ক্ষী হইলে বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।' ইন্দ্রিয়গণই মানুষের জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। বাহির হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদি সংগ্রহ করাই ইহাদের কাজ। ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের দিকে খোলা থাকে। তাই মানুষ বাহিরের জ্ঞানই লাভ করে। ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি ভিতরের দিকে অবরুদ্ধ বলিয়াই আমরা আমাদের অন্তরস্থিত অন্তরাত্মার সন্ধান পাইনা। এই অন্তরাত্মার সন্ধান না পাইয়া বহির্বিষয়েই মত্ত থাকি। চিত্তের গতি হয় নিম্নমুখী। এই কারণেই লিঙ্গ, গুহ্য এবং

নাভি এই তিনচক্রেই ভোগপ্রবণ মানুষের মনের স্বাভাবিক গতি। বিবেকবান জ্ঞানীর মন কিন্তু বিপরীতমুখী। তিনি ইন্দ্রিয়গণের বহির্মুখী গতি ফিরাইয়া উহাদিগকে অন্তর্মুখী করিয়া অন্তরাত্মার দর্শন লাভ করেন। প্রত্যেক শ্রেয়স্কামী মানুষের এই জ্ঞানীর পথই অবলম্বনীয়। বিধাতা ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিলেও তীব্র প্রযত্ন দ্বারা সেই দ্বারগুলির মোড় ঘুরাইয়া দিতে হয়। যথার্থ শ্রেয়লাভের জন্য এই বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। মন বা চিত্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া বিষয়ের আকারই ধারণ করে অর্থাৎ বিষয়ের আকারেই আকারিত হয়। মন বা চিত্তের এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে ফিরাইবার জন্য সাধনার প্রয়োজন হয়। মুমুক্ষু সাধক সাধনবলে অর্থাৎ প্রত্যাহার বা নিরোধের দ্বারা মনকে বহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়া লইতে পারেন। প্রত্যাহারের সাধনার জন্য প্রয়োজন ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং সংযম। প্রত্যাহারের সাধনার অর্থ হইল সংযমের সাধনা। সংযমের সাধনা ভিন্ন প্রত্যাহারের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। মনকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বহির্মুখী মনের পরিণাম স্রোত নিরুদ্ধ হইলে তখন অন্তর্মুখী পরিণাম আরম্ভ হয়। পতঞ্জলি ইহাকেই 'সমাধি পরিণাম' আখ্যা দিয়াছেন। আমাদের চেতনা নিম্নগামী, তাই আমরা ঊর্ধগামী আনন্দের আস্বাদন পাইনা। নিম্নাভিমুখী বৃত্তির নিরোধ হইলে ঊর্ধাভিমুখী সাত্ত্বিক বৃত্তির বিকাশ হয়। ঊর্ধমুখী চেতনার দীপ্তিতে তখন দেহ-প্রাণ-মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। চেতনাকে ঊর্ধগামী করার জন্য বা চিত্তের সমাধি পরিণাম প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ের সঙ্গ ত্যাগে অভ্যস্ত করিতে হইবে। কারণ বিষয়ের সঙ্গ, বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে বিষয়াসক্তি জন্মে। এই আসক্তি হইতে কাম উৎপন্ন হয়। কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলিলেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্‌পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।।"

(গীতা ২।৬২)

বিষয় ধ্যান করিলে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ জন্মে। ইন্দ্রিয়ের আহার হইল বিষয়, বিষয়ে রমণ করাই ইন্দ্রিয়ের স্বভাব। ইহার দ্বারাই মৃত্যু হয়। বিষয় পাইলেই ইন্দ্রিয় তখন তাহা ভোগ করিতে ছুটিয়া যায়। সেই সময় ইহাকে বাধা দিবার যদি কেউ না থাকে তবে ইহারা মনকে বশ করিয়া লয়। ইন্দ্রিয় ও মন একত্র হইলে বুদ্ধিও ঐ অনর্থে যোগ দেয়। তখন জীবের সর্বনাশ হয়। শ্রীভগবানের ধ্যান করিলে মৃত্যু জয় করা যায় আর বিষয়ের ধ্যান করিলে পুনঃপুনঃ জন্ম মরণরূপ সংসার সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়। আত্মার ধ্যান না করিলে বিষয়ে মন যাইবেই এবং তাহা হইতে বিষয় ধ্যানই হইবে। উদ্যানে ভাল বৃক্ষ রোপন না করিলে যেমন তাহাতে আগাছা জন্মায় সেইরূপ মন উদ্যানে ভগবৎ বৃক্ষ না জন্মাইতে পারিলে

বিষবৃক্ষ জন্মিবেই।

তাই নিরন্তর তাঁহাকে (ভগবানকে) স্মরণ করা কর্তব্য। ভগবৎ কথা আলোচনা ব্যতীত মনকে খালি রাখিলে সে অভ্যস্ত ও আস্বাদিত বস্তু স্মরণ করিবেই। স্মরণ করিলেই তাহার প্রতি লোভ জন্মিবে। তখন সে মনকে আর আটকানো যাইবে না। আটকাইতে গেলে ক্রোধ উৎপন্ন হইবে। সে স্বরূপ বিস্মৃত হইবে অর্থাৎ সে যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ সে সব তত্ত্ব আর মনে জাগিবে না। কেবল ঐ ভোগ্য বস্তু কিভাবে পাওয়া যাইবে মন নিরন্তর সেই ভাবনাই করিবে। এমনকি ঐ অনর্থ উৎপাদনে যাহারা বাধাপ্রদান করিতে আসে তাহাদিগকেও শত্রু বলিয়া মনে হইবে।

জল দুগ্ধের সহিত মিশিয়া যেমন একাকার হইয়া যায়, তেমনই আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত মিশিয়া যেন একাকার হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রাণায়াম মন্থন কার্য দ্বারা সেই দুগ্ধ জলে এক করা বস্তুটিকে দেহেন্দ্রিয়রূপ জল ভাগ হইতে পৃথক করিয়া ফেলেন। একবার পৃথক করিতে পারিলে অর্থাৎ মাখন হইয়া গেলে আর সে জলে মিশিবে না। জলের উপর ভাসিতে থাকিবে। অন্তরে পূর্ণমনা সেই যোগী আবার কোন্ বিষয়ে স্থিতি ইচ্ছা করিবেন? "অন্তঃপূর্ণামনা মৌনী কামপি স্থিতিমিচ্ছতি।" তিনি মদবিহ্বল ব্যক্তির ন্যায় সদানন্দ হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্বক এক অভূতপূর্ব স্থিতি লাভ করেন। তখন দৃশ্যতত্ত্ব ও দ্রষ্টৃতত্ত্ব এক অখণ্ড একতারূপ পরমানন্দে পরিণত হয়। তখন আর কোনপ্রকার ভেদবুদ্ধি থাকে না। "লোকৈষণা বিরক্তেন ত্যক্ত দারৈষণেন চ। ধনৈষনা বিমুক্তেন তস্মিন্ বিশ্রম্যতে পদে।" লোকৈষনা, দারৈষণা এবং ধনৈষণা এই ত্রিবিধ ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তিনি পরম পদে বিশ্রাম লাভ করেন। আর তাহা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ক্রোধের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া কঠিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিলেন—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।"—গীতা (৩।৩৭)

রজোগুণ হইতে জাত, দুষ্পূরণীয় পরমশত্রু কামই কামরূপ, ক্রোধরূপ, লোভরূপ প্রভৃতি ছয়রকম রূপের কোন এক রূপ ধারণ করিয়া জোর করিয়াই পাপাচরণ করায়। ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি হইতেছে কামের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এইগুলি দ্বারা কাম বিবেকজ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়া দেহীকে মোহিত করে। কাম কি? আমার ইহা হউক, তাহা হউক— এই তীব্র অভিলাষ হেতুভূত যে চিত্তবৃত্তি তাহাই কাম। সংকল্প হইতেই কামনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য সর্ব সংকল্প ত্যাগ করিলেই কামনার শান্তি হইতে পারে।

"কাম জানাসি তে মূলং সংকল্পাৎ কিল জায়সে।
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি।।"

—মহাভারত, শান্তিপর্ব।

অর্থাৎ হে কাম, আমি তোমার উৎপত্তির কারণ অবগত আছি। তুমি সংকল্প হইতে উৎপন্ন হইয়া থাক। সুতরাং আর তোমার সংকল্প করিব না, তাহা হইলেই আর তুমি উৎপন্ন হইতে পারিবে না। এই কাম মনেরই ধর্ম। "কামনাং মনো ধর্মত্বাৎ পরিত্যাগো যুক্তঃ।" স্মরণ কর—"সংকল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ।" কাম সংকল্পমূলক। কাম না থাকিলে কোন ক্রিয়া থাকে না। যে যাহা করিতেছে সমস্তই কামের চেষ্টা মাত্র। প্রথমে সংকল্প পরে কাম। ইষ্ট সাধন হউক এই অজ্ঞানরূপ সংকল্প হইতে কাম বা ইচ্ছা হয়। তার পর ক্রিয়া। সুতরাং বলা যায় অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি সাধনে যে চিত্তবৃত্তি তাহাই কাম। "কামো হ্যুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্তয়ন পুরুষং প্রবর্তয়তি।" কাম জন্মিলে রজঃ উদয় হইয়া পুরুষকে কর্ম করায়। পুরুষের যে বিষয় লাভের আকাঙ্খা তাহাই কাম। পুরুষ প্রথমে কামময় হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যেহেতু কাম কর্মের কারণ এইজন্য কামেরই প্রাধান্য। এবং উহা সংকল্প হইতে জাত। বিধাতাপুরুষের আদি সংকল্প হইল "অহং বহুস্যাম্"। যখনই দৃশ্যবস্তুকে সুন্দর বলিয়া বোধ হয় তখনই ভোগেচ্ছা জন্মে। তখনই আত্মা বহু হইয়া আপনাকে আপনি যেন ভোগ করেন। এইজন্য বলা হয় পুরুষ কামনাময়। কামই স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে। কামে দৃষ্টি পড়িলে স্বরূপ দৃষ্টি ভুল হয়। আত্মদৃষ্টি তখন বাহিরে ছুটিয়া আসে। বহির্দৃষ্টি হইয়া বিষয়ে আসিয়া পড়ে। যতক্ষণ আত্মদৃষ্টি ততক্ষণ শান্তি চলন রহিত অবস্থা। কিন্তু যখনই সংকল্প জাগে তখনই রজোগুণ কর্মে প্রবর্তিত করায়। ক্রিয়া শক্তি চলিলেই বহির্দৃষ্টি বিলক্ষণ প্রসারিত হইল। এইজন্য বলা হয়— রজোগুণ হইতে কাম, কাম হইতে পাপ। এবং বিষয়সকল কামরূপে অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়, অন্তঃকরণও কামনাসমূহকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা স্থূল বিষয়ে পরিণত করে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"এবং বুদ্ধেঃপরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।"—(গীতা ৩। ৪০)

বুদ্ধির পরবর্তী (অতীত) আত্মাকে অবগত হইয়া, আত্মা দ্বারা (নিশ্চয়াত্মিকা আত্মবুদ্ধিদ্বারা) আত্মাকে (কামের অধিষ্ঠানক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে) সংযত করিয়া (অচল করিয়া) এই কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ কর বা পরিত্যাগ কর। এইখানে "জহি" ক্রিয়াপদটির ধাতুগত অর্থ হইতেছে—বিনাশ করা বা পরিত্যাগ করা। কিন্তু কাম অমর। কারণ কাম ভগবানেরই পুত্র। কাজেই কামকে বিনাশ করাও যায় না এবং পরিত্যাগ করাও যায় না। প্রশ্ন আসে, তবে ভগবান "জহি" এই ক্রিয়াপদটির ব্যবহার করিলেন কেন? এই পদটি ব্যাসকূটের ন্যায় গুপ্তার্থ সমন্বিত পদ। ইহার গূঢ় অর্থ হইতেছে—কামের অনিষ্টকারী প্রবৃত্তির বিনাশ করার ক্রিয়া করা এবং সেই অনিষ্টকারী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করানোর ক্রিয়া

করা। কামকে বিনাশ করা বা পরিত্যাগ করা নহে।

এই দুই ক্রিয়াপদ—বিনাশ করা বা পরিত্যাগ করা, ভাষায় পৃথক বোধ হইলেও ফলে পৃথক নহে, এক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামের বাসস্থান। সেই স্থান হইতে কাম দেহীর উপর আধিপত্য করেন এবং দেহীকে নিজের অধীন করিয়া রাখেন। অহংকার ক্ষেত্র আত্মার স্থান, সেখানে কাম যাইতে পারে না। যদি দেহী সাধনবলে কামের বাসস্থান ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত (অচল ও অকেজো) করিয়া এবং সে সব ছাড়িয়া ঐ অহংকার ক্ষেত্রে উঠিয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে কাম আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন না এবং দেহীবিহীন তাহার আশ্রয়স্থান ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি অচল হওয়ায়, তিনি সেখানেও আর থাকিতে পারেন না। তখন তাহার মতি ফিরিয়া যায়, তিনি দেহীকে পাইবার জন্য লালায়িত হন। দেহী নিষ্কাম হইয়া আত্মবলে বলীয়ান হইয়া কামের অনিষ্টকারী প্রবৃত্তির বিনাশ করেন এবং কাম তাহার অনিষ্টকারী প্রবৃত্তিহীন হইয়া নিঃশক্তি হওয়ায় দেহীপ্রদত্ত অসঙ্গ শস্ত্রের আঘাতে আহত হন এবং দেহী কামকে জয় করেন।

প্রাণায়াম করিতে করিতে ব্রহ্মনাড়ী ভেদ হইলেই প্রাণ তৎসহ মনের উপরাম লাভ হয়। তজ্জন্য মন দিয়া টানা ফেলা করিতে হয়। সর্বদা শ্বাসে লক্ষ্য রাখিতে হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—"কাম নিগ্রহই ধর্ম ও মোক্ষের বীজ স্বরূপ। নির্মমতা ও যোগভ্যাস ভিন্ন কাম জয় হয় না।"—(অশ্বমেধপর্ব—কামগীতা)। প্রাণের সাধনায় যখন চিজ্জ্যোতি স্ফূরিত হয় এবং মনের ঊর্দ্ধদিকে গতি হয় তখন অনাহত ধ্বনি বাজিয়া উঠে। ক্রিয়ার পরাবস্থার ক্ষণিক স্পর্শ প্রাপ্তি ঘটে। তখন জীব চমৎকৃত হইয়া যায়। বহির্বিষয়ক সমস্ত কিছুর বিস্মৃতি ঘটিলে মায়াকে নিরস্ত করিবার প্রত্যক্ষ উপায় কি তাহা সাধক বুঝিতে পারে। প্রাণক্রিয়াদ্বারা মন স্থির হইয়া যায়। প্রাণ মহাশূন্যে প্রবেশ করে। তখন ওঁকারধ্বনি অবিচ্ছিন্ন ধারায় নিনাদিত হইতে থাকে। বাহিরের সব শব্দ তখন তাহার মধ্যে তলাইয়া যায়। অনাহতে এইরূপ দশপ্রকার শব্দ শুনিতে পাইয়া জীবের ভবরোগ বিদূরিত হয়। মনের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। এই শব্দের দরজায় পৌঁছিতে পারিলেই সাধকের আজ্ঞাচক্রের উপরে সহস্রারে স্থিতি হয়। তখনই জীব আপন স্বরূপ অনুভব করিতে পারে।

এইপ্রকারে আপন স্বরূপ অনুভব করিতে পারিলে, স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে কামের সমস্ত শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কাম তখন পরাজিত হইয়া, হার মানিয়া স্বীয় অনিষ্টকারী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিজের কামরূপ ত্যাগ করতঃ প্রেমরূপ ধারণ করিয়া দেহীর বশীভূত হন এবং তখন বন্ধুভাবে দেহীর সেবায় রত হন। কামকে জয় করিয়া দেহী কামজয়ী হইয়া প্রেমানন্দে আত্মার (ভগবানের) সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

জগৎ তো একটা ভ্রান্তি। এত ভ্রান্তি যে কল্পনা করা যায় না! সেজন্য এই ভ্রান্তিময় জগতে প্রকৃত শান্তি কোথায়? শান্তি নাই। শান্তি নাই। হায়রে হায়! বিশ্ব কোথায় ছুটেছে! বিশ্ব মানে বিশ্বাস থেকে বিশ্ব হয়েছে। কে আমার আপন। কে পর কোনটাই বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস তো করতে হবে! বিশ্বাস করে সকলের সঙ্গে ভাব ভালবাসা, ভক্তি, প্রেম, শান্তি, আনন্দ তৃপ্তি এসব নিয়ে তো খেলা করতে হচ্ছে। এতে যোগান দিচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসকে নিয়ে চলতে হচ্ছে কেউ আপন জন নয় বলে! কিন্তু বিশ্বাসে তাকে পুজো করতে হচ্ছে! ভালবাসতে হচ্ছে। মায়া নয়। মা ধাতু মাপ করা নয়। মাপের বাহিরে যেতে হবে। সেই বেদের দ্বারা, শ্রদ্ধার দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা আনন্দের অনুরণন সৃষ্টি করে বিশ্বে চলতে হবে। প্রত্যেকেরই চলতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত আনন্দ, প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত ভালবাসা এবং প্রকৃত সাধন রহস্য অনুভব করে চলা। এটা হচ্ছে আমাদের করণীয়। সেজন্য বলছি সমুদ্র ক্ষুদ্র হয় না। সমুদ্র সমুদ্রই থাকে, কিন্তু তাকে একুলে ওকুলে আছাড় খাওয়াতে হয়। খেতে হয় আরো যে খাল-খন্দ আছে তাদেরকেও টেনে নিয়ে বিরাটে পৌঁছে দিতে হয়।*

**ভাবার্থ— "আপূর্যমানমচল প্রতিষ্ঠং*
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্র বিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।। (গীতা—২।৭০)

যেমন বহু নদনদী জল পরিপূরিত, অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রে অপর জলরাশি প্রবেশ করে (অন্যান্য নদনদী প্রবেশে বা অপ্রবেশে সমুদ্রের যেমন কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না) সেইরূপ ভোগসকল যাহাতে প্রবেশ করে তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। যিনি ভোগসকলের কামনা করেন তিনি পান না।

অজ্ঞানী ভোগকালে কামকে সুখের বস্তু মনে করে। এইজন্য কাম সেই সময়ে অজ্ঞানীর মিত্র। ভোগের পরিণামে যখন দুঃখ উপস্থিত হয় তখন কামকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী প্রথম হইতেই কামকে জানেন। এই কামই জীবকে ভগবান ভুলাইয়া দিয়া রূপদর্শন, গীতশ্রবণ, সুমিষ্টখাদ্য গ্রহণ করায়। সুখলাভে আসক্তি থাকিলেই তখন আর ভগবানকে মনে পড়ে না। আর ভগবানকে মনে রাখিয়া যে বিষয়ভোগ—তাহাতে আত্মবিস্মৃতি নাই, বেহুঁশ হওয়া নাই, আসক্তি নাই। ভোগ সেখানে মুখ্য নহে। ভগবানই মুখ্য। ভোগ গৌণমাত্র। সেখানে ভোগ অন্তে আবার ভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। আকাঙ্ক্ষা ভগবানের জন্য। কামে ইহা হয় না। যেখানে কাম সেখানে ইন্দ্রিয়সুখের ইচ্ছা। জ্ঞানী এই কামের হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার জন্য বহু তপস্যা করিয়া থাকেন। শরীর

গ্রহণের পূর্ব হইতে, বিষয়ভাবনা কালে এবং ভোগ অবসান হইলে—সকল কালেই কামজ্ঞানীর পরম শত্রু। জ্ঞানী ইহা আরও জানেন যে, বিষয়ভোগদ্বারা কাম নিবৃত্ত হয় না। বিষয় দোষ দর্শনই কাম জয়ের উপায়। অগ্নিকে তৃণ, কাষ্ঠাদি দ্বারা পূর্ণ করিলে মহান অনর্থ প্রসব করে। সেইরূপ কামের নিকট যতই ভোগ প্রদান করা যাইবে, ততই উহা বাড়িয়া যাইবে।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় : এবাভিবর্দ্ধতে।।"

কামকে অনল বলা হয় এই জন্য যে, "নাস্যালং পর্য্যাপ্তি র্বিদাতে ইতানলঃ" —অর্থাৎ ইহার অলং বা পর্য্যাপ্তি নাই। তাই ইহার নাম অনল। কামেরও পর্য্যাপ্তি নাই। কাম জনিতশোক অগ্নির মত।

যিনি প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিতে করিতে প্রাণকে কূটস্থে রাখিতে পারেন এবং শাম্ভবী দ্বারা মনকে বিন্দুসাগরে ডুবাইয়া রাখিতে পারেন, তিনি অনন্ত উদারতা লাভ করেন। কামনা সকল তাঁহাতে আসিয়া পড়িয়া বিলীন হয়। তাঁহা হইতে কোনরূপ কামনা উত্থিত হইয়া বিষয়াভিমুখে প্রবাহিত হয় না। এইরূপ পুরুষই শান্তি পান। আর যিনি কামকামী অর্থাৎ যিনি মনকে অনন্তে না ফেলিতে পারিয়া বিষয়সমূহকে শান্তির আলয় মনে করিয়া প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষায় পড়েন তিনি শান্তি পাননা।

অনন্ত অস্পর্শ ব্রহ্ম সাগরাম্বুরাশি—
অসংখ্য বুদ্বুদমোরা, তাঁর বক্ষে ভাসি।
অলক্ষ্য সে ব্রহ্ম আত্মা চিদ্ নিরঞ্জন
তুমি, আমি দেহবোধ তার আবরণ।
একমাত্র আছে সেই, আর কিছু নাই
"একমেবাদ্বিতীয়ং" গাহে শ্রুতি তাই।
এই সব ক্ষুদ্র প্রাণ মহাপ্রাণে ভাসে,
অসংখ্য তরঙ্গ রাশি সর্বদা অস্থির
অসীম সাগর স্থির প্রশান্তিগভীর।।
যত দেখ চাঞ্চল্য সে তরঙ্গেরই হয়
অব্যাকুল সিন্ধু সদা শান্তি শিবময়।।
তরঙ্গ দৃষ্টিতে বহু, অদ্বিতীয় সিন্ধু,
কিরণ দেখিতে বহু, এক কিন্তু ইন্দু।
তরঙ্গও যেইরূপ এক সিন্ধু বুকে
অসংখ্য হইয়া নাচে পলকে পলকে।
দেখিতে অসংখ্য বটে নহে ভিন্ন তারা
অভিন্ন সাগর বক্ষে সব হয় হারা।। —(আত্মানুসন্ধান)।

প্রশ্ন ঃ মায়াসম্বন্ধে আপনি বলেন মা ধাতু মানে মাপ করা। এই সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ মা ধাতু অর্থাৎ মাপ করা মানে ক্ষুদ্রের আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে বিভ্রান্তির পথ সৃষ্টি করা। একটা কথা এই যে স্ত্রী, পুত্র, জগৎ, মনুষ্যজাতি ইত্যাদি নিয়ে বিশ্ব খেলা করছে। এতো কিছুই নয়। একেবারে কিছুই নয়। জগৎ ভুলেই তো সৃষ্টি হচ্ছে। জগৎটাতো নিজেরা সৃষ্টি করেছি। কে স্ত্রী, কে পুত্র, কে কন্যা, আত্মীয়-স্বজন বুঝলাম না। অথচ সৃষ্টি করে বসে আছি। এই যে সৃষ্টি এটা আমার। আমার সৃষ্টিতে আমি আবদ্ধ হয়ে আছি। এই জগৎটা যা দেখছি শুধু ভ্রান্তি। সিনেমা দেখি সেও ভ্রান্তি। একটা পর্দ্দাতে ছবি তৈরী করে তাতে জ্ঞানশূন্য হচ্ছি। ওসব ভ্রান্তি। বিশ্বাস মানে সেই চিন্ময়কে চিন্ময় জ্ঞানে দেখাই হচ্ছে বিশ্বাস। তাকে যদি চিন্ময়ী জ্ঞানে হারিয়ে যদি চলি, সেটা ভ্রান্তিতে পড়ে যায়। প্রত্যেক মানুষ ভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছে তার কারণ গতি স্থির করতে পারছে না। সে ছুটছে কোথায় যেমন আমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেক ভ্রান্তি নিয়ে চলছে; পুত্র জগৎ সবই সৃষ্টি হচ্ছে ভ্রান্তিতে। ছেলে সৃষ্টি হচ্ছে ভ্রান্তিতে। কেউ কাহাকেও ধরা দিচ্ছে না। ছেলে হল, শৈশব কিশোর হচ্ছে, হতে হতে ক্রমশঃ যৌবন হচ্ছে। যৌবন হতে হতে প্রৌঢ় হচ্ছে। প্রৌঢ় হতে হতে বার্দ্ধক্য হচ্ছে। একই শরীরে সবকিছু হচ্ছে। কিন্তু পরিবর্তনটাই ধরা দিচ্ছে না।।

তাই গুরুদেব বলিয়াছেন সমুদ্র ক্ষুদ্র হয় না, সমুদ্র সমুদ্রই থাকে। কিন্তু তাকে একূলে ও কূলে আছাড় খাওয়াতে হয় অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া তরঙ্গকে বক্ষে লইয়া নৃত্য করে। তরঙ্গ যখন অহংজ্ঞানে মনে করে যে সে নিজ খেলিতেছে, তখন সমুদ্র তরঙ্গকে কূলে আছাড় দেয় এবং আছাড় দিয়া নিজের সহিত তরঙ্গ কে মিশাইয়া লয়। সেইরূপ ঈশ্বর নিজেই অসংখ্য জীবভাবে জগতে খেলা করিতেছেন, কিন্তু জীব মনে করে সে নিজেই খেলিতেছে বা সে নিজেই সমস্ত কর্মের কর্তা। অহংকারে মোহিত হইয়া নিজেকে বুদ্ধিমান ইত্যাদি মনে করে। ইহা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। তাই ইহা বিচার করিতে হয় যে, ইন্ধন যতক্ষণ ততক্ষণই অগ্নির প্রজ্বলন। ইন্ধন সরাইয়া লইলে আর অগ্নির প্রজ্বলন থাকে না। সেইরূপ ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন বলিয়াই আমাদের অস্তিত্ব। তাঁহাকে ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু ভ্রান্ত জীব তাহা ধারণা করিতে পারেনা। তাই আমাদের অহংকার বা ভ্রান্ত জ্ঞানকে দূর করিবার জন্য তিনিই দুঃখ, শোক, জরা ইত্যাদিরূপে জীবের নিকট উপস্থিত হন এবং বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়া তাহাকে শিক্ষা দান করেন। জীবের ভ্রান্তিমোচন করিয়া ক্রমে বিরাটের পথে পৌঁছাইয়াদেন এবং জীব সেই বিরাটে পৌঁছিয়া জীবভাব ত্যাগ করিয়া শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। জীবই শিব হন।

প্রশ্ন ঃ এই যে ধরা দিচ্ছে না এটাকে কি বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ ধরা দিচ্ছে না এটা ভ্রান্তি। আলেয়ার আলোর মত। আলেয়ার আলোতে পথিক ভ্রান্তিতে পড়ে। আলো তো ঠিক নয়। সে আলোর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না, ভ্রান্তির আলো। এই রকমভাবে জগৎটা ভ্রান্তির আলোর মত।।

প্রশ্ন ঃ বিশ্বাস হতে বিশ্ব হয়েছে, সেটা কিরকম বিশ্বাস? বিশ্বাস মানে বিগত শ্বাস?

উত্তর ঃ হ্যাঁ বিগত শ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বরূপ থেকে চ্যুত হয়েছি। সত্যিকার কথা, এটা বাস্তব সত্য। বিশ্বাস থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। শ্বাস ঝড়ের মত বইলেই তাকে বলে বিগত শ্বাস। বিগত শ্বাস থেকে যৌবনের উন্মাদনায় ভ্রান্তিতে সৃষ্টিকার্য হয়। তখন মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক রহিত হয়ে যায়। কিছুই বুঝতে পারে না।

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বরূপ থেকে চ্যুত হয়েই আমরা ভ্রান্তিতে পড়েছি এবং তা থেকেই সৃষ্ট হচ্ছি। বিশ্বাসের দুটি অর্থ। প্রথম হ'ল 'বি' শব্দে বিশ্ব এবং 'গত' শব্দে গতানুগতিকতা। অর্থাৎ বিশ্ব যেভাবে শ্বাস টানা ফেলা করছে বা গতানুগতিকতায় আবদ্ধ হয়েছে তাতে বিশ্ব ভ্রান্তিতেই পড়েছে। এবং এই ভ্রান্তি থেকেই সৃষ্টি। দ্বিতীয়তঃ শ্বাসের এই যে গতানুগতিকতা এর মধ্যে ছেদ আনতে পারলেই অর্থাৎ শ্বাসের গতি বিচ্ছেদ করতে পারলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস আসবে। শ্বাসের গতানুগতিকতাটাকে অন্তর্মুখী করতে পারলেই গুরু বেদান্তবাক্যের প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হবে। এই বিশ্বাস থেকে পুনরায় জ্ঞান উৎপত্তি হয় এবং সংসারে আসা যাওয়ার নিবৃত্তি ঘটে। সুতরাং একদিকে জগৎ সৃষ্টি আর একদিকে তার নিবৃত্তি। নিবৃত্তি ঘটাতে চাইলে শ্বাসের গতিকে বিচ্ছেদ করতে হবে। গতি যেভাবে চলছে সেটাকে ফিরিয়ে অন্তর্মুখী করতে হবে। শ্বাসের এই গতি বিচ্ছেদ হয় প্রাণায়ামের দ্বারা। তাই মহর্ষি পতঞ্জলির মতে 'শ্বাসপ্রশ্বাসগতির্বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

প্রশ্ন ঃ যে শ্বাসের থেকে মহাপ্রাণে যুক্ত ছিলাম, সেই মহাপ্রাণ থেকে বিগত হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে সৃষ্টি হয়েছি। সেইটাকে আপনি ঝড় বলেছেন? যৌবনের ঝড়েতেই সৃষ্টি।

উত্তর ঃ আমি ঝড় বলছি মানে, বিশ্বে ঐ যৌনক্রীড়ায় ঝড় উঠে। ভ্রান্তি হয় এবং ভ্রান্তির বশে প্রত্যেকে নিজেকে হারিয়ে বসেছে। নিজেকে হারিয়ে বিগত শ্বাস হয়েছে। খেলা করছে।

প্রশ্ন ঃ এটাই কি আপনার মতে বিশ্বাস থেকে বিশ্বের সৃষ্টি?

উত্তর ঃ এই ভাবেই জগৎটা সৃষ্টি হচ্ছে। এইভাবে আমরা হাত পা ছুঁড়ে

আছাড় খেয়ে খেয়ে ছুটছি। কোথায় ছুটছি বুঝতে পারিনি। রক্ত মাংসের খেলা শুক্রকীটের খেলা। শুক্রকে শুক্রাচার্য বলে। সেই আচার্যদেবকে পূজা করতে হয়।

সমুদ্রের ঢেউ, সেই বিরাট সমুদ্র তার তরঙ্গ কুলে এসে আছাড় দেয়। সমুদ্রের দিকে আবার ছুটে যায়। এই হচ্ছে তার খেলা। সেই খেলাতেই সমুদ্রের মহিমার চেষ্টা। আমাদের মহাপুরুষরা বিরাটের দিকে যান এবং জগৎটা যে ভ্রান্তি তা অনুভব করবার জন্য সর্বদাই প্রয়াসী থাকেন। এই বিরাট বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং বিরাট বোধে জগৎটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সারা জীবন অনুশীলন করা দরকার।*

প্রশ্ন ঃ সংসার জগতে একটা চল্‌তি কথা আছে যেটা অনেকে বলে যেমন, 'তোর দিব্যি, তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি, সত্যি করে বলছি' ইত্যাদি, এই যে ত্রিসত্য বা দিব্যি করে বলা—এর আধ্যাত্মিক রহস্য কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ কথাটার একটা আধ্যাত্মিক রহস্য আছে। তা অনুশীলন করলে বুঝতে পারবে। "আমি ত্রিসত্য করে বলছি', একথার মানে হল—ত্রিসত্যতে আবদ্ধ হয়ে আমাদের জীবন বা মনুষ্যজীবনের বিকাশ হয়েছে। সেটা কেমন?

**ভাবার্থ—কি অনুশীলন করা দরকার তাহা যিনি বিচার শক্তির বলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি সর্ব দুঃখ হইতে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, (আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার,— শারীরিক জ্বরাদি এবং কাম ক্রোধ লোভাদি। আধিভৌতিক দুঃখ—সর্প, ব্যাঘ্রাদি হইতে জাত। আর আধি দৈবিক দুঃখ, বিদ্যুৎ, বজ্র বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে জাত) এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। যে সাধক বা মুমুক্ষু বিচারে অত পরিপক্ক নহেন (তাঁহার জন্য) আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত কখন ও সাধনা এবং আত্মবিচার ত্যাগ করিতে নাই। ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে বিচারও রাখিতে হইবে তাহা আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—*

যথা প্রকৃষ্টং শৈবালং ক্ষণমাত্রং নতিষ্ঠতি।
আবৃণোতি তথা মায়া প্রাজ্ঞং বাপি পরাঙ্‌মুখম্।

(বিবেক চূড়ামণি ৩২৫)

যেমন শৈবাল (শেওলা) জল হইতে একবার সরাইয়া দিলেও ক্ষণকাল জল হইতে পৃথক থাকে না, অবিলম্বে পুনরায় উহাকে ঢাকিয়া ফেলে, তেমনি আত্ম-বিচার হীন বিদ্বান্‌কেও মায়া আবার ঘেরিয়া বা আবৃত করিয়া ফেলে। এই জন্য বিদ্বান ব্যক্তিরও কখন বিচার ত্যাগ করিতে নাই। সদাই নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকের অনুশীলন করা উচিত।

লক্ষাচ্যুতং সদ্যাদি চিত্ত মীষদ্ বহির্মুখং সন্নিপতেওতস্ততঃ
প্রমাদতঃ প্রচ্যুত কেলিকন্দুকঃ সোপান পঙ্‌ক্তৌপতিতো যথাতথা।।

(বিবেকচূড়ামণি ৩২৬)

যেমন অসাবধানবশতঃ হাত হইতে চ্যুত সিঁড়ির উপরে পতিত খেলিবার বল এক সিঁড়ি হইতে অপর সিঁড়িতে পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ নীচে চলিয়া যায়, তেমনি যদি চিত্ত স্বীয় লক্ষ্য (ব্রহ্ম) হইতে চ্যুত হইয়া একটুও বহির্মুখ হইয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় পর পর উহা নীচেই পতিত হইয়া থাকে।

না তা হল, পিতা-মাতার সংযোগ থেকে আমাদের উৎপত্তি। কাজেই পিতা সত্য বলতেই হবে, মাতা সত্য বলতেই হবে। দুটি সংযোগে আমাদের দেহের সৃষ্টি। তারপর চৈতন্য সত্তা ওখানে যুক্ত হোল। অস্থি, মাংস ইত্যাদিতে চৈতন্য সত্তা যখনই যুক্ত হল তখনই দেহ প্রাণবন্ত হল। এইবার ক্রমশঃ যা কিছুর আবির্ভাব ঘটল তাতো এই ত্রিসত্য থেকেই হোল। পিতা থেকে নখ, চুল ইত্যাদি এবং মা অংশ থেকে মাংস।*

আর চৈতন্য সত্তা থেকে প্রাণ। এই তিনের দ্বারা আমাদের দেহপত্তন হল। আর এই তিনটিকে অবলম্বন করেই আমরা বিশ্বে খেলা করছি।

এখন কথা হচ্ছে 'ত্রিসত্য' কথাটা আমরা ভুলেই গেছি। চৈতন্য সংযুক্ত হওয়াতে যখন আমাদের আবির্ভাব বা বিকাশ ঘটেছে তখন চৈতন্যকে নিয়ে সব সময় আমাকে চলতে হবে। আমরা প্রভুর কাছ থেকে ঐশী শক্তি ও শরীর ধারণ করে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছি। কিন্তু আমরা এখানে এসে সেই শক্তিটুকু হারিয়ে ফেলেছি। হারাবার কারণ হচ্ছে, বিশ্বে এসে সেখানকার চাকচিক্যে আমরা

তুলনীয়

পিতৃভ্যামশিতাদন্নাৎ ষট্‌কোষং জায়তে বপুঃ।
স্নায়বোঽস্থীনি মজ্জা চ জায়ন্তে পিতৃতস্ত্বথা।।৯।।
ত্বঙ্মাংসশোনিতমিতি মাতৃতশ্চভবন্তিহি।
ভাবাঃ স্যুঃ ষড়, বিধাস্তস্য মাতৃজাঃ পিতৃজাস্তথা।
রসজা আত্মজাঃ সত্ত্বসংভূতাঃ স্বাত্মজাস্তথা।।১০।।
মৃদবঃ শোণিতং মেদো মজ্জা প্লীহা যকৃদ্‌গুদম্।
হৃন্নাভীত্যে বমাদ্যাঃ স্যুর্ভাবা মাতৃভবা মতাঃ।।১১।।
শ্মশ্রুরোমক স্নায়ু শিরাধমনয়ো নখাঃ।
দশনাঃ শুক্রমিত্যাদি স্থিরাঃ পিতৃসুমুদ্ভবাঃ।।১২।। (শিবগীতা)

পিতা-মাতার ভুক্ত অন্ন হইতে এই ষট্‌কোষ বিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই সকল পিতা হইতে উৎপন্ন পিতৃজ, রজস, আত্মজ, সত্ত্বসম্ভূত এবং স্বাত্মজ এই ষড়্‌বিধভাব আছে।৯-১০।।

তন্মধ্যে শোণিত, মেদ, মজ্জা, প্লীহা, যকৃত, গুহাদেশ, শিরা ধমনী, নখ, দন্ত, শুক্র ইহারা পিতৃজ ভাব।

মোহাগ্রস্ত হয়ে গেছি। কোথাকার কে স্ত্রী, কে পুত্র, কে কন্যা এই নিয়ে উন্মাদ, পাগল। কিন্তু আমি সত্তা থেকে আবির্ভূত হয়েছি, যাকে অবলম্বন করে আমি বেঁচে আছি, যার অবলম্বন বিনা আমার এক মুহূর্তও বাঁচার আশা নেই, সেই স্রষ্টাকে হারিয়ে আমরা বিভ্রান্তির পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চৈতন্য সত্তা আমাদের প্রাণ! চৈতন্য সত্তা আছে বলেই আমরা প্রাণবন্ত হচ্ছি, কথা বলতে পারছি। শরীর থেকে যদি মাংস বা অস্থিকে সরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে প্রাণ থাকবে না, শরীর তো থাকবেই না। আর প্রাণ সরে গেলে অস্থি, মাংস ইত্যাদিও বিলুপ্ত হবে। সুতরাং প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন। কারণ এইভাবেই আমরা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের প্রীতিতে আবদ্ধ হয়ে বিকাশপ্রাপ্ত হচ্ছি। সত্যের প্রভাবটা আমরা এইভাবে আলোচনা করি ও গুরুত্ব দিই। সুতরাং দিব্যি দিয়ে বলার অর্থ দিব্যভাবে থেকে কথাটা বলা। কিন্তু বাস্তব সংসারে আমরা তা করি না। করিনা বলেই এর কোন রহস্যও আমরা অনুভব করিতে পারি না। বেহুঁশেই খেলা করে থাকি।

প্রশ্ন ঃ এ জগৎ গতিশীল অর্থাৎ অস্থির। একমাত্র ভগবানই স্থির। তাহলে এই অস্থির জগতে ভগবৎ দর্শনের উপায় কি?

উত্তর ঃ বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের সন্ধান পেতে হলে অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করলে হবে না। ভগবান স্থির! সুতরাং স্থির বস্তুকে লাভ করবার জন্য তোমাকেও স্থির হতে হবে। কারণ সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত না হলে দর্শনাদি হয় না। তাই সাধককে মনস্থির করতে হবে, কারণ স্থির মনই ভগবান। তার জন্য সংযত জীবনযাপন করতে হবে। সংযত জীবন না হলে সে পিতার আহ্বান বাণী শুনতে পাবে না। উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকতে হবে। তাছাড়া আর উপায় নেই। যেমন শ্রীরাধা উৎকর্ণ হয়ে থেকে সুমধুর বংশীধ্বনি শুনতে পেয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করেছিল,* তেমনি তোমারা সবাই সেইভাবে সংযত জীবন লাভ করে উৎকর্ণ হয়ে সেই বিরাট সত্তার আহ্বানের দিকে লক্ষ্য রাখ। বিরাট বিশ্বে আমরা সকলে তাঁর সন্তান। তিনি আমাদের আহ্বান করছেন। আমাদের সেই আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। সেজন্য আমাদের স্থির হতে হবে। এ প্রসঙ্গে সুন্দর একটি গল্প রয়েছে। কোনও এক জায়গায় এক বিরাট মেলা বসেছিল। সেই মেলায় বিমল নামে একটি ছেলে তার পিতাকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে সেই ছেলেটি মেলায় হারিয়ে যায় ও অস্থির হয়ে পিতাকে খুঁজতে থাকে। এদিকে তার পিতাও ছেলেকে হারিয়ে চীৎকার করে করে ডাকছে। কিন্তু অত্যধিক ভীড়ে কেউ কারোর ডাক শুনতে পাচ্ছে না বা কেউই কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না। ছেলেটি যখন চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে বাবাকে ডাকছে তখন এক ফকির ছেলেটিকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করল। ফকির তখন তাকে বলল যে, এই

বিরাট মেলায় তুমি কোথায় ছুটবে, কাকে পাবে? তুমিই পাবে না, বিভ্রান্ত হবে।

---

*পৌরাণিকী কথা—দ্বাপরযুগের শেষে জীব যখন কর্ম ও জ্ঞানের শুষ্ক সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাহাতে পরিপূর্ণ আনন্দলাভ করিতে না পারিয়া আকুল হইয়া শ্রীভগবানের কৃপাবারি প্রার্থনা করিয়াছিল তখন জীবকুলকে পরমানন্দ দান করিয়া তাহাদের ঊর্দ্ধগতি প্রদানে জন্য শ্রীভগবান রাধাকৃষ্ণরূপে ব্রজধামে অবতীর্ণ হন। জগতের শ্রেষ্ঠ ভাব হইল "প্রেম"। সেই প্রেমানন্দে জগৎকে ভাসাইতে ভগবান স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির সহিত বৃন্দাবনে মধুর রাসলীলা করিয়াছিলেন। অপূর্ণ মানবকে প্রেমরস পান করাইয়া তাহাকে নিবৃত্তির পথে লইয়া যাওয়ার জন্যই এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য ভগবান মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া সেই ক্রীড়া বা লীলা করিয়াছেন। ভগবানের এই ক্রীড়াই হইল ব্রজলীলা।

শ্রীমতীরাধা কুলবধূরূপে আয়ানগৃহে বাস করিতেছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কখনও কৃষ্ণকে দেখেন নাই, কৃষ্ণের কথা কখনও শুনেন নাই। কিন্তু অকস্মাৎ সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। হইল প্রেমের সূত্রপাত। নাম শুনিয়াই তাহাকে পাইবার জন্যা রাধা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। উন্মাদিনী প্রায় তাহার অবস্থা হইল। পরে সখীগণের সহিত যমুনার জল আনিতে, বনে ফুল তুলিতে যাইয়া নানাছলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে পাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। ক্রমে রাধার এই ব্যাকুলতা এত চরমে উঠিল যে তিনি সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, নির্নিমেষ নয়নে তাহার আগমনের প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। কখনও বা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুমধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া আনন্দে উল্লাসে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তমালকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সহিত সামঞ্জস্য আছে বলিয়া শ্রীরাধিকা আকুল হইয়া উঠিলেন। আবার কখনও বা বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া দিনরাত্রি কাটিতে লাগিল। ক্রমে রাধার এই প্রণয় কাহিনী সর্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। স্বামী, শ্বাশুড়ী, ননদী রাধাকে নানা যন্ত্রণা দিতে লাগিল। রাধার কুলকলঙ্কিনী নাম পড়িয়া গেল। চলিল রাধাকৃষ্ণের লৌকিকী লীলা।

আধ্যাত্মিক বা যৌগিক অর্থ—রাধা ও কৃষ্ণ একই আত্মা। জীবকে রসতত্ত্ব আস্বাদন করাইবার জন্য ভগবানের উভয় দেহধারণ। সেই রাধাকৃষ্ণ আত্মারূপে প্রতি জীবহৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তাই জীব আনন্দ বা সুখের অন্বেষণে এই সংসার রঙ্গমঞ্চে ছুটাছুটি করিয়া থাকে। কস্তুরীর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মৃগ যেমন ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া বেড়ায়, তেমনি জীবও আনন্দের সন্ধানে পার্থিব বিষয়ে প্রধাবিত হইতেছে। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে সাধু গুরুর কৃপায় জীব যখন জানিতে পারে যে তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ তাহার আত্মাতেই অবস্থিত, তখন বিষয়-বৈরাগ্য জাগে। সে তখন আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। গুরু কৃপায় ও

সাধন বলে জীব যখন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করে তখন বুঝিতে পারে যে তাহার আত্মাতেই রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের বিকাশ। এই আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই জীব পূর্ণ রস ও আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে সাধনসাপক্ষ।

প্রত্যেক জীবেরই কুলে অর্থাৎ মূলাধারে বলয়ের মত কুণ্ড লী অবস্থায় প্রকৃতি বা জীবশক্তি (কুলকুণ্ড লিনী) নিদ্রিতা আছেন। তাঁহাকে সাধনার দ্বারা জাগাইয়া তাঁহার আশ্রয়গ্রহণই সাধকের প্রথম এবং প্রধান কাজ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই শক্তিকে প্রধানতঃ রাধাশক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "আধারবাসিনীত্বাৎ রাধা"। আধারে অর্থাৎ মূলাধারে বাস করেন বলিয়া রাধা হইয়াছে। রাধা শব্দের অন্য আরও অর্থ আছে। যেমন 'রা' অর্থে নির্বাণ মুক্তি এবং 'ধা' হইল ধারণকর্ত্রী। তাঁহারই আশ্রয়ে নির্বাণমুক্তি বা পরমপদ লাভ হয়। তন্ত্রে সহস্রারপদ্মকে পরমশিবের স্থান বলা হইয়াছে। কুলকুণ্ড লিনী শক্তি এই সহস্রারপদ্মে পরমশিবের সহিত মিলিতা হন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে সহস্রারপদ্মকে সুমেরুশিখর, নিত্যবৃন্দাবন, অক্ষয়সরোবর প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রসস্বরূপা রাধাশক্তি মূলাধার বা রসসরোবর হইতে উত্থিত হইয়া এই নিত্যবৃন্দাবনরূপী সহস্রারপদ্মে শ্রীকৃষ্ণপরমপদে মিলিতা হন এবং সাধকের ভববন্ধন দূর করেন।

যৌগিক অর্থে পঞ্চ মকারের "মৈথুন" রমণীসেবা নহে, বা ব্যভিচারও নহে। উহা ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারে শিবরূপী পরমব্রহ্মের সহিত কুণ্ড লিনীশক্তির মিলন। কুল অর্থাৎ মূলাধারবাসিণী রসময়ী রাধাশক্তি কুলত্যাগ করিয়া অকুলে অর্থাৎ সহস্রারে শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমব্রহ্মের সহিত মিলিতা হন। এইজন্য রাধার এক নাম কুলকলঙ্কিণী ও অন্য নাম কুলটা। রাধার প্রেমকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে কুটিল বলা হইয়াছে। সাধারণ বা লৌকিক অর্থ হইল, রাধা প্রেম-মান, অভিমান প্রভৃতি দ্বারা কুটিল ভাবসম্পন্না। কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক ভাব সম্পূর্ণ অন্য রূপ। কুল অর্থাৎ মূলাধার ত্যাগ করিয়া রাধাশক্তির যখন অকুল অর্থাৎ সহস্রার অভিমুখে গতি হয়, তখন ইনি কুটিলগামিণী হন অর্থাৎ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলেন। তাই পরমাপ্রকৃতিরূপিণী শ্রীরাধিকা ছায়ারূপিণী মায়াস্বরূপা হইয়া চঞ্চলপ্রাণশক্তিরূপে ডান ও বাম হইয়া চঞ্চ লপ্রাণশক্তিরূপে ডান ও বাম নাসিকায় অর্থাৎ পিঙ্গলা ও ঈড়া নাড়ীদ্বয়ে দুই চরণের সাহায্যে অবিরত শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে যাতায়াত করিতেছেন। বাহ্যতঃ যেমন গমনাগমনের জন্য দুইটি চরণের প্রয়োজন তেমনই জীবনে চলার পথে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপী ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের গতিরূপ উভয় চরণের একান্ত প্রয়োজন। এই চরণদ্বয়ের গমনাগমন বন্ধ হইলে জীবনের গতিবিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ দেহপতন হয়। শ্রীরাধিকারূপিণী চঞ্চ লপ্রাণের সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ প্রাণায়ামরূপ আত্মকার্য করিতে করিতে কালে ভগবানরূপী শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়! কৃষ্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দ নশ্চ নিবৃত্তি বাচকঃ।

তয়োরৈকাং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।।"

অর্থাৎ কৃষি শব্দ ভূ অর্থাৎ ক্ষেত্রবাচক শব্দ। কৃষি বলিলে ক্ষেত্রকর্ষণ বুঝায় এবং ন শব্দ নিবৃত্তিবাচক। অর্থাৎ ক্ষেত্রকর্ষণের নিবৃত্তি অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষেত্র অর্থে শরীর। "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।।"—(গীতা১৩।২)। এই শরীররূপ ক্ষেত্রের কর্ষণক্রিয়া দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ আত্মক্রিয়ার অতীতাবস্থাই পরম ব্রহ্ম পরমাত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণ। "ভক্ত দুঃখ কর্ষিত্বাৎ কৃষ্ণঃ"—অর্থাৎ যিনি ভক্তের দুঃখ কর্ষণ (বিনাশ) করেন বা যিনি ভক্তকে আকর্ষণ করেন তিনি কৃষ্ণ।

মানব শরীরে অনাহত ধ্বনি (ঈশ্বরবাচক প্রণব) সর্বদাই ধ্বনিত হইতেছে। যোগক্রিয়ারূপ সাধনার ফলস্বরূপ তাহা সাধকের শ্রুতিগোচর হয়। এই সুমধুর সুর সর্বত্র সকলদেহে সর্বদা বর্তমান। শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে সূক্ষ্ম ভূতসমূহ রহিয়াছে তাহাতে মানবের ক্রমশঃ অধিকার জন্মায়। এই সূক্ষ্মভূতকেই বিদ্যুৎ বা সৌদামিনী বলে। শরীরাভ্যন্তর হইতে অনবরত ইহার যে ধারা বাহির হইয়া বহির্বিষয়ে ব্যয়িত হইতেছে তাহাকে অর্থাৎ ঐ বিদ্যুৎ স্রোতকে ফিরাইয়া আনিবার সময়ে মানবের সুরৎ অর্থাৎ অহংকার বা অহংবোধও ঐ সঙ্গে স্থূল জগৎ হইতে ফিরিয়া আসিতে থাকে। তৎকালে শরীরাভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রস্থলে সৌদামিনীর স্থির জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে সংসারের সমস্ত শোক ও যন্ত্রণা বিদূরিত হইয়া থাকে। এইজন্য তাহাকে যোগশাস্ত্রে 'বিশোকা জ্যোতি' বলে। ইহা অত্যন্ত উজ্জ্বল, কিন্তু অতি সুশীতল। এইজন্য "কোটী সূর্যসমকাশং, কোটী চন্দ্র সুশীতলং" বলিয়া শাস্ত্রে প্রকাশ আছে। এই ধারার বিপরীত কারণটি চিহ্নরূপে ছলে সাধকগণ "ধারা" শব্দটির বর্ণ দুইটি উল্টাইয়া "রাধা" শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বুঝিবার সুবিধার জন্য এই রাধাকে স্থির সৌদামিনী রাধার যে দেহে প্রকাশ হয়, তাহাই বৃন্দাবন নামে অভিহিত। যথা—"রাধা যত্র তপস্তেপে তত্র বৃন্দাবনং স্মৃতং।।" প্রবর্তক পুরুষগণ এইরূপ দেহকে গোলক অপেক্ষাও আনন্দজনক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

যথা— "গোলক আউর্ বৃন্দাবন তৌলে তুলসীদাস।
ভারি যো সো ভুতল বৈঠে হল্‌কা চড়্‌হে আকাশ।।"

এই শরীর অভ্যন্তরস্থ স্থির সৌদামিনীকে মঙ্গলময় বহ্নি, তেজবিশিষ্ট শক্তিতে ভেদ করিতে পারিলে ইহার মধ্যস্থলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত সুতরাং কৃষ্ণবর্ণ তৎস্বামী (এই সৌদামিনী যাহার শক্তিপুঞ্জমাত্র) অনুভব হইয়া থাকে। তাহাই রাধাবক্ষ স্থল স্থিত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখাত।

যদি বৃন্দাবন এত ভালবাস—
হৃদি বৃন্দাবন বিহারী।
তোমার বৃন্দাবনে এ দেহ ভবনে আর কিসের

আছে হে হরি।।
রয়েছে সরল সুষুম্না যমুনা, পঞ্চ বিধভাবে সদা পরিপূর্ণা।
ষট্‌চক্র বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন কেশী ঘাট—
বংশীবট আদি করি।
মূলাধারে রাধা কুলকুণ্ড লিনী
তোমার বিরহে আছে বিষাদিনী।
আছে অচৈতন্য করহে চৈতন্য—
বংশী জ্ঞানামৃত বরিষণ করি।
হৃদয় কদম্ব অনাহতে বসি রাধা নামে—
শ্যাম বাজাও একবার বাঁশী।
শুনি বংশীধ্বনি রাই উন্মাদিনী—
মিলিবে তোমারে সহস্রার উপরি।।
হেরিয়ে সাধক আনন্দে পূরিত
সহস্রারে কি বা তড়িত জড়িত।
অপূর্ব আলোকে প্রাণ বিমোহিত
ভেদাভেদ যাবে দূরে পরিহরি।।

ইহা রক্তমাংসের দেহ বিশিষ্ট কোন পদার্থ নহে। এই মূর্তি সৃষ্টি হইলে জীবের আর কোন যন্ত্রণা থাকে না। সমস্ত যন্ত্রণা হইতে স্বচ্ছন্দে মুক্তিলাভ করেন। এই কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে একটা অনাহত বংশীধ্বনিবৎ শব্দ অনুভূত হইতে থাকে। ইহাকেই শাস্ত্রে প্রণব বলে। এই শব্দে সুরৎ অর্থাৎ অহংকার বা অহংবোধ বিগলিত হইয়া নিমিলিত হইয়া যায়। এইজন্য ইহাকে সুরৎশব্দযোগ বলে।

আমাদের দেহরূপ বৃন্দাবনে মেরুদণ্ডের মধ্যে সরল সুষুম্না পথ রহিয়াছে। ঐ পথ ধরিয়া আমাদের চলিতে হইবে। মূলাধারে রাধা কুণ্ড লিনীরূপে অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে জাগাইতে হইবে। স্থিরাসনে বসিয়া প্রাণক্রিয়ায় মগ্ন হইতে হইবে। প্রাণায়ামের দ্বারা কুলকুণ্ড লিনী যখন জাগরিতা হন ও মণিপুরে মণিময় আলোকে উদ্ভাসিত হন তখন হৃদয় কদম্বে অনাহত বনে বংশীধারী শ্যাম বংশী বাজান। তাহা শুনিয়া রাধা উন্মাদিনী হন। অর্থাৎ তখন সাধকের অন্তরে প্রকাশ পায় দিব্যশ্রুতি। সে অন্তরে শুনিতে পায় মধুর আহ্বান ধ্বনি। এই ধ্বনি প্রতি জীবকে সততঃ আহ্বান করে ঐ যমুনা পুলিনের দিকে, যে স্থানে ধীর ধীর সমীর প্রবাহিত যে বনে বনমালী অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সে বাঁশীর সুর সাধক জীবনকে মাতাইয়া, দোলাইয়া ও উল্লাসে ভরিয়া দেয়। সাধক ছুটিয়া চলে জাতি, কুল, শীল, মান ভুলিয়া। বাঁশীর সুর লক্ষ্য করিয়া সাধক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। জন্ম-মৃত্যুহীন, শোকতাপ বিহীন, সৎ-চিৎ আনন্দময় রাজ্যে পৌঁছিয়া বংশীধারীর সহিত মিলনের আশায় সাধক চিত্ত তখন উদ্বেলিত। তাহার হৃদয়ের

সকল ভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব ও অভিমান দূর হইয়া যায়। বিশ্বের সহিত সাম্য ও সৌহার্দ্যভাব জন্মায়। সাধক লাভ করে অনাবিল,অনন্ত শান্তির স্পর্শ। প্রণব ধ্বনি শুনিতে শুনিতে সাধক বিভোর হইয়া যায়। এই প্রণব ধ্বনি গতি স্বরূপ। এই গতির পশ্চাতে যখন আত্মস্বরূপ ফুটিয়া উঠে তখন তাহাকে গতিহীন ভাবেই সাধক উপলব্ধি করেন। এই জ্যোতিঃ সাধনার দ্বারা সাধক যখন আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখন জ্যোতির তুলনায় উহা অপূর্ব কৃষ্ণ বিন্দুরূপেই উপলব্ধি হয়। জ্যোতিঃ সাধনার পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে সাধকের মন স্থির হইয়া যায়। ক্রমে জ্যোতির বৈচিত্র্য কমিলেই সাধকের সূক্ষ্ম মনের সম্মুখে একটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু ফুটিয়া উঠে। ঐ বিন্দুটির চতুর্দিকে জ্যোতিঃমণ্ডলের দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিন্দুটি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা কৃষ্ণবর্ণ নহে। শব্দতরঙ্গের তুলনায় যেমন আত্মস্বরূপকে স্থির বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। প্রাণক্রিয়া সহ যোনিমুদ্রার সাহায্যে কূটস্থে বা আজ্ঞাচক্রে অপূর্ব, অপরূপ ভাস্বর দ্যুতিতে বিরাজিত রহিয়াছেন দেখিতে পান। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার যুগলমূর্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন আত্মনারায়ণ কূটস্থচৈতন্য এবং শ্রীরাধিকা তাঁহারই অনির্বচনীয় শক্তিরূপিনী পরমা প্রকৃতি। ইনি সদা আত্মনারায়ণ কূটস্থচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছেন। তাই আমার পরমগুরু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ বলিতেন—"কূটস্থে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে প্রজ্ঞাচক্ষুরূপে তৃতীয় নয়ন বিদ্যমান। এই নয়নের চারিটি অংশ। বহির্ভাগে প্রথম অংশ হচ্ছে চক্ষুর সাধারণ শ্বেত অংশস্বরূপ। তার মধ্যভাগে দ্বিতীয় অংশ গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু গোলক। তাকে বেষ্টন করে রয়েছে তৃতীয় অংশ পীতাভবলয়। চক্ষু গোলকের মধ্যে চতুর্থ অংশ পঞ্চ মুখী নক্ষত্রটি চক্ষুর মণিস্বরূপ। সাধক যখন সাধনায় মগ্ন থাকেন তখন তিনি যোনিমুদ্রার সাহায্যে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে পীতজ্যোতি সহ কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাকেই সাধকগণ উপলব্ধি করেন, যে পীত জ্যোতি রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া আছেন। নক্ষত্রবৎ ক্ষুদ্র শ্বেত জ্যোতি যে চক্ষু মধ্যে দৃষ্ট হয় তাহা ধর্মতত্ত্বের গুহা স্বরূপ কূটস্থ চৈতন্যের প্রকৃত জ্যোতিঃ প্রকাশ। এই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তি উপলব্ধি হইয়া থাকে।"

সুতরাং পুরাণে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তাঁহারাই হইলেন কূটস্থ চৈতন্য এবং তদীয় শক্তি পরমাপ্রকৃতি। সাধকের অন্তরস্থিত শক্তিই রাধা। অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা শক্তিকে যেমন আলাদা করা যায় না। তেমনি শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। একই কারণে শিব-শক্তি, রাধা-কৃষ্ণ হইলেন যুগনদ্ধ তত্ত্ব। তাই রাধা ও কৃষ্ণ একই আত্মা। একজনকে ছাড়িয়া অন্যজনের অস্তিত্ব অসম্ভব। সাধক ও তাহার সাধনাকারিণী শক্তিই হইল যথাক্রমে রাধা ও কৃষ্ণ। ইঁহারা সমগ্র জীবের অন্তর্বাহ্যে নিত্য বিরাজমান।

লৌকিকী লীলায় যেমন শ্রীরাধা শ্যামের বংশীধ্বনি শুনিবার জন্য, তাঁহার

তাই এক কাজ কর, তুমি এই গাছের গোড়ায় বসে শুধু তোমার বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে থাক। তুমি ছেলে, তোমাকে ছেড়ে তোমার বাবা কোথাও যাবে না। ঠিক তোমাকে খুঁজে বের করবেই। তুমি চুপ করে এখানে বসে থাক দেখি। এই পরামর্শ দিতে ছেলেটি চুপ করে বসে শুধু একমনে তার বাবার কণ্ঠস্বর শোনার

আগমনের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন, সাধককেও তেমনি শ্রীরাধার ন্যায়ই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে হইবে। পরমপ্রেমময়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি একমুখী করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। কৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনি আমাদের হৃদয়মন্দিরে সতত্তই ধ্বনিত হইতেছে। এই ধ্বনির অপর নাম অনাহত ধ্বনি। বহির্মুখী বলিয়া জীবকূলের এই ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না। তজ্জন্য সাধককে অন্তর্মুখী ও অন্তরাবৃত্ত হইতে হইবে। একবার সে ধ্বনি শ্রবণ করিলে সাধক তাহাতে মুগ্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত তাহা শুনিবার জন্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন।

তত্ত্বগত দিক হইতে যিনি সাধনা করেন তিনিই রাধা। যিনি পূজা করেন বা তোষণ করেন তিনিই রাধা। আর এই শক্তিকে যিনি আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। তিনি সাধকের সাধনাকারিণী শক্তির সর্ব ইন্দ্রিয় আকর্ষণ করেন। এই কৃষ্ণই জগৎস্বামী। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তিনি। কুল, মান, ইত্যাদি পরিত্যাগ না করিলে, কুলকলঙ্কিণী না হইলে সেই জগৎস্বামী বা জগৎপ্রভুর সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই স্বামী, ঘর, কলঙ্ক, নিন্দা, কুল, মান, অপমান তুচ্ছ করিয়া শ্যামের প্রেমে বিভোর হইয়া অনন্ত প্রেমানন্দ আস্বাদন করিবার জন্য আকুল হইয়া অসীম প্রেম সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন শ্রীরাধা। শ্যামকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কুলকলঙ্কের অপবাদকেও অবলীলায় বরণ করিয়া লইলেন তিনি । জগৎ অধিপতির প্রেম লাভার্থে রাধারূপী সাধককেও লজ্জা, মানাদি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া কুলকলঙ্কিণীর ন্যায় নির্ভীকভাবে তাঁহার অসীম প্রেমপ্রবাহে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে হইবে। তবেই জগদাধিপতির সন্ধান বা প্রেম লাভ করা সম্ভব হইবে। অর্থাৎ তীব্র প্রযত্ন সহকারে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে রাধিকার এ কলঙ্ক আপেক্ষিক। সামাজিক বা অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অপবাদ, কলঙ্ক ইত্যাদি হয়তো বা রহিয়াছে কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহা নাই। আছে শুধু ভগবানকে পাওয়ার নিমিত্ত অসীম অনুরাগ, ব্যাকুলতা। আছে ভগবানকে না পাওয়ার বেদনা এবং শেষে ভগবৎকৃপায় ভগবৎ সঙ্গ লাভে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। জীব যখন সাধনবলে নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করে তখন ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ভগবান ও ভক্তের স্বরূপগত অভেদাত্মক মিলনের নাম রমন। ভগবান ভক্তের সহিত রমন করেন, ভক্তও ভগবানের সহিত রমন করেন। ভগবানের সহিত ভক্তের মিলনে ভক্ত যখন আত্মহারা হইয়া ভগবানের সহিত অভিন্ন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হন তখন তাহাই যোগীর সমাধি।

অপেক্ষায় রয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই তার বাবা চারিদিকে ডাকতে ডাকতে সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র ছেলে তার বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বাবার কাছে গিয়ে হাজির হল। হারিয়ে যাওয়া ছেলে তার পিতাকে খুঁজে পেল। পিতা পুত্রের মিলন হল।

ঠিক তেমনি এই বিশ্ব একটি বিরাট মেলা। এখানে সকলেই ছুটে বেড়াচ্ছে, কেউ কাউকে ধরা দিচ্ছে না। এখানে অনন্ত কোটি মানুষ, অনন্ত কোটি মূর্তি পরিগ্রহ করে খেলা করছে। সেজন্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে স্থির হয়ে বসে বিশ্বপিতা ভগবানের আহ্বান শোনা। শান্ত হয়ে সংযত হয়ে বসে শোনো, সবই ধরা পড়বে। আহ্বান করছেন তিনি আমাদের। আমাদের সেই আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। তবেই পিতা-পুত্রের মিলন হবে। তোমাদের জীবন পবিত্র হবে ও শান্তি লাভ করবে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য শ্রীমতি রাধাও এই পথ ধরে গেছেন। আমাদেরও তাই করতে হবে। তা যদি না করি তবে এই বিশাল ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে। মানব জীবনের মত অমূল্য জীবন হারিয়ে কাঁদতে হবে। কেউ কাউকে ধরতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ এই যে জন্ম মৃত্যুর আবর্তের কথা বললেন তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?

উত্তর ঃ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে মুগ্ধ না হয়ে আমরা যদি স্রষ্টার অন্বেষণ করি এবং জীবনে মরণে তাঁকেই অবলম্বন করে থাকি বা ধরে থাকি তবেই এ আবর্ত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে পারে। এক রকম যাঁতা আছে, তাতে কলাই পেষা হয়। সেই যাঁতাতে কলাই ফেলে দিয়ে তাকে ঘোরাতে হয়। ঘোরানোর ফলে কলাইগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ভেঙ্গে চুরে বাইরে ছিটকে চলে যায়। এইভাবে কলাই ডাল ভাঙ্গা হয়। চাকার মাঝখানে একটা কীলক থাকে।* ডাল ভাঙ্গা শেষ হলে দেখা যায় কতকগুলো কলাই অক্ষত রয়েছে। সেগুলো কীলককে অবলম্বন করে

বিশদ অর্থ—

"চল্‌তি চক্কি সব্ কোই দেখে,
কীল্ দেখে না কোই।
যো কীল্ পাকড়কে রহে,
সাবেৎ বহা হেয় ওই।।"

—তুলসীদাস

তুলসীদাস বলিয়াছেন—ঘূর্ণিত যাঁতা হইতে নিষ্পেষিত শস্য বিনিষ্ক্রান্ত হয়—ইহাই সকলে প্রত্যক্ষ করে; কিন্তু কীলক (খোঁটার) দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে

আছে সেগুলো পিষ্ট হয়নি। আমাদের সংসার চক্রও ঠিক তদ্রূপ। যাঁতায় যেমন কলাইগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছিটকে পড়ছে ঠিক তেমনি আমরাও সংসার চক্রে নিষ্পেষিত ও চূর্ণ ও বিচূর্ণ হচ্ছি। জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পড়ছি এবং সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভাল-মন্দয় সকলে পিষ্ট হয়ে বিভ্রান্তির পথে ছুটছি। কোথায় যাচ্ছি তা বুঝতে পারি না। তাই আমরা যদি কীলককে ধরতে পারি, যদি সেই স্রষ্টাকে ধরতে পারি, আমাদের হৃদয়ে যিনি রয়েছেন তাঁকে ধরতে পারি তবেই আমরা এই আবর্ত থেকে উদ্ধার পেতে পারি। তখনই আমাদের জীবন সার্থক হবে। তখন আমরা আর এভাবে ঘূর্ণিপাকে পড়ে পিষ্ট হয়ে যাবো না। কিন্তু আমরা তা না করে এইভাবে পিষ্ট হয়ে বহু জন্ম ধরে বার বার যাতায়াত করছি। কোথায় এসেছি, কেন এসেছি, কোথায় যাব ইত্যাদি কোনটাই আমাদের জিজ্ঞাসা বা জানা নাই। বুদ্ধিমান যে হবে সে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করার জন্য,

---

না। যাঁতার অভ্যন্তরে আশেপাশে যে সকল বীজ নিপাতিত ছিল তাহাই নিষ্পেষিত হইয়া বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু যে সকল বীজ মধ্যের কীলক আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা নিষ্পেষিত বা বিচূর্ণ হয় না। ঘূর্ণিত যাঁতা দর্শন পূর্বক ভক্ত কবীর বলিলেন—অহো! যাঁতার অভ্যন্তর দিয়া যে সকল বীজ (কলাই) আসিয়াছে তাহারা সকলেই নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ এই জগৎরূপ যাঁতায় মর্ত্য ও গগণ এই দুই পাটের মধ্যস্থলে কেহই বিনা আঘাতে যাইবে না। সকলকেই অবশ্যই যন্ত্রণা পাইতে হইবে।

যাহারা জগৎ ক্রিয়া ভুলিয়া কেবলমাত্র গড্ডালিকার ন্যায় দেব-দেবী উপাসনা করে, তাহারা নিঃসন্দেহে নরকমধ্যে এরূপে নিষ্পেষিত হইবে। কিন্তু যাহারা একমাত্র কীলকস্বরূপ জগৎ নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করে এবং তাঁহার উপাসনায় নিরত থাকে, তাহারা কখনই তদ্রূপ ভাবে নিষ্পেষিত হয় না।

তাই যাহাতে নিষ্পেষিত না হইতে হয় তাহার জন্য সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। গুরুই শিষ্যের মনের যাবতীয় ময়লা দূর করিয়া দিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করাইয়া দেন। তাই কবীর বলিয়াছেন—

"কবীর গুরু ধোবি শিখ্ কপড়া, সাধান সিজনি হার।
সুরতি শিলপর ধোইয়ে; নিক্‌লে জ্যোতি অপার।।"

অর্থাৎ গুরু হইতেছেন ধোপা আর শিষ্যের মনটি হইতেছে ময়লা কাপড়ের ন্যায়। ধোপা যেমন কাপড়ে সাজিমাটি মাখাইয়া পাটের উপর আছাড় দিতে দিতে ময়লা কাপড় ধবধবে পরিষ্কার করিয়া থাকে তেমনি গুরুরূপী ধোপা শিষ্যকে সাধনরূপ সাজিমাটি মাখাইয়া আত্মার ধ্যান রূপ শিলাতে মনকে বারংবার আছাড় দিতে শিক্ষা দেন। আছাড় দিতে দিতে ময়লা কাপড় যেমন পরিষ্কার হয়

সেইরূপ গুরুর উপদেশমত সাধনার দ্বারা শিষ্যের মন হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত ময়লা কাটিয়া যায় এবং এক অপূর্ব আত্মজ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া শিষ্যকে কৃতকৃতার্থ করে।

ইন্দ্রিয় সংযম ভাঁটি, ধৈর্য্য স্বর্ণকার, মতি-শুভ্রবুদ্ধি, অথবা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নেহাই, বেদ অর্থাৎ শাস্ত্রানুশাসন হাতুড়ী, পরমেশ্বরের ভয় ঐ হাঁপর, তপস্যা—অগ্নির তাপ, ইত্যাদির সাহায্যে প্রেমভাণ্ডে অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে গুরু উপদেশরূপ অমৃত ঢালিয়া সত্য টাঁকশালে শব্দ অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম প্রস্তুত করে। যাহাদের উপর সদ্‌গুরুর কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহারাই এই কার্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত তপস্যা করিতে পারে। নানক বলেন, 'কৃপাময় অকালপুরুষ কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাহাদের করেন কৃতকৃত্য'।—পৌড়ী ৩৮, শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহিবজীঃ।

"একোদেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা"।

—এই আত্মারূপী দেবতা সর্বপ্রাণীতে পরিব্যাপ্ত। তিনি সর্বভূতের মধ্যে একই অন্তরাত্মা। কীলক অর্থ হইল আশ্রয়। এক আত্মাকে আশ্রয় করিলেই সর্বধর্মস্বরূপ তাঁহাকে আমরা পাইব। শাস্ত্রে এই আশ্রয় বা শরণাগতি ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত আছে। প্রথমতঃ তিনিই আমি, দ্বিতীয়তঃ তিনি আমার এবং তৃতীয়তঃ তাঁহার আমি।

স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড— আমি, তুমি সকলেই বাসুদেব স্বরূপ। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়—এই ধারণা যাঁহার দৃঢ় তিনিই প্রথম শ্রেণীর শরণাগত। "তিনি আমার" অর্থাৎ তাঁহার সত্তা আমার সত্তা হইতে ভিন্ন নহে—ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর শরণাগতি। অর্থাৎ আমি যেখানে আছি, তিনিই সেইখানে আছেন। তাঁহার অপেক্ষা আমার নিকটতর প্রিয়বন্ধু আর কেহই নাই। ব্রজ গোপিকাদিগের শরণাগতি এই প্রকারের। তাঁহারা বলিয়াছিলেন।—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে।।"(—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত)

—অর্থাৎ আমাদিগের হস্ত ছাড়াইয়া বলপূর্বক পলায়ন করিলেন। ইহা আর বেশী আশ্চর্য্যের কথা কি? যদি আমাদের হৃদয় হইতে পলাইয়া যাইতে পার, তবেই তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি। অতঃপর "তাঁহার আমি'—ইহাই তৃতীয় শরণাগতি। প্রহ্লাদ আদি ভক্তেরা এই শ্রেণীর। যদিও তত্ত্বতঃ তাঁহাতে আমাতে কোন ভেদ নাই, কিন্তু তাঁহার বিরাট ঐশ্বর্য্যের কথা চিন্তা করিয়া আপনাকে অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ মনে হয়। তখন ভগবানকে সকল ঐশ্বর্য্যের, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, প্রভু বলিয়া হৃদয়ে বুঝিলে যে শরণাগতি আসে তাহাই এই তৃতীয় প্রকারের শরণাগতি। "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"—(গীতা) —অর্থাৎ তিনিই ভক্তের গতি, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, পরম আশ্রয় এবং সুহৃৎ।

জন্ম সার্থক করার জন্য উদ্যোগী হবে, সদা সচেষ্ট হবে। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলছি। একসময় ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। তাতে পিতা মাতা ঋণগ্রস্ত হলে, ঋণ শোধ করতে না পারলে নিজ ছেলেকে মহাজনের কাছে বিক্রি করে দিত। সেইরকম এক সওদাগরের এক ক্রীতদাস ছিল। একবার সওদাগর তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সমুদ্রের দিকে বেড়াতে এসেছিল। সমুদ্রে বেড়াতে এসে খানিকটা যেতে না যেতেই সওদাগরের ছেলেটা জলে পড়ে গেল। ছেলেকে না পেয়ে সওদাগর ও তার স্ত্রী আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। তাদের যে ক্রীতদাস ছিল সে নিজের জীবন বিপন্ন করে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল ও অনেক দূরে গিয়ে ছেলেকে ধরে চীৎকার করতে লাগল। মাঝি যারা ছিল তারা সে চীৎকার শুনে অনেকদূর গিয়ে দুজনকেই জল থেকে তুলল। ছেলের জীবন ফিরে পাওয়ায়, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তারা ক্রীতদাসকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিল ও পরবর্তীকালে সে যাতে সুখে জীবনযাপন করতে পারে তার জন্য তাকে নৌকা বোঝাই করে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়ে তার পিতামাতার কাছে পাঠিয়ে দিল। প্রচুর ধনসম্পদ সহ নৌকা নিয়ে রওয়ানা হবার পর কিছুদূর যেতে না যেতেই একটি ঝড় উঠল এবং প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় নৌকা ডুবে গেল। ক্রীতদাস কোনরকমে একটা কাঠ অবলম্বন করে বহুদূরে ভেসে এক অজানা দ্বীপে গিয়ে ঠেকল। তখন তার অবস্থা মৃতপ্রায়। দ্বীপে অনেক লোকজন ছিল। তারা তাকে তুলে নিয়ে এল। তাদের সেবাযত্নে ক্রীতদাস জ্ঞান ফিরে পেল ও ক্রমে তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এল এবং দেখল দ্বীপের লোকেরা খুব বাদ্য বাজনা করছে। সে তাদের কাছে সেই সওদাগরের রাজ্যের নাম জিজ্ঞাসা করল। তারা তা বলতে পারল না এবং জানাল যে, দ্বীপের অধিবাসীদের একটা প্রথা আছে। সেটা হচ্ছে, বছরের প্রথমে যে এই দ্বীপের দিকে অকূল সমুদ্রে ভেসে ভেসে আসে তাকে তারা উদ্ধার করে এক বছরের জন্য দ্বীপের রাজা সাজায় এবং এক বৎসর পর তাকে দ্বীপের পাশ্ববর্তী নিবিড় বনে নির্বাসন দেয়। এবারে যখন সে ভেসে ভেসে এসেছে, তাকেই রাজা সাজাবে এবং প্রথানুযায়ী এক বৎসর পরে তাকেও (ক্রীতদাস) নির্বাসন দেওয়া হবে এবং বনের হিংস্র জন্তুরা তাকে খেয়ে ফেলবে। ক্রীতদাস জানতে চাইল সে যদি রাজা হয় তবে রাজ্যের সবাই তার অনুগত হবে কিনা, এবং তার মন্ত্রী ইত্যাদি পারষদবর্গ এবং সৈন্যসামন্ত থাকবে

ভক্ত সাধক তখন এইভাবে ভগবানকে দেখেন। এই ভাব স্থায়ী হইলেই সাধক ভগবানের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া যান। ইহাই ভগবদ্ আশ্রয় বা কীলক।।

কিনা। তারা জানাল রাজার যা যা থাকে সবই তারও থাকবে এবং সবাই তার আদেশ প্রতিপালন করবে। দ্বীপবাসীরা যখন তাকে রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দিল তখন সে প্রথমেই বনটা পরিক্রমা করে দেখতে চাইল এবং সৈন্য সামন্ত ইত্যাদি নিয়ে বনের চারপাশটা ঘুরে এল। তারপর সে সেখানে দ্বাদশটি শিবালয় স্থাপন করতে চাইল এবং সেই অভিপ্রায়ে সৈন্য সামন্ত সকলকে নিয়ে বনটাকে পরিষ্কার করে দিয়ে সেখানে দ্বাদশটি শিবালয় স্থাপন করল ও চারপাশে নতুন রাজ্যও স্থাপন করল। নতুন নগর পত্তন হল। চারপাশটা সুন্দর সুসজ্জিত হওয়াতে নন্দন কাননে পরিণত হল। বন নেই, হিংস্র জন্তু জানোয়ার নেই। সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হল। ক্রমে আবার সেই রাজাকে নির্বাসন দেওয়ার সময় উপস্থিত হল। একবছর অতিক্রান্ত হলে পুনরায় বাদ্যবাজনা সহকারে সেই বনে রাজাকে নির্বাসন দিতে এল। কিন্তু এখন তো আর সে বন নেই। তা এখন নন্দন কাননে পরিণত হয়েছে এবং তা তার স্বহস্তে সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং এখন আর একে নির্বাসন বলা যায় না, বরং সেই বনের (নতুন রাজ্যের) তিনিই সর্বময় কর্তা হলেন। এই হচ্ছে কথা। আমরা ঈশ্বর সৃষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছি। তিনি আমাদের বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন! সেই বিবেক বুদ্ধি সহায়ে আমাদের নিজের মঙ্গলের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। এ জীবনের গতিকে এমন সুন্দরভাবে নির্ণয় করতে হবে যাতে এ জীবন সুখকর ও আনন্দময় হয় এবং পরবর্তী জীবনেও আনন্দময় রাজ্যে পৌঁছান যেতে পারে। প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকেই। এই প্রস্তুতি যথাযথভাবে নিতে পারলেই ইহকাল পরকাল দুইই সুখকর হয়। এই হল বুদ্ধিমানের কাজ। কাজেই বিরাট আবর্ত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, জীবনকে মধুময় করার জন্য এবং পরবর্তী জীবনে আনন্দময় রাজ্যে যাওয়ার জন্য ঠিক ঠিক ভাবে আয়োজন কর এবং প্রস্তুতি নাও!

প্রশ্ন ঃ সাধনজগতে সাধারণতঃ দেখা যায় কেহ নিরাকারের কেহ বা সাকারের অর্থাৎ কালী, কৃষ্ণ, শিব, গণেশ ইত্যাদি মূর্তির উপাসনা করে এবং যে যার উপাসনা করে সে তাকেই বড় বলে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়।—এর কারণ কি? এর মূলে আধ্যাত্মিক রহস্যই বা কি?

উত্তর ঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, কৃষ্ণ প্রত্যেকেই এক একটি শক্তি ও গুণের বিভিন্ন প্রকাশ। তাঁদের মূর্তিগুলো সাধকের নিজের সুবিধার জন্য ভিন্নভিন্নরূপে পরিকল্পিত! হিন্দুরা গাছ, পাথর এবং মাটির পূজা করে না। তারা ঐ সকলে গঠিত দেবদেবীর অন্তর্নিহিত শক্তি ও গুণের পূজা করে। পরব্রহ্ম "অবাঙমনসোগোচরঃ"। সেই কারণে সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর প্রতীক অবলম্বন অপরিহার্য্য। আমরা অতি সূক্ষ্মাবস্থা থেকে স্থূলমূর্তি পরিগ্রহ করে স্থূল শরীরধারী

মানবে পরিণত হয়েছি। এখন সেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে হলে প্রথমে স্থূলের (নরাকার পরব্রহ্ম গুরুরূপ) মধ্যে দিয়েই আমাদের সাধন পথে অগ্রসর হতে হবে।

মহাযোগী মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী বলেছেন—"সিদ্ধ সাধকের শক্তিতে মৃত্তিকা পাষাণ এবং ধাতুনির্মিত প্রতিমাতে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। এইরূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে ঐ মূর্তি চলিতে, বলিতে, শুনিতে এবং কার্য্য করিতে পারেন।" চরাচর বিশ্বসৃষ্টির চিৎ ও অচিৎ যাবতীয় পদার্থ ও প্রাণীর সমষ্টিই পরব্রহ্মের পূর্ণরূপ। তিনি লীলার জন্য অর্থাৎ নিজ মহিমা প্রকটের জন্য স্বেচ্ছায় নিরাকার থেকে সাকারে এবং সাকার থেকে নিরাকার হন। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চ নঃ"। "একো ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি!" যখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর আর নেই তখন যে কোন নামেঅথবা যে কোন প্রতীকে তাঁর উপাসনা করিনা কেন আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য সেই পরমপুরুষের শ্রীচরণোদ্দেশেই অর্পিত হবে। নামে কি আসে ও গোলাপ ফুলকে যে কোন নামেই ডাকিনা কেন, তার মিষ্টি গন্ধ সমানই থাকবে। যারা বিশ্বাস করে পরমেশ্বর নিরাকার তারা যেমন পরমেশ্বরকে লাভ করে, সাকার উপাসকেরাও সেরূপ তাঁকে লাভ করে থাকে। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ সেই পরম সত্যে উপনীত হওয়ার পথে কতকগুলো সোপানমাত্র। এই মতবাদগুলো পরস্পর বিরোধী নয়, পরন্তু পরস্পরের পরিপোষক ও সহায়ক।

অজ্ঞান থেকে আসে সংকীর্ণতা। এই সংকীর্ণতাবোধ থেকেই আসে নানারকম বাদানুবাদ। কেউ বলে কালী বড়, কেউ বলে শিব বড় আবার কেউ বলে বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এই সংকীর্ণতা বোধ লুপ্ত হতে পারে একমাত্র শাশ্বত গতিকে অবলম্বন করলে। এই শাশ্বত গতির পথে কোন বাদ বিসম্বাদ নেই। আছে শুধু বিরাটকে জানা, ভূমাকে আলিঙ্গন করা।

প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ু যখন মস্তকে চড়ে বসে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে উপনীত হয় তখন সাধক সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ অবস্থায় সগুণ ঈশ্বর কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি তাঁদের দেহাভ্যন্তর থেকে অন্তর্হিত হয়ে আত্মায় লীন হয় তখন কালী কৃষ্ণ কিছুই থাকে না। সাধক এক জ্ঞানময় আনন্দে বিভোর হন ও মুক্তিলাভ করেন। শাস্ত্রে আছে—

"ব্রহ্মরন্ধ্রগতে বায়ৌ গিরেঃ প্রস্রবণং ভবেৎ।।"
শৃণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তির্ন সংশয়ঃ।।"

অর্থাৎ প্রাণবায়ু যখন ব্রহ্মরন্ধ্রগত হয় তখন সহস্রদলকমল রূপ পর্বত থেকে সুধাক্ষরণ হয়। তদবস্থায় যোগীর কাণে শ্রবণাতীত মনোহর **নাদধ্বনি** শ্রুত হয়। সুতরাং সাধক মুক্তি লাভ করে এতে সন্দেহ নেই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন ভগবানকে "যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোন গণ্ডগোল নেই। তাঁকে কোনরকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তাহলে তিনিই সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না, সব খবর পাবে কেমন করে? এ বিষয়ে একটা গল্প শোন। একদা একটি লোক বাহ্যে গিয়ে দেখল যে গাছের উপর একটা জানোয়ার বসে আছে। সে এসে আর একজনকে বলল যে অমুক গাছে একটা সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার বসে আছে। লোকটি উত্তর করল যে, সেও দেখেছে এবং সেটি হচ্ছে সবুজ রঙের। আর একজন দেখে এসে বলল সেটি হলদে রঙের আবার কারোও কাছে তা হল নীল রঙের। শেষে তাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধল। তখন তারা সকলে গাছ তলায় একটি লোককে দেখে জিজ্ঞেস করল জানোয়ারটির কি রঙ? সে বলল যে সে সর্বদা গাছতলায় থাকে এবং ঐ জানোয়ারটিকে চেনে। আরও বলল যে জানোয়ারটিকে সে বেশ জানে। জানোয়ারটি কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনো নীল রঙ ধারণ করে। আবার কখনও দেখে কোন রঙই নেই। কখনো সগুন, কখনও নির্গুণ।

আধ্যাত্মিক অর্থ— প্রাণ ক্রিয়া দ্বারা দেহের ষটচক্রে, বিভিন্ন রং দর্শন হয়ে থাকে। প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক যখন মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্রে যায় তখন আগের সব রঙ্ চলে গিয়ে তা মিশে যায় আজ্ঞাচক্রে। অর্থাৎ সেই গাছেই জানোয়ারটির রঙ মিশে যাচ্ছে। যোগ ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন চক্রের বিভিন্ন রং দর্শন করে। কূটস্থ থেকে দর্শন হয় সাদা স্বচ্ছ রং। আবার কখনও কোন রং নেই। প্রাণক্রিয়া দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীশক্তি যখন সহস্রারে গিয়ে স্থিতিলাভ করছে তখন না চন্দ্র না সূর্য্য। শুধু থাকে প্রকাশ মাত্র। তখনই প্রকৃত লয়ে চলে যাচ্ছে। আবার ক্রিয়ার পরাবস্থার পর অবস্থায় যখন থাকা অর্থাৎ সাধক যখন নীচে নেমে আসছে, যখন সগুণে থাকছে তখনই ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন চক্র বিভিন্ন রং দর্শন হচ্ছে। আর যখন নির্গুণে তখন কোন ভাবও নেই, কোন রং নেই, প্রকাশ মাত্র। মন অনুযায়ী দর্শন হচ্ছে। এই রং দেখা যায় নিবৃত্তি মার্গ থেকে, আজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ তৃতীয় নয়ন দিয়ে। কারণ তখন ষট্‌চক্রভেদ হচ্ছে। প্রকৃতির তিনগুণের তিনরকম রং। তমোগুণের একরকম, রজোগুণের একরকম এবং সত্ত্বগুণের আর একরকম। সত্ত্বগুণের প্রকাশ হচ্ছে সাদা। যে সাধক যেগুণে থাকবে তার সেরকম রঙ্ দর্শন হবে। গাছতলায় যে লোকটি বসে আছে অর্থাৎ সাধনা দ্বারা যিনি স্থিরাবস্থা লাভ করেছেন সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই বলতে পারেন মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত কত রং আছে বা কোন রং কখন দেখা যায়। তাই কবীর বলতেন "নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।"

প্রাণক্রিয়া দ্বারা যখন সহস্রারে পরম শিবস্থানে সাধকের স্থিতি হয় তখন সেই অবস্থা গুণের ওপরে চলে গেলে কোন বোধ না থাকায় তা নিরাকার। তখন পুরুষ প্রকৃতি শিব কালীর মিলন হচ্ছে। সত্ত্বগুণে যখন থাকি তখন সাকার অবস্থা। তখনও মা অর্থাৎ প্রকৃতি আছে। তাই পূজ্যপাদ যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বলতেন—

"সূর্য্যোদয়ের কেমন ঘটা—
দেবদেবী সব ব্রহ্মের ছটা।
দেবতা যদি দেখতে চাও—
স্থির বায়ুর মধ্যে যাও।"

"চিদাকাশে ধ্যানমগ্ন থাকেন যে ক্রিয়াবান্।
আপনি দেবতা হয়ে দেবতা দেখিতে পান।"

অর্থাৎ মনুষ্য যোগধ্যানে মগ্ন থাকলেই দেবতা হন। দেবতা না হলে গগনবিহারী সূক্ষ্মদেহধারী দেবগণকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মানুষের সম্মুখে অর্থাৎ জড়ত্ববোধের সম্মুখে তাঁরা উপস্থিত হন না।

প্রশ্ন ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ কাকে বলে?

উত্তর ঃ জগতে ঈশ্বরই একমাত্র স্থির। এই স্থিরকে প্রকৃষ্টরূপে যিনি জানেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিরকে জেনে তিনি তাঁতেই অবস্থান করেন। এ অবস্থায় সাধক মনের সমস্ত বাসনা ত্যাগ করে নিজেতেই নিজে অবস্থান করেন অর্থাৎ জগৎ তার কাছে ব্রহ্মময়, আত্মাময় হয়ে যায় এবং তিনি আপনাতে (আত্মাতে) আপনি মগ্ন থাকেন। সাংসারিক সুখ, দুঃখ বা কোন কিছু তাঁর মনে স্থান পায় না। তাই রাগ, ভয়, দ্বেষ ইত্যাদিও তাঁর থাকে না।

প্রশ্ন ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ হ'লে কি হবে?

উত্তর ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ হলে তুমি তোমাতে অবস্থান করবে। যখন তোমাতে অবস্থান করবে তখন তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার হবে। তখন তুমি বুঝবে সত্য কি, মিথ্যা কি। এ বিশ্বটা ভ্রান্তির খেলা খেলছে। এতে প্রকৃত তৃপ্তি নেই। একটা উন্মাদনা আছে। এই উন্মাদনায় অন্ধকার কারাগৃহে নৃত্য ছাড়া আর কিছুই নেই। তা তুমি উপলব্ধি করতে পারবে।

এই ভ্রান্তিতে বিশ্ব-পাগল হয়ে নিজেকে নিজে হারিয়ে দিশাহারা হয়ে অনাদি অনন্তকাল ধরে ঐ ঘুরপাক খাচ্ছে। জন্ম মৃত্যুর আবর্তে পড়ে এই ভাবে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে হতশ্বাস হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য তিনি বললেন স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে তুমি পুনঃ পুনঃ বিচার কর: 'তুমি' আর 'তোমার'। তুমি কে? একমাত্র তুমি আছ তোমার আছে'। তোমার ঐশ্বর্য্য আর তুমি হচ্ছ আলাদা। তুমি ঐশ্বর্য্য নও। সে'

জন্য "তুমি" কে অবলম্বন করতে হবে।

"আমি আমি করি বুঝতে না পারি। কে আমি আমাতে আছে কি রতন।"

সকলে আমি আমি করছি। এ আমি কি? এ হল আমার স্বরূপ অবস্থা। সে জন্য বলছি স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে বিচার করতে আরম্ভ কর। ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য এই দুটো এক সঙ্গে আছে। ঐশ্বর্য্যে পাগল হয়ে দুঃখ অশান্তি ভোগ করবে। মাধুর্য্যে মধুর রসে মধুর ভাবে ভাবিত হয়ে এই বিরাট সত্ত্বায় তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করে নিজে পরিতৃপ্ত হবে। এই সে দুটো অবস্থা। এই দুটো অবস্থা যখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে, তখনি বুঝবে আমি কি, কি করেছি। এই কায়ার অভিনয় দেখে আমি নিজে অভিভূত হয়েছি। এতো কিছু নয়। এটা ভ্রান্তির খেলা। সিনেমার ছায়াছবির মত এই বিশ্বে খেলা হচ্ছে। এ খেলাতে কিছু পাওয়া যায় না, পাওয়া যাবে না সেজন্য তোমাকে এ ভাবে বললাম। এইবার তুমি সবটা বুঝতে পারবে। একাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। এই বিশ্বরূপ তোমার তো দর্শন হচ্ছে, হবে। যখন তোমার শুভ দৃষ্টি হবে, শুভ জ্ঞান, শুভ বুদ্ধি, শুভ সব হবে, তখনতো তোমার বিশ্বরূপ দর্শন হয়েই আছে। কিন্তু কায়াতে মায়াআচ্ছন্ন হয়ে প্রকৃত বিবেক বুদ্ধি সেই চিন্ময় সত্তাতে দিতে পারছ না। মৃন্ময়তে তুমি পাগল হচ্ছ, উন্মাদ হচ্ছ। কিন্তু চিন্ময়ে তো আবদ্ধ হওনি। এই যে কায়ার আবরন, সেটা রক্ত পুঁজের স্বরূপের অবস্থা নিয়ে নৃত্য করছে। চিন্ময়ী মা আমার খেলা করছেন। তাতে তার স্বরূপ যখনি উপলব্ধি করবে তখন সাধক উন্মুক্ত হয়ে আনন্দে বিভোর হবে। তখনকার ভাব তিনি যে গীতাতে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন সেই ভাব। আমরাও সাধনার দ্বারা এই বিশ্বকে যদি সেই চিন্ময় রূপেই দেখি তখন আমাদেরও বিশ্বরূপ দর্শনের ফল হবে। তখন ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক জাতিকুলমান বংশ মর্যাদা এই অষ্টপাশ থেকে বর্জত হয়ে আমরা মুক্ত অবস্থায় জন্ম সার্থক করবার প্রয়াসী হবো। জীব শিব হবে। সত্যং, শিবং, সুন্দরম্ তখন আমরা সেই সত্য সুন্দরের পূজারী হয়ে আমাদের জন্ম সার্থক করবার প্রয়াস পাব। এই বার আমরা এই সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ সে ভাবটা বললাম তা বোঝার চেষ্টা করব। সেই ভাষার তাৎপর্য্য হচ্ছে আমরা সুন্দরের পূজারী হব। সবই আমাদের সুন্দর হবে। আমাদের ভাষা সুন্দর, ভাব সুন্দর, গতি সুন্দর। সব সুন্দরে যখন আমি অবস্থান করব তখন আমি একটা তৃপ্তির আসন পাব। "তৃপ্তোহস্মি" বিশ্বে তৃপ্তির আসন লাভ করে জন্ম সার্থক করবার প্রয়াস হবে তখন আমার। তখন আমি আপনা আপনি সেই বিরাটের পথে যাত্রা করবার জন্য ক্রমশঃ আত্মাকে উর্ধগতি সম্পন্ন করে নিয়ে যাবো। আত্মা মানে "আমি' এইটুকু ভুল কর না। আত্মা মানে আমি আর

আমার। আমি তখন সেই বিরাট সত্ত্বাতে যাবার জন্য প্রস্তুতি পর্ব নিতে পারব। যখন আমি বিশ্বটাকে গুরুজ্ঞানে দেখব, তখন গুরুই আমার একমাত্র এই বিশ্বে খেলা করছেন। বহূ রূপে তাঁর খেলা ঘর। এই জ্ঞান আমার হবে। গুরু আমার। এইভাবে সব মুর্ত্তিকেই আমি গুরু জ্ঞানে দেখব। তখন আমার গুরুত্ব গুরু অহংকার। আমার হৃদয় মন্দিরে তখন তাঁর অবস্থান। আমি গুরু সে শিষ্য এই যে বোধ এ বোধ তখন ধবংস হবে। এই বোধ যখন ধবংস হবে তখন বিশ্বকে আমি গুরু জ্ঞানে দেখব।

আমি যখন সেই গুরু জ্ঞানে সকলের সেবা করতে পারব সকলকে গুরু জ্ঞানে দেখে আমি আমার বিরাট সত্ত্বার সঙ্গে, আমি আমার সঙ্গে যখন মিলাতে থাকব; তখন বিরাট হবার জন্য আমার প্রয়াস আসবে। তখন আমি সত্যিকার বিরাটের পূজারী হব; তখন আমার জন্ম সার্থক হবে। তখন আমি, জীব আর ব্রহ্ম একীভূত হয়েছে। অহংটা সরে গিয়ে সোহং এসেছে। অহং থাকবে না। তখন ব্যবধান সরে গিয়ে মুক্ত হয়ে শিবং, সত্যং, সুন্দরম্। আবার বলছি আমি তখন সুন্দর হয়ে বিরাটে গিয়ে আমার জন্ম সার্থক করব।

প্রশ্ন ঃ দেহরূপ কারাগার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার নাম যে মুক্তি সেই মুক্তি পাওয়ার উপায় কি?

উত্তর ঃ মুক্তি কথাটা যখন বলা হচ্ছে তখন আবার আবদ্ধ আছি কোথায়? সেটা আগে খোঁজ করতে হবে। আমরা বদ্ধ হয়েছি কোথায় সেটা ঠিক ঠিক ধরতে না পারলে মুক্তিটা ধরা যায় না। আমরা আসক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। আসক্তিটা হচ্ছে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ও শোক—জাতি কুলমান বংশ মর্যাদা এই অষ্ট পাশ। আটটী বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে আছি। সেই জন্য অষ্ট পাশ থেকে মুক্ত না হলে বিরাটের পথে যাত্রা শুরু করতে পারবে না। আমরা এই অনন্ত বিশ্বে সৌর জগতের খেলা আমরা খেলছি। আমরা লুকোচুরি খেলছি। এই লুকোচুরি খেলায় কি পাচ্ছি, কি পাব, কি পেলাম, কি পাওয়ার জন্য ব্যস্ত আছি কোনটাই আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

সত্যিকার আনন্দ প্রকৃত শান্তি প্রকৃত তৃপ্তি আমাদের পাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এখন আমাদের প্রথম কথাটা ধরতে হবে আমাদের উৎপত্তিটা কি থেকে হচ্ছে? এটা ধরতে না পারলে ঠিক ধরা যাবে না। পিতা মাতার যৌন সম্বন্ধ থেকে যখন বিশ্ব উৎপত্তি হচ্ছে তাতে ঐ উৎপত্তির হেতু কি এবং এর পর থেকে অব্যাহতি পাব কি করে সেইটা আমাদের বুঝতে হবে। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি শুক্র এই সাতটা ধাতু থেকে আমাদের দেহ হয়েছে।

একমাত্র শেষে দেখা যায় যে শুক্রই একমাত্র স্রষ্টা। শুক্র ধাতু হতে আমাদের জন্ম পরিগ্রহ হয়েছে। যাহা বিশ্বে শুক্রই প্রকৃত আচার্য্য হয়েছেন। এই খেলা করছেন। আমাদের জন্ম মৃত্যুর অভিনয় চলেছে। এই জন্ম মৃত্যুর অভিনয়ে শুক্রই একমাত্র স্রষ্টার আসন নিয়ে খেলা করছেন। একে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে উন্নত স্তরে ফেলতে পারছি না। এই যে হীন স্তরে নিয়ে খেলা করছি, এতে আমাদের পুনঃপুনঃ যাতায়াত হচ্ছে! এতে আসুরিক ভাব ছাড়া কিছুই নেই। আসুরিক ভাব থেকে মুক্ত হতে হলে আমাকে প্রকৃত সেই বিরাট সত্ত্বাতে যেতে হবে। আচার্য শুক্রাচার্য। বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু, অসুরের গুরু শুক্রাচার্য। এই দুইজনে সৌর জগতে খেলা করছে। তার মধ্যে আমাদের জন্ম মৃত্যুর খেলা হচ্ছে। আচার্যদেবের মৃত্যু নাই। জন্ম হচ্ছে শুক্র ধাতু থেকে। তাকে ধ্বংস করতে কেউ পারে না। ঠিকভাবে তা থাকে। সকলেই বিশ্বে শুক্র ধাতু থেকে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমরা ঠিক ঠিক তাকে সম্মান দিতে পারছি না। আমাদের সৃষ্টিকর্তা বটে, কিন্তু তাকে ফেলছি কোথায়? গর্ভে নিম্নস্তরে ফেলছি। এই নিম্নস্তরে ফেললে আমাদের নিম্নগতি ছাড়া উর্দ্ধগতি হওয়ার কোন উপায় নাই। আমাদের কর্তব্য হবে তাকে বিরাটের দিকে নিয়ে যাওয়া। এই বিরাট স্তরে না নিয়ে গেলে আমরা বিরাটের পথে যাত্রা শুরু করতে পারব না। মর্যাদা দিতে পারছি না। আমরা হীন স্তরে নিক্ষেপ করছি। হীনস্তরে নিক্ষেপ করার জন্য তার পিছনে অনবরত ছুটছি। যার পিছনে পুত্র-কন্যা তার পিছনে অনবরত ছুটে বেড়াচ্ছি। ছুটে বেড়িয়ে কি হচ্ছে, কিছু পাচ্ছি না। কিছু পাব না। কিছু কেহ পায়নি। অন্ধকার কারাগৃহে জন্মেছি। ছুটে বেড়াচ্ছি। সেজন্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বিরাট সত্ত্বাতে যেতে হলে আমাদের শুক্রাচার্যকে হীনস্তরে না নিয়ে আচার্য্যদেবকে বিরাট আসনে বসাতে হবে।

সেই বিরাট আসন হচ্ছে কূটস্থ চৈতন্যতে। বিরাট সত্ত্বায় আমাদিগকে উপনীত হতে হবে। যখনি বিরাটে আমরা উপনীত হতে পারবো, সেই স্রষ্টাকে যখন বিরাট সত্ত্বাতে পৌছাতে পারব, তখনি আমাদের জন্ম সার্থক হবে। তখনি গুরুর সম্মান আমরা ঠিক দিতে পারব। আমরা কেন স্বর্গ, মর্ত, পাতালে সকলেরই সেই শুক্রধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এটা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। এটা বুঝছে না পারার জন্য আমরা একটা কৌতুকের খেলা করছি। বিশ্বটায় কৌতুকের খেলা হচ্ছে। জগৎ জন্মাচ্ছে গত হচ্ছে। এই খেলায় উন্মাদনায় সকলে পাগল। আমাদের প্রকৃতভাবে রহস্য বুঝতে হলে সাধুসঙ্গ নিতে হবে এবং সাধনার পথ ধরতে হবে। তবে গিয়ে পৌছাতে পারব। বিরাটের পথে নিয়ে যাবার জন্য আচার্য দেবকে ঠিক ঠিক ভাবে সম্মান দিতে হবে।

আমাদের মধ্যে দুটা জিনিস একসঙ্গে আছে। দুটি জিনিসের একটা হচ্ছে দিব্যভাব আর একটা আসুরিক ভাব। দিব্য ভাবে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। দেবাসুর সংগ্রাম হয়েছিল। দিব্য ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। আসুরিক ভাব তার সঙ্গে তাকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। এই দিব্য ভাবটা নিতে হবে। যখন বিশ্ব চলছে তখনই আমাদের দিব্য ভাবটা নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি বললেন, শুক্রাচার্যকে গুরুর আসনে বসালেই আমাদের মুক্তি বা শান্তি, এ হল সাধন জগতের কথা। কিন্তু দেবাসুর সংগ্রামের রহস্য সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কাজেই যারা ভক্তিযোগে যেতে চায় তাদের পন্থা বা উপায় কি?

উত্তর ঃ ভক্তি নিয়ে একটা কথা বলা যায় যে, বিশ্বটা একটা মিলনের খেলা। সেই মিলনটাই আমরা করতে পারছি না। তার হেতু হচ্ছে অবিদ্যা মায়ার খেলাতেই বিস্মৃত হয়েছি। বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়া দুইটি খেলা একসঙ্গে হচ্ছে। অবিদ্যামায়ার খেলাতেই আমরা উন্মাদ হয়ে গেছি। অন্ধকার কারাগৃহে নৃত্য করতে শিখেছি। বিদ্যামায়ার খেলা আমরা খেলিনি। বিদ্যামায়ার খেলা খেলতে হলে আমাদের বিচারাধীন হতে হবে।

বিশ্ব স্রষ্টা ভগবান। তিনি মানুষকে পাঠালেন বিচারাধীন করে। মানুষ তার ভালোমন্দ বুঝবে, বুঝে কোনটা করণীয়, কোনটা বর্জনীয়, কোনটায় প্রকৃত শান্তি, তৃপ্তি পাবে সেটা সে বিচার করবে। সৌর জগতে ৪টি মানুষ আছে। ৪টি মানুষ হচ্ছে অতিমানব, মহামানব, শ্রেষ্ঠ মানব, বিরাট মানব। চারটি মানুষ যে আছে তারাই ঠিক করে দেবে যে, কোন পথে চললে প্রকৃত চলা যায়! সেটা যদি না বুঝতে শিখে তবে ভ্রান্তিতে পড়ে হাবুডুবু খাবে। জগৎটা জগৎ মানে গম্ ধাতু থেকে হয়েছে। ভ্রান্তি এই জগতে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে না। সেজন্য অন্ধকারে নৃত্য করতে করতে বহু জন্ম কেটে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি এর আগে বলেছেন যে জগৎটাকে পূজো করে যেতে হবে সেটা কি রকম? জগৎটাতো ভ্রান্তি বলছেন। জগৎকে তোমরা চিন্ময়ী জ্ঞানে পূজো কর সেটা তাহলে কেমন?

উত্তর ঃ চিন্ময়ী জ্ঞানে পূজো না করলে যে আমাকে ভ্রান্তিতে পড়তে হবে।

এই বিশ্বে যে যৌন ক্রীড়ার খেলা হচ্ছে, যৌন ক্রীড়ার খেলাতে স্ত্রী জাতিকে মাতৃত্ব বুদ্ধিতে পূজো করতে হয়। সেটা যদি বুঝতে না শিখো, সেজন্য পায়ে ধরতে হয় তার পরে পায়ে না ধরলে, পূজো না করলে তার কাছে অধিকার স্থান পায় না। পশু পক্ষীর তা হয় না, পশু পক্ষী গেল অমনি ঝাঁপ দিল, যৌন ক্রীড়া হয়ে গেল। কি করা উচিত? মানুষকে অনুশীলন করতে হবে সেখানে

যদি ধ্বংসলীলা করতে যাই, যেখানে এত সুকৌশলটি মানুষের যৌন ক্রীড়ায় ছাড়া আর অন্য কোন দেহে তো হয়নি। পশু পক্ষী কীট, পতঙ্গ সকলেই তো যৌন ক্রীড়া করে, সৃষ্টিতো সকলেই করছে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা যে তাকে সৃষ্টি করার পূর্বে তাকে পূজো করতে হবে। পূজো করতে না পারলে তার কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। যখন পূজো করবে তখন বিরাট সত্ত্বাতে যাবার প্রস্তুতি নিতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ সেটা নারী জাতির কথা বলছেন। নারী হইতে উদ্ভূত হয়েছি। নারীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতে বলছেন। কিন্তু আপনি আগে জগৎকে পূজা করতে বলেছেন।

উত্তর ঃ এই থেকে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। সৃষ্টিকার্য ওই থেকে হচ্ছে। তাই যদি হয় তবে ভুল করছ কেন? তাহলে এখানে মানুষের বেলায় এত নতুনত্ব সৃষ্টি হল কেন? যখনি নতুনত্ব সৃষ্টি হচ্ছে বুঝতে হবে কি করতে হবে আমাদিগকে। বেহুঁশে যদি আমরা খেলা করতে যাই ধ্বংস হই। ধ্বংস হওয়ার জন্য তো এখানে আমাদের মাঝে তাঁর আসন পাতা হয়নি। ভগবৎ সৃষ্টির আসন একটা আছে। সৃষ্টির আসনটা কৌশলে আমাদের পার হতে হবে। সেই কৌশলটা হচ্ছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। এই পাঁচটি ভাবে আমাদের তার কাছে আসন পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এখানে ধ্বংস করার জন্য নয়। যখনি ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয়েছে তখনি অন্ধকার কারাগৃহে নৃত্য করবে। আর কিছু খুঁজে পাবে না। এইভাবে অনাদি অনন্তকাল ধরে সারা বিশ্ব খেলা করছে। প্রকৃত কিছু পাচ্ছে না। কিছু পাবে না। সেজন্য বলছি সেই বিরাট সত্ত্বাতে যেতে হলে আমাদের জন্মের পথ, জন্মস্থান অর্থাৎ যার সত্ত্বাতে আমার উৎপত্তি, যেখানে উৎপত্তি হচ্ছে সেখানে নিবৃত্তি করতে হবে। পূজার আসনে পূজা করে তবে নিবৃত্তি করতে হবে। তা না হলে নিবৃত্তি হবে না কোনভাবে।

প্রশ্ন ঃ এতগুলি ভাব কেন? একটি ভাব হলেই ত হত। এতগুলি ভাবের কেন প্রয়োজন?

উত্তর ঃ শান্ত—শান্ত হয়ে চলা; উন্মাদ হয়ে ধ্বংসলীলা করা নয়।
দাস্য—দাস্য মানে দাস ভাবে তার সেবা করা।
সখ্য—সখাভাবে তার কাছে ভাবের বিনিময় করা।
বাৎসল্য—বাৎসল্য হচ্ছে ছেলে আর মা এই ভাব। অথচ কাম গন্ধ বিহীন।
মধুর— খুবই সুন্দর একেবারে কামগন্ধহীন; তার সঙ্গে থাকবে এবং খেলা খেলবে, অথচ মধুর হয়ে মধুর ভাবে থাকবে। কামগন্ধ রহিত হয়ে মধুর ভাব নিয়ে যদি আমরা চলতে পারি তবেই আমরা সেই বিরাট সত্ত্বায় বা চিন্ময়ী

মায়ের কাছে পৌঁছিবার অধিকার পেতে পারি এবং জীবন সার্থক করতে পারি।

সাধন পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সাধকের একটি ভাব অবলম্বনীয়! নচেৎ সাধক অবলম্বনহীন হয়ে যায়। পাঁচটি মহাভাব থাকলেও আধার ও যোগ্যতা অনুযায়ী সাধকের একটি ভাবই গ্রহণ করা উচিৎ। ঈশ্বর ভাবময়। তাই তিনি ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের কাছে ধরা দেন। ভাব শব্দে অবস্থা বুঝায়। ভাব অবলম্বন করে স্বভাবে যুক্ত হতে হয়। স্বভাব অর্থাৎ আপন ভাব। ভাবের পরিপক্ক অবস্থায় সাধক স্বভাবে মিশে যায়। এই ভাব থেকে আসে ভক্তি, ভক্তি হতে জ্ঞানের উদয়, আর জ্ঞান লাভ হলেই মুক্তি।

গীতা ও আধ্যাত্মতত্ত্ব

ভারতবর্ষ ঋষি প্রধান দেশ। ঋষিরা তাঁদের সাধনলব্ধ অনুভূতি বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। সেই হিসাবে সারা পৃথিবীর সকলেই জানে যে যদি জন্ম সার্থক করার জন্য কিছু জানতে হয়, প্রকৃত আধ্যাত্মিকরহস্য অনুভব করতে হয়—তবে ভারতবর্ষে গিয়ে প্রকৃত সংযম সাধনরহস্য এবং মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব অর্জন করে জন্ম সার্থক করা যেতে পারে। ভারতের ঋষিরা এই তপস্যা করে তাঁদের সেই সাধনসম্পদ রেখে গেছেন। ঋষিরা যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, পুরাণ শাস্ত্রাদিতে তার বিষয় এবং আধ্যাত্মিক নির্দেশ যা নিহিত আছে তা বিশেষ অনুশীলন না করলে কিছু বোঝা যাবে না। অনুশীলন করলে বুঝতে পারবে যে প্রতি পদে পদে আমাদের এই শিক্ষার বিষয় আছে। একটা কথা পঞ্চ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এদেরকে নিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবতারণা করা হল। অর্জুনকে কৃষ্ণ সখারূপে আলিঙ্গন করলেন।

আলিঙ্গন করে বললেন যে দেখ তোমাকেই বিশ্বের কল্যাণার্থে সাধনরহস্য বোঝাব। এই বলে তিনি সাধনরহস্য বুঝাবার জন্য একটা যুদ্ধক্ষেত্রের অবতারণা করলেন। যুদ্ধ শুরু হল, কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে। কুরুদের পক্ষে সাড়ে তিনজন মহারথী* আছেন, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য অশ্বথামা, এই সব আছে। পাণ্ডবের পক্ষে মহারথী নেই। এখন অর্জুনকে রণক্ষেত্রে রথে আরোহণ করে আনা হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথি হলেন। অর্জুন এসে যখন দেখলেন অবাক হয়ে গেছেন। একি! একি দেখছি প্রভু!

সখা একি দেখছি? —ওকি দেখছ?

অর্জুন—সমুদ্র দেখছি যে! কোথায় যাচ্ছ আমাকে?

কৃষ্ণ—বললেন না সমুদ্র নয়, ওটা হচ্ছে কুরু সৈন্যগণ।

অর্জুন— এ্যাঁ, কুরু সৈন্যগণ! এত সৈন্য! এত সৈন্য সমাবেশ!

কৃষ্ণ— হ্যাঁ, এত সৈন্য সমাবেশ। এদেরই সঙ্গ যুদ্ধ করতে হবে।

অর্জুন— এদের সঙ্গে যুদ্ধ করব? আমাদের পিছনে মহারথী তো কেউ নেই, ওদের মহারথী আছে; ভীষ্ম, কর্ণ দ্রোণাচার্য্য, অশ্বথামা প্রভৃতি। এদের

**যিনি অস্ত্র-শস্ত্রে অতিনিপুণ যিনি একাকী একজনমাত্র বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ তিনি "মহারথ"। যিনি অস্ত্র-শস্ত্রে অতিনিপুণ ও অগণিত বীরের সঙ্গে রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ তিনি "অতিরথ"। যিনি একাকী একজনমাত্র বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ তিনি "রথী"। যিনি নিজ হইতে দুর্ব্বলের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি "অর্দ্ধরথ"।*

সঙ্গে যুদ্ধ করব? ওরা মহা মহারথী। আমাদের মহারথী তো নেই। ওদের সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়াস পাচ্ছ সখা? —হ্যাঁ, এদের সঙ্গে তোমায় যুদ্ধ করতে হবে। তুমি ভুল কর না, ওদের যত পরাক্রম শক্তি যা কিছু থাক না—কেন, সে আমার অগোচরে নেই। আমি তা ঠিক করে রেখেছি। তোমার দ্বারাই সম্ভব হবে। একটা কথা বলি শোন।

এই যে সাড়ে তিনটি রথী ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বথামা, এই মহা মহারথী সব আছে;এই মহা মহারথীর যে যে শক্তি সব তোমার ভিতরেই নিহিত আছে। তুমি প্রকৃত স্থিত প্রজ্ঞ হলে তোমার ভিতরে সে' শক্তির বিকাশ হবে। অর্জুন নানারকমভাবে বলছে তাই তো সখা একি! ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বথামা এতো আরও তো সব আত্মীয়-স্বজন আছে। এদের গায়ে কি করে অস্ত্রাঘাত করব?

কৃষ্ণ—ভুল। ভুল বুঝ না। কৃপণতা তোমার শোভা পায় না। তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান। সেইহেতু তোমার যুদ্ধই একমাত্র শ্রেয়।

তুমি কর্ম করবে না, একথা তোমার সাজে না, তোমায় কর্ম করতেই হবে। আর কর্ম না করে কেউ তো থাকতে পারে না বিশ্বে। নিষ্কাম কর্মই কর আর সকাম কর্মই কর। কর্ম করতে হবে। তোমাদের যখন যা কর্ম করতেই হবে। আমরা যে কর্মে শ্রেয়লাভ হবে, সেই কর্মই করব। কি কর্মে শ্রেয়লাভ হবে? যে কর্মে শ্রেয়লাভ সেটা হচ্ছে সাধনকর্ম। নিষ্কাম কর্ম। সে কর্মে সংকল্প কিছু নাই। বিশ্বে যতরকম কর্ম থাক না কেন, সব কর্মের একটা সংকল্প আছে! কিন্তু আমরা যে কর্মে বেঁচে আছি তা প্রাণকর্ম।

আমাদের ভিতরে প্রাণবায়ুর দ্বারা যে প্রাণকর্ম চলছে তাকে নিয়েই বেঁচে আছি। সে কর্মের তো কোন সংকল্প নেই। সেটা হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাসের কর্ম। এই শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের প্রভু দিয়ে রেখেছেন।

এই সম্পদ নিয়ে নাও। আর এই সম্পদ ধরেই তুমি আমার কাছে এস। এইভাবে তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। এটা আমাদের সহজাত কর্ম।* এই কর্ম আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এই কর্মকে অবলম্বন করে আমরা যাতে তার কাছে যেতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। সেইজন্য তোমাকে বলছি স্থিতপ্রজ্ঞ হও।

এই কর্মের দ্বারা তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ হবে। তোমার বায়ুস্থির হবে। প্রাণ স্থির

** বিশদ অর্থ—"সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি না ত্যজেৎ।*
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা ঃ।।"
(গীতা ১৮।৪৮)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন—"হে কৌন্তেয়! সদোষ হইলেও সহজ কর্ম ত্যাগ করিতে নাই। যেহেতু ধূমদ্বারা আবৃত অগ্নিবৎ সর্বকর্ম প্রারম্ভে দোষদ্বারা আবৃত থাকে।

পূজ্যপাদ যোগীবর শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় গীতার এই শ্লোকের অর্থে বলিয়াছেন—"জন্মের সঙ্গে যে কর্ম হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া (যাহা কেবল গুরুবাক্যের দ্বারাই লক্ষ্য হয়) তাহাই সর্বতোভাবে কর্তব্য; (দোহাই দোহাই)—তাহা প্রথম করিতে গেলে ঠিক ঠিক সমুদয় হয়না অর্থাৎ ভালরূপে ক্রিয়া করিতে পারেনা। কিন্তু তাহা বলিয়া ত্যাগ করা উচিৎ নয়—যেমত আগুন জ্বালিতে গেলে প্রথমেতে চোখে ধোঁয়া লেগে কিঞ্চি ৎ ক্লেশ হয়, পরে রসুই করিয়া খেয়ে তৃপ্ত হন—তদ্রূপ আত্মাতেই মন রাখার স্বরূপ কিঞ্চি ৎ ক্লেশ প্রথমে হয়। কিন্তু ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে সে' ধোঁয়ার ক্লেশের অনুভব হয় না। তাহা ভুলিয়া বরং অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি লাভ করে।"

জন্মের সহিত যাহা সহজে পাওয়া যায় তাহাকেই সহজ কর্ম বলে। প্রাণ ক্রিয়াই হইল সহজ কর্ম। কারণ একমাত্র প্রাণকেই জন্মের সহিত পাওয়া যায়। প্রাণই বীর্য্যরূপে জরায়ুতে প্রবেশ করে এবং সেই বীর্য্যরূপী প্রাণের দ্বারা দেহাদি সংগঠিত হয়। সেই প্রাণ হইল বাতাস এবং প্রাণবায়ু হইল শ্বাস। জীব যতদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট না হয় ততদিন শ্বাস প্রশ্বাসের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকে না। মাতৃশরীরের ক্রিয়া দ্বারাই নাড়ী সহযোগে তাহার শরীরে প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই সময় তাহার শরীরে প্রাণপ্রবাহ অতিসূক্ষ্মরূপে তাহার ব্রহ্মনাড়ীতে (সুষুম্নার মধ্যে) বহিতে থাকে। যার ফলে গর্ভস্থ শিশুর জ্ঞানরুদ্ধ হয় না। ব্রহ্মনাড়ী হইতেই সপ্তধাতুর পুষ্টি সাধন হইতে থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার সহিত তাহার প্রাণপ্রবাহ নাসারন্ধ্রেশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে ক্রিয়া করিতে থাকে। অন্তরের প্রাণপ্রবাহ ঐ নাসারন্ধ্রের প্রবাহের সহিত মিলিয়া ক্রমে বর্হিমুখ হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম প্রাণপ্রবাহ ক্ষীণভাবে বহির্মুখ হয়। তখন অন্তঃপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায় না। তাই অনেক সময় শিশুর দিব্যজ্ঞান বা পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত থাকে। প্রাণপ্রবাহ বাহ্যশ্বাসবায়ুর সহিত যত বেশী পরিমাণে মিলিত হয়, ততই তাহার পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়। বাহিরটাই অর্থাৎ বর্হিজগতের দৃশ্যই (নতুন পিতা-মাতা, পরিবেশ) তাহার নিকট বড় হইয়া যায়। আন্তরভাব স্মৃতি হইতে সরিয়া যায়। ফলে সে মোহিত হইয়া পড়ে। তাই প্রাণকর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ঐ প্রাণপ্রবাহকে পুনরায় অর্ন্তমুখী করিয়া মোহের বিনাশ করা এবং স্মৃতি জাগরণে আত্মজ্ঞানোদয়ে জগৎ আনন্দময় অনুভব করা। প্রাণের ঐ অর্ন্তমুখ প্রবাহই সহজকর্ম। বহিঃপ্রবাহটিকে অর্ন্তমুখী করিবার প্রচেষ্টাই প্রাণায়ামাদি কৌশল। শ্রীগুরুদেব যোগদীক্ষা সংস্কারের সময় ঐ প্রবাহটিকে অর্ন্তমুখী করিয়া দিয়া অখণ্ড মণ্ডলাকার তৎপদ দর্শন করাইয়া

দেন। কিন্তু প্রবাহের সেই পরিবর্তন বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। বিকর্মতাড়নে শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসে। কাজেই তাহার জন্য নিজেকে সাধনা অভ্যাস করিতে হয়। প্রাণের ঐ প্রবাহকে অর্ন্তমুখ করিবার জন্য প্রথমে অনেক আয়াস স্বীকার অর্থাৎ পরিশ্রম করিতে হয়। সুখে হয় না। আবার প্রথম প্রথম ঐ চেষ্টা ঠিকও হয়না। বিষয়াকর্ষণে ঠিকরাইয়া বহির্গত হইয়া পড়ে। সেই আসায়টুকুকে, সেই অঠিক চেষ্টাকেই দোষ বলা হয়েছে। ভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন যে সদোষ হইলেও সহজ কর্ম (অর্ন্তমুখে প্রাণচালন) ত্যাগ করিতে নাই। কারণ সবকাজই আরম্ভ কালে নির্দোষ হয় না। দোষাচ্ছন্ন থাকে। যেমন অগ্নি উৎপন্নকালে ধূমাবৃত থাকে, পরে একটু বলাধান হইলে ধোঁয়ার প্রাবল্য কমিয়া যায় ও অগ্নির স্বরূপ অর্থাৎ প্রজ্বলন প্রকাশ পায় সহজাত কর্মও তেমনি গুরু প্রদর্শিত মার্গে সাধনা করিতে করিতে সাধককে ভ্রান্তিমুক্ত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বস্বরূপে স্থাপন করে। সুতরাং সহজ কর্মই হইল প্রাণকর্ম, অর্থাৎ প্রাণকে লইয়াই ইহার কর্ম অর্থাৎ সাধনা। শাস্ত্রে এই প্রাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণু পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্যতে লোকঃ সর্বং প্রাণময়ং জগৎ।।"

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই সেই এক প্রাণশক্তির ভিন্ন অভিব্যক্তি। শাস্ত্রে এই প্রাণকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা, এক কথায় ভগবান বলা হইয়াছে। ভগবানের উপাসনা মানে প্রাণেরই উপাসনা। প্রাণেরই পূজা করিতে হইবে। প্রাণই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অনু পরমাণুর মধ্যে বিরাজমান। এই প্রাণই শ্বাস প্রশ্বাসরূপে জীবের দেহে যাতায়াত করিয়া দেহকে সজীব রাখিয়াছে। প্রাণ চলিয়া গেলে দেহের কোন মূল্যই থাকিবে না। এই শ্বাস প্রশ্বাসের পুঁজি লইয়াই তুমি ভূমিষ্ট হইয়াছ। ইহার সহিতই জাগতিক যত কিছু সম্বন্ধ। ইহার অভাবে সব অন্ধকার। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু পদার্থ দৃশ্যমান হইতেছে তাহা চৈতন্য শক্তির সান্নিধ্যেই চেতনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। প্রতিনিয়ত এই জাগতিক পদার্থ সকল যাহাকে তুমি নিজের বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা তোমার নিজের নহে। এই পৃথিবীতে মাত্র কয়েকদিনের জন্য আসিয়া কেবল তাহা ভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছ। আবার এই পৃথিবী ছাড়িয়া যখন এক অজানা রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে তখন যাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারের জিনিষ তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারেই পড়িয়া থাকিবে। এককণা মাত্রও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না। সহায় সম্বলহীন হইয়া একাই আসিয়াছ আবার একাই চলিয়া যাইতে হইবে। "অব্যক্তাৎ জায়তে প্রাণঃ"— কোন অব্যক্ত অজানা দেশ হইতে বিশ্বপিতা পরমেশ্বরের অনিচ্ছার ইচ্ছায় মাতৃগর্ভে ক্ষুদ্র বীজরূপে পতিত হইয়া আবার তাঁহারই ইচ্ছায় সেই বীজ হইতে ভ্রূণ এবং ভ্রূণ হইতে পূর্ণ অবয়ব সমন্বিত এক

মানবাকারে পরিণত হইয়া দশ মাস দশদিন পরে মাতৃগর্ভচ্যুত হইয়া পৃথিবী মাতার কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর নূতন আলোক দর্শন করিলাম। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন পরমেশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া এক অনির্বচনীয় নির্মল আনন্দ সদাই উপভোগ করিতাম আমরা। কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মহামায়ার মায়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর সেই পরম রমনীয় ভাব আমাদিগের নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া যায়।

"মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রাণের বহির্মুখী গতি আরম্ভ হয়। তখন দেহে আত্মবোধ হয় এবং দেহজনিত ও দেহের অক্ষমতাজনিত কত ক্লেশ হয়—শিশু কেবল রোদন করে—ভিতরের খাটী (যোগসূত্রটি) হারাইয়া যায়; বাহিরের সঙ্গে তেমন মিশ খায় না। জীবের এই শোকাবহ অবস্থাটিই শূদ্রভাব তারপর বালকের উপনয়ন হয় অর্থাৎ গুরুর নিকট উপনীত হয়। গুরু তখন তাহার প্রাণক্রিয়া যাহাতে অর্ন্তমুখ হইতে পারে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করেন। গুরু বলপূর্বক শিষ্যের চিত্তকে অর্ন্তমুখ করিয়া দিয়া ক্ষণেকের জন্য "তৎপদং" দর্শন করাইয়া দেন। প্রাণের বহির্মুখ গতি হইতেই মনে যেমন বিষয়াকারা বৃত্তির উদয় হয় আবার অর্ন্তমুখে চালনার অভ্যাসে তেমনই ভিন্নাকারা বৃত্তির উদয় হইতে থাকে। প্রথম প্রথম সাধনা করিতে গিয়া সাধকেরা অনেক কিছু পাইবার আশা করেন, নিজের শক্তি দেখাইতে ইচ্ছা হয় —তখন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন করিতে হয়। এই যুদ্ধ ব্যাপারটিই হৃদয় গ্রন্থিভেদের সাধনা। ঐ অবস্থায় সাধকের যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয় তাহাই তখন তাহার স্বভাবজ কর্ম। বৈশ্যাবস্থায় সাধনার ভাব মৃদু হইবে। ধীরে প্রাণকে উঠাইতে নামাইতে হইবে। তাহার মধ্যে কোন তীব্রতা বা বলপ্রয়োগ থাকিবে না। এইভাবে সাধনে কিছুকাল অভ্যস্ত হওয়ার পর শ্বাসের আকর্ষণ বিকর্ষণে যখন কোন কষ্ট থাকিবে না, টানা ফেলা দীর্ঘ হইয়া যাইবে তখন সাধক এই অবস্থা হইতে উন্নততর দীক্ষায় দীক্ষিত হইবেন। ক্রমে-ক্রমে সাধনার কঠোরতা বাড়িবে। উহাই ক্ষত্রিয়ভাব। এইখানে শ্বাসের উপর বলপ্রয়োগ করিতে হইবে! "বলাৎকারেণ গৃহ্নীয়াৎ" ইহাই ক্ষত্রিয়ের দিগ্বিজয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ। এই প্রকার করিতে করিতে একদিকে যেমন শৌর্য, তেজ, যোগধারণা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আসিবে, তেমনই অন্যদিকে রিপুদের সহিত প্রবলভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে। মনে হইবে আর যেন পারিলাম না। এখনও যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে চলিবে না। যুদ্ধে অপলায়ন ভাবটিই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম। তাহার পর যোগীর অনেক প্রকার শক্তিলাভ হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যে একচক্রের পর আর একচক্রে উত্থান হইতে থাকে। তত্ত্বজয় হইতে থাকে, ইহারই নাম পররাজ্য জয়! যোগী তখন আসক্ত হইয়া সমস্ত শক্তির সদ্ব্যবহার করিবেন। ইহাই ঈশ্বরভাব এবং অন্যকে সৎপথ দেখাইয়া দেওয়া—উহাই শ্রেষ্ঠদান। হৃদয়গন্থি ভেদ হইলে ক্ষত্রিয়ভাব শেষ হইয়া গেল—তখন যোগী

সর্ববিষয়ে স্থির। তখন তিনি শান্ত, দান্ত জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সহস্রারে স্থির হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন। তখন মনের কোন সংকল্প না থাকায়—"যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎ সরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।"—এই ত্যাগ কেহ ইচ্ছাপূর্বক বা জোর করিয়া করিতে পারে না। উপযুক্ত সময়ে সাধকের আপনা আপনিই সমস্তই ত্যাগ হইয়া যায়—ইহাই ব্রাহ্মণভাব, সর্বশেষ ও সর্ব্বোচ্চ অধিকার।" (ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল কর্তৃক লিখিত গীতা ব্যাখ্যা হইতে উদ্বৃত)।।

সুতরাং জন্মকালে সমস্ত মানুষই শূদ্র। কিন্তু তাহাকে এই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। দৈবকৃপা ও সাধন প্রযত্ন এই উভয়ের দ্বারাই তাহাকে এই শূদ্রাবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় ও উন্নত স্তরে উঠিতে হইবে। নচেৎ বহুজন্ম, বহুযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কালাবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট হইতে সাধনা পরিজ্ঞাত হইয়া শূদ্র জীবকেই সর্বোচ্চ অধিকার তথা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণত্ব অর্জন না করা অবধি জীবের মুক্তি নাই। ইহা একদিকে যেমন গুরুমুখগম্য অন্যদিকে তেমনি সাধন সাপেক্ষ। সাধন বলে জীবের শূদ্রত্ব ঘুচিয়া ব্রাহ্মণত্বের স্ফূরণ হয়। সাধনা দ্বারা যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে, ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যায়। জীবই শিবে পরিণত হন।

তাই হে প্রাণরূপী বন্ধু! কোন এক অজ্ঞাত কারণে ক্ষুদ্র অসহায় জীবরূপে একদিন যেমন সেই অজানা রাজ্য হইতে নিঃসঙ্গ, নিঃসম্বল ও নিঃসহায় অবস্থায় একাকী তুমি পৃথিবীর বুকে আসিয়াছিলে, আবার একদিন ঠিক এমনিভাবে নিঃসঙ্গ, নিঃসম্বল ও নিঃসহায় অবস্থায় তোমাকে এই পৃথিবী হইতে সেই সীমাহীন অনন্ত অজানা রাজ্যের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা করিতে হইবে। সেখানে এই পৃথিবীর পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, দারা সুত, ধন জন, রূপ যৌবন ইত্যাদি কিছুই নাই। সেই শূন্যের পথে তোমাকেও শূন্য হইয়া যাইতে হইবে। সেখানে তুমি শুধু একা আর একা। সেইজন্য সময় থাকিতেই একা, নিঃসঙ্গ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সেখানে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। "যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" তাই আর সময় নষ্ট করিও না, আর শুইয়া কালক্ষেপ করিও না। কবীর বলিতেছেন—

"শোতে শোতে ক্যা করো ভাই
ওঠ্ ভজ মুরার।
অ্যায়সা দিন আতে হেঁয়
লম্বা পা পসার।।"

হে ভ্রাতঃ! শয়ন করিয়া আর কি কর? উঠ, ঈশ্বর আরাধনায় রত হও। কারণ তোমার এরূপ একদিন আসিবে যে, পদদ্বয় বিস্তার করিয়া চিরনিদ্রায়

কাল অতিবাহিত করিতে হইবে। অর্থাৎ যতদিন জীবন এবং চৈতন্য আছে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া ততদিন পরলোকের পথ সুগম কর।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে কাল সেই মহাকালের অধীন। তাঁহারই আজ্ঞাবহ। যিনি মহাকাল, তিনিই ভগবান। মহাকালরূপী ভগবান তাঁহার সন্তান বিশ্ববাসীকে এখনো কোলে টানিয়া লইবার জন্য "নাসিকার সম্মুখে, নাসিকার অব্যবহিত পরেই অখণ্ড আকাশে দাঁড়াইয়া আছেন! আমাদের তিনি আহ্বান করিতেছেন। ঐ যে তাঁহার মাভৈঃ মাভৈঃ রব চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ওরে ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—সময় থাকিতে থাকিতে আমার শরণাপন্ন হও। যাঁহারা গুরুগতপ্রাণ, সাধননিষ্ঠ সাধক তাঁহারাই সে আহ্বানবাণী শুনিতে পাইতেছেন।

"এইসা দিন নহিঁ রহেগা,
জুয়ার মে তেরা ভাটা গিরেগা
ফুরসৎ আউর নেহি মিলেগা
খিয়াল ঠিক রাখনা।।"

কাজেই আমাদের সাবধান হইতে হইবে। কাল দুর্বার গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। আবার এইদিকে শমন শিয়রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই দেহরূপ আকাশ হইতে জীবন-রূপ তারকা যে কখন খসিয়া পড়িবে তাহা কেহ জানে না। তাই বলিতেছি অমূল্য সময় নষ্ট না করিয়া কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেই মহাকালের শরণ গ্রহণ কর। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। জীবনের চরম জ্ঞাতব্যকে জানিয়া যাহাতে হাসিমুখে এই পার্থিব জীবন হইতে বিদায় লওয়া যায় তাহার জন্য এই মুহূর্ত হইতেই জীবনটাকে সেইভাবে গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পৃথিবীতে আগমনের দিন সকলে কাঁদিয়াই আসে কিন্তু এখান হইতে ছুটী লইতে হইবে হাসিমুখে। সহজ সাধনায় সহজভাবে যে প্রাণারামকে সঙ্গে লইয়া অবলীলায় এ স্থল হইতে হাসিমুখে প্রস্থান করিতে পারে সেই সার্থকজন্মা। কবি বলিয়াছেন—

"প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
একা তুমি কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে।
এমন জীবন হবে করিতে গঠন।
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।।"

সুতরাং তদ্রূপ জীবন গঠন করিবার জন্য, জীবনের পরম ধনকে পাইবার জন্য মুখে চীৎকার করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা প্রয়োজন তাহা হইল শুধু হুঁশিয়ার থাকা, সদা জাগ্রত থাকা। সহজ যে প্রাণ যাহা আপনা আপনি চলিতেছে তাহাকেই শুধু লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতেই জগৎরহস্য সাধকের নিকট উন্মোচিত হইবে। তখন অনন্ত জীবনের অসীম রহস্য অবগত হইয়া সাধক অমৃত চেতনায় ভাস্বর হইয়া সেই অমৃতলোকে যাত্রা করিতে পারিবেন।

হবে, মনস্থির হবে। সংকল্প-বিকল্প নিয়ে (মন যে) খেলা করছে। ভিতরে তাকে বশীভূত করে তুমি প্রকৃত সত্যের অনুশীলন করবার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। সেজন্য বলছি এই সব ভ্রান্তিতে পড়ো না। প্রকৃত সত্যকে অনুভব করার জন্য তোমাকে সাধনার পথে নামতে হবে। তুমি এস। আমার কাছে এই সাধনার গূঢ়রহস্য অনুভব করবার চেষ্টা কর।

এই বলে অর্জুনকে স্থিতপ্রজ্ঞার পথ দেখালেন। তখন অর্জুন ক্রমশঃ সেই পথ অনুশীলন করে সাধনার পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। এইভাবে অগ্রসর হওয়ার ফলে শেষে যখন বিশ্বরূপ দর্শন হচ্ছে তখন বলেন প্রভু একি দেখছি? অসংখ্য নদনদী, স্থাবর-জঙ্গম, কত কি দেখছি, প্রভু একি? তার পরে দেখি নানারকম জ্যোতি এবং নানারকম বহু শক্তির বিকাশ হচ্ছে বিশ্বে। আমার ভিতরে এত শক্তি আছে আমি এত বিরাট?

শ্রীকৃষ্ণ—দেখ সখা তোমার ভিতরে সব শক্তি আছে। তুমি ক্লীবতা বর্জন করে প্রকৃত সত্যের পথে অগ্রসর হও আমি সব মেরে রেখেছি। আমি সব ঠিক করে রেখেছি তুমি "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত"। সিংহের মত গর্জে ওঠ। দেখবে সবই পরাভূত হয়ে যাবে। একমাত্র সত্যের জয় হবে। এই বলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ করে সব কুরুবংশের ধ্বংস করলেন। পাণ্ডবের জয় হল। এইভাবে গীতার অবতারণা করা হল। আমরা এত ক্ষুদ্র হয়েছি যে মহাবিরাট কে, মহাসত্যকে হারিয়ে অতি ক্ষুদ্রতা, অতি নীচতা, অতি হীনতার পথে ছুটেছি। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে খেলা করছি। আত্মীয়-স্বজন সৃষ্টি করছি। অন্ধকার কারাগৃহে থাকার মত আমরা কোথায় ছুটে বেড়াচ্ছি তার ঠিক নেই। আমরা মানে সারা বিশ্বই এই ভ্রান্তিতে পড়েছে। এই ভ্রান্তির প্রকৃতরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হলে আমাদিগকে প্রকৃত সত্যের অনুশীলন করতে হবে। এই বিশ্বটা কোনদিকে ছুটেছে—আমরা কি চাচ্ছি, কি পাচ্ছি, কি পাব, কি পেয়েছি, কি পেলাম কোনটাই যদি বিচার করতে না পারি কি করব, আমরা? এই ভ্রান্তির পথে চলা আমাদের ঠিক নয়। সেজন্য আমাদিগকে প্রকৃত সত্যের অনুশীলন করতে হবে। আসুন সকলে এই বিরাট সত্যকে অনুভব করার জন্য, ঋষি প্রদর্শিত পথে আমাদের যাবার জন্য। এই জন্ম সার্থক করার জন্য গুরুর শরণাগত হয়ে আমরা সংযম শিক্ষালাভ করি। তবেই সাধনরহস্য। তবেই মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব অর্জন করে জন্ম সার্থক করার প্রয়াস পাব।

তা না হলে এই হীনস্তরে নেমে বিরাটকে হারিয়ে অতি সংকীর্ণ পথে আমরা যাত্রা শুরু করে কোথায় অন্ধকার কারাগৃহে উপনীত হব। এইভাবে জন্ম-জন্মান্তর ঘূর্ণিপাকে পড়ে আমাদের বহু জন্ম পরিগ্রহ করতে হবে একথা যদি আমরা

অনুভব না করি, যদি আমরা শাশ্বতগতিকে হারিয়ে বিভ্রান্তির পথে ছুটি, তাহলে আমাদের জীবনের মূল্য একেবারে শেষ হয়ে যায়। আমাদের সেজন্য প্রার্থনা—সকলে আসুন সেই ভগবৎপথে যাবার জন্য আমরা সকলে প্রস্তুত হই। তাহলে আমাদের জন্ম সার্থক হবে। আমরা দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করে এই জীবনকে ধন্য করব। এবং বিশ্ববাসী এই পথের অনুগামী হয়ে ধন্য হবে। এই বিরাট বৈচিত্র্যময় জগতে আমরা ভ্রান্তিতে পড়েছি। প্রকৃত সত্য কি, মিথ্যা কি, কি করা আমাদের উচিত, কোথায় যাচ্ছি, কোথায় যাব, কেন এসেছি, কোনটাই বুঝতে পারছি না। সেজন্য আমরা ভ্রান্তিতে পড়েছি। আমরা হাবুডবু খাচ্ছি। আমাদের শাস্ত্র এমনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে সত্যিকার আমরা ঠিক ঠিক কুল ধরবার পথ পাই। সুতরাং শাস্ত্রই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করে তার প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের বুঝতে হবে। যেমন মহাভারতের একটি ঘটনা হল কুরু ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধ । সে যুদ্ধে পাণ্ডবগণের জয় হোল। এ হল সাধারণ ঘটনা কিন্তু এর প্রকৃত বা অভ্যন্তরীণ অর্থ আরও গভীর। পাণ্ডবের জয় হল মানে কুরু হচ্ছে প্রবৃত্তি। পাণ্ডব হচ্ছে নিবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সংগ্রাম। সকল মানুষের ভিতরে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির খেলা হচ্ছে। মানুষ যে তার প্রবৃত্তি নিয়ে খেলা করতে যায়। অহং কর্তৃত্ব নিয়ে খেলা করে সেজন্য দিশেহারা হয়ে যায়। অহংকার নিয়ে খেলা করে দূর্যোধন। দুর্যোধন মানে দুর্যোগ সৃষ্টি করে ধন আহরণ করা। খুন-খারাপি নানা রকমভাবে ধ্বংসলীলা করে দুর্যোগ সৃষ্টি করে ধন আহরণ করেই তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাকেই দুর্যোধন বলে। সেই দুর্যোধন চাইলেন যে এই কটা পাণ্ডবকে শেষ করে দিয়ে আমি একাকী আধিপত্য লাভ করব। অহংকারে দিশাহারা হয়ে যুদ্ধে প্রবিষ্ট হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাঝখানে থেকে তাকে নানারকমভাবে বুঝিয়ে ছিলেন যে দেখ যুদ্ধ করো না। কেন মিছিমিছি লোকক্ষয় করবে। লোকক্ষয় করে লাভ তো কিছুই নেই। লোকক্ষয় করো না।

দুর্যোধন যখন যুদ্ধ করতে দৃঢ় সংকল্প তখন দূতের ভূমিকা গ্রহণ করেন শ্রীকৃষ্ণ।

দুত শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে বললেন দেখ আমি এসেছি। লোক ক্ষয় করা ঠিক উচিত নয়। আর নিজেদের (মধ্যে) ভেতরে এত লোক ক্ষয় করে এ অবস্থাটা আমাদের সৃষ্টি করা ভাল নয়। এক কাজ কর। পাঁচটা গ্রাম পঞ্চ পাণ্ডবদের দাও! এরা সুখে বাস করুক। তোমরা যেমন আছ তেমন থাক। তখন দুর্যোধন ভাবলেন এ বেশতো! এখানে এসে দৌত্য করে বাহাদুরী দেখাবে। তখন অন্য সব সৈন্যদিগকে বললে দেখ এ যখন এ'সব কথা বলবে তখন তোমরা পিছন দিক থেকে বেঁধে ফেলবে। এই বলে ইশারা করে দিতেই সব প্রস্তুত হয়ে গেছে।

কৃষ্ণ—দেখ আমি বলছি এটা ভুল। কোরো না। এতে তোমাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু হবেনা। আত্মীয় বান্ধবকে নিয়ে ধ্বংস করে লাভটা কি হবে? লাভ তো হবে না বরং লোকসানই হবে। তখন দুর্যোধন বললে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি দান করব না, এই বলে শ্রীকৃষ্ণকে সকলে বাঁধার ব্যবস্থা করল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দিলেন। যেমন অর্জুনকে করিয়েছিলেন বিশ্বরূপ দর্শন। তখন অর্জুন সেই দেখে অবাক হয়ে গিয়ে স্তব স্তুতি প্রার্থনা করেছিলেন। তেমনিভাবে দুর্যোধনকেও এইভাবে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। বিরাট অবস্থা দেখাতে লাগলেন। বিশ্বরূপ দর্শন মানে অনন্তকোটী চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্তকোটী বিশ্ব। সকলে ভয়ে বিহ্বল হয়েছে। এমনকি দুর্যোধন ও মূর্চ্ছিত হলেন। তারপর কুরু সৈন্য সব ছিন্নবিচ্ছন্ন হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে সকলে অজ্ঞান হয়ে গেল।

তারপর সঙ্গীরা বলল বাঃ বেটাতো বেশ ভেল্‌কি জানে। এমনভাবে কি একটা দেখালো যে আমরা সব জ্ঞান শূন্য হয়ে গেলাম। তখন শকুনি প্রভৃতি অন্যান্য সঙ্গীরা বলল যে বেটা ঐ ভেলকী অর্জুনকে দেখিয়েছিল আর আমাদের এখানেও এসে দেখিয়ে ঐ ফাঁকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু এ বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুন অভাবনীয়রূপে জন্মসার্থক করার প্রয়াস অনুভব করে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে যে প্রার্থনা করেছিল তা চিরস্মরণীয়।

অর্জুন প্রার্থনা জানালেন—হে প্রভু তুমি এত বিরাট এত মহান। হে নাথ! এ বিশ্ব তোমাতেই প্রকাশ হয়ে তোমাতেই বিলীন হচ্ছে। এই অনন্তকোটী বিশ্ব তোমার ভিতরেই খেলছে। আমরা তো কিছুই বুঝতে পারিনি। তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদের ঘোরে তোমাকে 'হে কৃষ্ণ', 'হে যাদব', 'হে সখা' ইত্যাদি বলেছি। তুমি আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা কর। তুমি এই বিশ্বচরাচরের পিতা, গুরু এবং গুরুরও গুরু। প্রভু তুমি আমাকে এ হীন দশা থেকে প্রকৃত সত্যের পথে নিয়ে চল। ইত্যাদি বলে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান—মহাপ্রস্থান অর্থাৎ পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেব এবং দ্রৌপদী এরা সকলেই স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করেছে। অগ্রসর হয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই পথে দ্রৌপদীর মৃত্যু ঘটল। সকলেই ঘুরে ঘুরে দেখছে সকলেই আসছে কিনা। দেখল দৌপদী পথিমধ্যে রয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার দেখে অশ্বিনীকুমার দ্বয় অর্থাৎ নকুল ও সহদেব এঁরাও পথিমধ্যে রয়ে গেল। ভীম ও খানিকটা দূরে, সেও অনেকটা পথ গেল। গিয়ে পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটল। একে একে

সকলেরই এইভাবে মৃত্যু ঘটছে। বাকী রয়ে গেল শুধু যুধিষ্ঠির। শেষ পর্য্যন্ত তিনিই গিয়ে স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হওয়া মাত্র ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে?

যুধিষ্ঠির—আমি যুধিষ্ঠির।

ইন্দ্র—কোথায় তুমি যাবে?

যুধিষ্ঠির—আমি স্বর্গে যাব।

ইন্দ্র—কি? স্বর্গে যাবে?

যুধিষ্ঠির—হ্যাঁ, স্বর্গে যাব।

ইন্দ্র—কোথা থেকে এসেছ তুমি? তুমি জান এটা স্বর্গ, এটা পবিত্র স্থান?

যুধিষ্ঠির—হ্যাঁ, পবিত্রস্থান। এটা স্বর্গ তা জানি। তাই এখানে এসেছি।

ইন্দ্র—আচ্ছা, ঐ যে তোমার পেছনে ওটা কি?

যুধিষ্ঠির এতক্ষণ পর্য্যন্ত পেছন ফেরেন নি। ভীম, অর্জুন, নকুল এরা প্রত্যেকেই পেছন ফিরে দেখেছে। এবং তারা পথিমধ্যে রয়ে গেছে। দ্রৌপদীও থেকে গেল।

যুধিষ্ঠির কিন্তু এখনও পেছনে ফেরেননি। শেষে দেখলেন, একটি কুকুর। মুখ দিয়ে লালা বেরুচ্ছে ও ফ্যা ফ্যা করছে। ইন্দ্র—তুমি এ কি করেছ। এই উত্তম পবিত্র স্বর্গস্থানে মানুষ কত তপস্যা করে আসে। আর তুমি এখানে এসেছ, এক বিষ্ঠাভোজী কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে? এ কি তোমার হীনবৃত্তি। তোমার এ অবস্থাতো ভাল নয়। তখন পিছন ফিরে দেখে ওর সঙ্গীরা কেউ নাই। সবাই পথিমধ্যে রয়ে গেছে। তখন ছলনা বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন—কেন কুকুরের কি স্বর্গে যাওয়ার অধিকার নেই?

ইন্দ্র—বাবা! তুমি তো বেশ ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছ?

যুধিষ্ঠির— যে স্বর্গে শুচি, অশুচি জ্ঞান আছে, সে স্বর্গ আমার চাইনে।

ধর্ম— বেশ তো তোমার ব্রহ্মজ্ঞান। তুমি এক কাজ কর—

তুমি কুকুরটাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দাও। আর তুমি নীচে নেমে যাও। তুমি পুণ্যবান। যা কিছু পুণ্য অর্জন করেছ, যে পুণ্যবলে তুমি স্বর্গে আরোহণ করতে পেরেছ ঐ পুণ্যফল তুমি ঐ কুকুরটাকে দাও। কুকুর স্বর্গে আসুক। আর তুমি নীচে নেমে চলে যাও।

যুধিষ্ঠির—তথাস্তু। আমি তাই করছি। আমার যত শক্তি, যে পুণ্যফলে আজ আমি স্বর্গে আসতে পেরেছি, সে শক্তি আমি কুকুরকে অর্পণ করছি।

যুধিষ্ঠির তখন পিছন ফিরে দেখে কুকুর নেই।

ধর্ম— নিজেই কুকুর সেজে যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করছিলেন। এবার তিনি

নিজেররূপ ধারণ করে যুধিষ্ঠিরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন "বৎস তোমার মত ধার্মিক পৃথিবীতে আর কেউ নেই। তাই একমাত্র তুমি স্বশরীরে স্বর্গে যাবার অনুমতি পেলে। আজ তুমি মুক্ত হলে। তারপর ইন্দ্রের রথে করে যুধিষ্ঠির স্বর্গে এসে উপস্থিত হলেন।

আধ্যাত্মিক রহস্য ঃ

যুধিষ্ঠিররূপ জীবাত্মা সাধনচতুষ্ঠয় সম্পন্ন হইয়া সদ্‌গুরুর আদেশে বিদেহ মুক্তিলাভে প্রস্তুত হইলে বিদ্যাপ্রকৃতি দ্রৌপদী, সহদেবরূপী চিত্ত, নকুলরূপী মন, অর্জুনরূপী বুদ্ধি এবং ভীমরূপী অহংকার ইহারা সকলেই সঙ্গে চলিলেন। এই সাধন চতুষ্ঠয়ের অর্থ হইতেছে যে, "আদৌ নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ পরিগণ্যতে। ইহামূত্র ফলভোগ-বিরাগস্তদনন্তরম্।। শমাদি ষট্ সম্পত্তি' মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবং রূপো বিনিশ্চয়ঃ।। সোহয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ।।

প্রথম সাধন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, দ্বিতীয় ইহামূত্র ফলভোগ বিরাগ তৃতীয় শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা শ্রদ্ধা, সমাধান এই ষট্ সম্পত্তি এবং চতুর্থ মুমুক্ষুত্ব। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা এই প্রকার যে নিশ্চয়তা তাহার নাম নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক। দেহাদি ব্রহ্ম পর্যন্ত ভোগ্য বস্তুই অনিত্য এই প্রকার দোষ দর্শন করতঃ ঐহিক, পারত্রিক ভোগ্য বিষয় সমূহ হইতে যে বিরতি তাহার নাম ইহামূত্র ফলভোগ বিরাগ। মনের লক্ষ্যবিষয়ে যে নিয়ত অবস্থান তাহার নাম শম। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া স্ব স্ব অবস্থায় স্থাপনের নাম দম। যে বৃত্তিবিশেষের দ্বারা নিগৃহীতকর্মেন্দ্রিয়গণের পুনরায় বিষয়ের প্রতি-গতি নিরুদ্ধ হয়, তাহার নাম উপরতি। প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া, চিন্তা ও বিলাপ পরিহার পূর্বক সমস্ত প্রকার দুঃখ সহনই তিতিক্ষা। সত্যতা বোধে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের যে আধারণ তাহাকে শ্রদ্ধা বলা হয়। ইহার দ্বারা আত্মবস্তুর উপলব্ধি হয়। নির্মল বিশুদ্ধ ব্রহ্মপদার্থে যে চিত্তকে স্থাপন করিয়া রাখা তাহার নাম সমাধান। এই অবস্থায় চিত্তের বিষয়ান্তরে পরিচালনা থাকে না। আত্মস্বরূপের অবরোধ দ্বারা অহংকারাদি দেহান্ত পদার্থে অজ্ঞান জনিত "মম" ইত্যাদিরূপ যে বন্ধন আছে, তাহার পরিত্যাগের ইচ্ছাকে মুমুক্ষুতা বলে।

জীবরূপী যুধিষ্ঠির এই সংশোধিত অন্তঃকরণ ও বিদ্যাপ্রকৃতির সাহায্যেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বা মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু অন্তঃকরণ দূরের কথা জীবত্ব থাকিলেও যে মুক্তিদ্বার বন্ধ—এ কথা জীব যুধিষ্ঠির জানিতেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপী সদ্‌গুরুর প্রেরণায় তিনি যে মুক্তিলাভ করিতে চলিয়াছেন তাহা তিনি জানিতেন। তবুও সঙ্গে করিয়া লইতে যে বাধা দেন নাই তাহার

কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, যাহার যতদূর অধিকার সে ততদূর সঙ্গে যাক। তাহাতে আর ক্ষতি কি? অধিকার শেষ হইলেই সঙ্গ ছাড়িতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহারা শোধিত অর্থাৎ রজঃ, তমঃ মলহীন সাত্ত্বিকাংশ। তাই জীবত্বের সমাধান পর্যন্ত ইহাদের অধিকার। ইহারাই জীবত্ব শিবত্বের ব্যবধান রেখা। যাহা হউক কিছুদূর গিয়া বিদ্যাপ্রকৃতি দৌপদীর অধিকার শেষ হইল। তিনি আর যাইতে পারিলেন না। কেন যাইতে পারিবেন? জীবের স্বরূপ অনুভব হইয়াছে। আর কি তপস্যা থাকিতে পারে? সেই কারণে লয় হইল। এতদিন জীব সাধক অবিদ্যা নাশের জন্য বিদ্যাপ্রকৃতির (তপস্যার) আশ্রয় লইয়া স্নান, দান, তপস্যা, ধ্যান, জপ, তীর্থ পর্য্যটনাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধ করিয়াছেন। অর্থাৎ চিত্তের মলিন বাসনার নাশ এবং পবিত্র বাসনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পরে যখন সবিকল্প সমাধিতে জাগ্রতের স্বরূপ দর্শন করিলেন মন তখন নির্বিকল্প সমাধির আশায় ছুটিল। তখন বিবেক প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ বিদ্যাপ্রকৃতির কর্ম শেষ। তপস্যার বিধিনিষেধ বা কর্মানুষ্ঠান আর থাকিতে পারে না। এই কর্ম দুই প্রকার। সকাম ও নিষ্কাম। প্রাণকর্মই প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম। এছাড়া যত প্রকারের কর্ম আছে সবই সকাম কর্ম। প্রাণকর্মের অভ্যাস করিতে করিতে প্রথমে চিত্তশুদ্ধি হয় ও পরে ভক্তিলাভ হয়। তখন ভগবানের নামে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয় এবং প্রকৃত নাম আপনা-আপনি হইয়া থাকে। প্রাণকর্ম করিতে করিতে যখন প্রাণ কূটস্থে আটকাইয়া থাকে তখন ইচ্ছারহিত অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। আর মনের সংকল্প বিকল্প থাকে না। ফলে কর্মের বাসনাও থাকে না। কর্ম করাও আর সম্ভব হয় না। তাই জীবাত্মারূপী সাধক যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অবস্থা। তখন বৈরাগ্য বিচারের দ্বারাই আত্মলাভ বা মুক্তিলাভ হইতে পারিবে। তাই বিদ্যাপ্রকৃতি (দ্রৌপদী) সঙ্গ ছাড়িলেন।

জীবরূপী যুধিষ্ঠির এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয় দুঃখিত হইল। যে সহধর্মিণীর সাহায্যে সাধক আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছে, তাহাকে ছাড়িতে কষ্ট হইল। কি করিবে? —বহু জন্মের যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীব মুক্তিরূপ বিশ্রাম লালসায় ছুটিয়াছে। সে থামিল না—চলিতে লাগিল। আরও কিছুদূর গিয়া অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা সহদেবরূপীচিত্ত অধিকার শেষ হওয়ায় সঙ্গ ছাড়িল। যাইতে পারিল না। কেন পারিবে? জীবসাধকের অনুসন্ধানবৃত্তি বস্তুলাভের পরেও কি থাকিতে পারে? বাসনারূপ খাদ্য পাইল না, বিশ্বদৃশ্য অনুভব করিবার কর্ম পাইল না। কি লইয়া থাকিবে? জীব (সাধক) নিজ সত্তা বুঝিয়াছে। বিশ্বদৃশ্য মিথ্যা, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আর কি চিত্তনাশ হইতে বাকী থাকে? জীব সাধক দুঃখিত হইল। কারণ অনুসন্ধিৎসু সাধক চিত্তের সাহায্যেই আত্মানুভব করিয়াছে। পূর্বেই তো শ্রবণ, মনন বা তপস্যা প্রভাবে মলিন বাসনার নাশ হওয়ায় চিত্ত ক্ষীণ হইয়াছিল।

মাত্র কয়েকটি পবিত্র বাসনাকে আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়াছিল। তাও যখন গেল, তখন চিত্ত আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। বৃত্তিহীনচিত্ত অসম্ভব। কাজেই সে সত্তামাত্রে লয় হইল। নদী পার হইলে যেমন তরণীর উপর বিশেষ মায়া থাকে না, সেইরূপ জীবসাধক মুক্তির আলোক লক্ষ্য করিয়াই চলিতে লাগিল আরও কিছুদূর আগ্রসর হইয়া সদা তরঙ্গশীল, অসীম, গভীর কূলহীন সমুদ্রের ন্যায় নকুলরূপী মন আর যাইতে পারিল না। সে তাহার স্থূলদেহ ত্যাগ করিল। কেন যাইতে পারিবে? জীবসাধকের আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান। সে আরও জানিয়াছে যে—

"তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ
মনসা প্রাপ্যতে হ্যাত্মা হ্যাত্মাপত্তা নিবর্ততে।।"

—(মৈত্রায়ণী উপনিষদ্)

তপসা দ্বারা সত্ত্বগুণ লাভ হয়। সত্ত্বের দ্বারা মনকে পাওয়া যায়। মনস্থির হইলে আত্মাকে পাওয়া যায়। আত্মাকে লাভ করিলে সংসারগতি নিবৃত্তি হয়।

মচ্চিন্তনং মৎকথন মন্যোণ্যাং মৎপ্রভাষণম্।
মদেক পরমোভূত্বা কালং নয় মহামতে।। (বরাহোপনিষদ্)

—হে ধীমান তুমি আমাকে (আত্মাকে) চিন্তা কর। আমিই (আত্মাই) একমাত্র পরতত্ত্ব। এইরূপ জানিয়া কালযাপন কর। এইরূপ অভ্যাসই মুক্তির কারণ। তাই জীবরূপী সাধক যুধিষ্ঠর আরও বুঝিয়াছেন যে এই বিশ্বদৃশ্য মিথ্যা। ত্যাগ গ্রহণ দুইই ভ্রান্তি। কাজেই সংকল্প বিকল্পাত্মক নকুলরূপী মন আর কি থাকিতে পারে? সেই কারণে লয় হইল! লয় হইল এইজন্য যে স্পন্দনই যেমন তরঙ্গের অস্তিত্ব, চঞ্চলতাই তেমন মনের অস্তিত্ব। সংকল্প বিকল্পই তার আত্মা। কিন্তু জীবসাধকের বাসনাই নাই, কাজেই কর্মও নাই। এই অবস্থায় সংকল্পই বা থাকে কি করিয়া? কারণ বিশ্বদৃশ্য মিথ্যাবোধ হওয়ায় ত্যাগ, গ্রহণ ব্যাপার শেষ হইয়াছে এবং করিব, করিব না, ইত্যাকার সংকল্পও গিয়াছে। পাইবার হইবার বা দেওয়ার নেওয়ার ইত্যাদি সব নষ্ট হইয়াছে। কাজেই মন আর থাকিতে পারে না। একে তো সে মূলেই নাই। রৌদ্রে মরীচিকা ভ্রান্তির ন্যায় যে অস্তিত্বটুকু অজ্ঞান দৃষ্টিতে ফুটিয়াছিল, সম্যকদর্শনের ফলে (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) তাহা লয় হইয়া গেল। জীবসাধক ছুটিয়াছে রূপদর্শনে—পতঙ্গের ন্যায়, সমুদ্রগামী নদীর ন্যায় সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নিজসত্তা মাত্র লইয়াই ছুটিয়াছে। আরও কিছুদূর গিয়া অর্জুনরূপী প্রকাশশীল বুদ্ধির অধিকার শেষ হইল। সে আর সঙ্গে যাইতে পারিল না। কেন পারিবে? তাহার প্রকাশকারিণী সাধনা গিয়াছে। তাহাকে যাহারা বিষয় আস্বাদন করাইত সেই চিত্ত, মন গিয়াছে। এদিকে বৈরাগ্য শিশিরপাতে তাহাকে সঙ্কোচ করিয়া দিতেছে। কাজেই অন্তঃসারশূন্য নির্বিষয় হইয়া সে কারণে লয়

হইল। লয় হইল এইজন্য যে, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বিষয়ের নিশ্চয় করা তাহার কাজ। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইল মনের। চিত্তকে ডাকিয়া দেখাইল। চিত্তস্মৃতির সাহায্যে পূর্ব-দৃষ্ট সাপের লক্ষণের সহিত বর্তমান ভ্রান্তি (দৃষ্টির) দৃষ্ট সাপের লক্ষণ মিলাইতে এবং ভাবিতে লাগিল—তাই তো সাপ না অন্য কিছু। ঘটনা বুদ্ধির নিকট পৌছাইল। সে জানাইয়া দিল নিশ্চয় সাপ। অমনি অহংকার—আমি সাপের মুখে পড়িয়াছি ভাবিয়া হৃৎকম্পাদি উপস্থিত করিল। কিন্তু এখন মন নাই, চিত্তনাই ভ্রমদৃষ্ট সর্প অর্থাৎ জগৎ নাই। বুদ্ধি কিসের নিশ্চয় করিবে? দ্রষ্টা আত্মা যখন মনঃকল্পিত বিষয় দর্শনকরতঃ ঐ বুদ্ধিরূপ চশমার মধ্য দিয়াই দেখিত তখন বুদ্ধি তাহাতেই চেতনবৎ থাকিত! চোখে দৃষ্টিশক্তি থাকিলে চশমারও যেমন দর্শনশক্তি আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দৃষ্টিহীনের চোখে চশমাও অন্ধ তেমনি বুদ্ধি তো জড়। এখন জীবসাধকের বিষয়ভ্রান্তি সরিয়া গিয়াছে। সে বিষয়দর্শন ছাড়িয়া স্বরূপদর্শন করিতে লাগিয়াছে। কাজেই বুদ্ধি পৃথক অস্তিত্ব লইয়া থাকিতে পারিল না। বিবেক মিশিয়া গেল।

জীব সাধক যুধিষ্ঠির এইবার শূন্যময় দেখিতে লাগিল। তবুও চলার বিরাম নাই—চলিয়াছে। কিন্তু এইবার আরও সর্বনাশ—ভীম কর্ম অসীম শক্তিসম্পন্ন। ভীমরূপী অহংকার তার বিরাট দেহ ত্যাগ করিলে সে আর যাইতে পারিল না। ষষ্ঠিহীন অন্ধের ন্যায়, বায়ুহীন অগ্নির ন্যায় পতিহীনা নারীর ন্যায় সে অবলম্বনহীন হইয়া কি করিয়া থাকিবে? বুদ্ধিই যে তাঁর আশ্রয়—কাজেই কারণে লয় হইল। জীব সাধক বড় অধীর হইয়া উঠিল—কারণ সে যাহাদের সহায়তায় ধর্মলাভ করিয়াছিল, যাহাদের সাহায্যে শম, দম, তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা সমাধান এই ষট্‌সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল, যাহাদের অবলম্বন করিয়া সাধন সংগ্রামে কামক্রোধাদি দুর্জয় ষড়রিপু জয় করিয়া মুক্তিপথ আবিষ্কার করিয়াছে সেই সব উপকারী বন্ধুগণ একে একে সকলে ছাড়িয়া গেল। তাই অধীর হওয়ারইতো কথা। জগৎ মিথ্যা হইলেও জীব তাহাকে সত্যজ্ঞানে কত জন্ম যে ভোগ করিয়া আসিয়াছে, অনাত্মীয় হইলেও তাহাদের পরমাত্মীয় মনে করিয়াছে, তাহাদের সহিত কতজন্ম সম্বন্ধ পাতিয়াছে—সেই সম্বন্ধত্যাগ কালে সাধকের এইরূপ ভীতিভাব আসে। তাৎপর্য এই যে, অহংকার তো অস্বডিম্ব অর্থাৎ কিছুই নয়। চৈতন্য সম্বন্ধযুক্ত ঐ মন, চিত্ত-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যাহা করে যাহা দেখে, যাহা শুনে জীবসংযুক্ত ঐ অহংকার তাহাদের দেখায়, শুনায় ও করায়। আমি কর্তা, আমি দ্রষ্টা, আমি শ্রোতা, আমি বক্তা ইত্যাদি অহংকার করে। কাজেই যখন মন, চিত্ত, বুদ্ধি ছাড়িয়া গেল তখন অহংকার একমূহূর্ত কি আর থাকিতে পারে? রৌদ্র না থাকিলে যেমন মরীচিকার অস্তিত্ব অসম্ভব তেমনই চৈতন্যহীন অহংকারও অসম্ভব। কাজেই তাহার আর পৃথক অস্তিত্ব রহিল না।

সাধক মহাপ্রস্থানে বিরাম দিলেন না। এখন সঙ্গে কেহ নাই, আছে সাধকের সাধন সঞ্চিত কর্মফল। এই সেই কুকুর, মহাভারতের ছদ্মবেশী ধর্ম। সাধকের দান, ধ্যান, তীর্থপর্যটনাদি যাবতীয় সৎকর্মের ফল। তিনিই ধর্ম। অহং স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়াও সূক্ষ্মরূপে ঐ ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছে। কাজেই জীব সাধকের আমি পুণ্যকর্মা বা ধার্মিক এই বোধ আছে। সুতরাং মুক্তিদ্বার বন্ধ। মহাভারতে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, রাজা কুকুর লইয়া স্বর্গে যাইতে পারেন না। এখানে মুক্তি অধিপতি ঈশ্বর আসিয়া বলিলেন যে ঐ ধর্মরূপী কুকুর সঙ্গে থাকিলে মুক্তি হইবে না। সাধক জীব তখন শিবত্বে সমাসীন। সে প্রকৃতি মুক্ত হইয়াছে। কাজেই বন্ধন-মুক্তিও যে ভ্রান্তি একথা বুঝিয়াছে। কেবল আত্মা চিরমুক্ত। তাহার কোনকালে বন্ধন নাই। এক চৈতন্যই মাত্র বিদ্যমান। দ্বৈত কোন কালেই নাই। সুতরাং মুক্তিদাতাই বা কে? আর গ্রহীতাই বা কে? এইরূপ বিচারে সাধক সানন্দে নিজ সঞ্চিত কর্মফলসহ মুক্তি ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। আর মুক্তি পিপাসা রহিল না। কাজেই অহংকে বাধ্য হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইতে হইল। মুক্তিই আত্মার স্বরূপ বা স্বভাব। মুক্তি কোন কর্মের ফল নহে। সে আপনিই আপন। আরও গম্ভীরভাবে ইহার অনুশীলন করিলে বুঝা যায় যে, জীবরূপী সাধক যুধিষ্ঠির জীবত্বকে আশ্রয় করিলে—'আমি মুক্ত হইব' এই মাত্র শুধু তার অবলম্বন থাকে। কিন্তু বিষের কণামাত্রও অপকারী। এই অতি ক্ষীণ মুমূর্ষু অহং আশ্রিত থাকায় জীব সাধক দেখিলেন—মুক্তি দ্বার বন্ধ। কারণ ঐ দুষ্ট অহং 'আমি পুণ্যবান', 'আমি ধার্মিক' এই সংস্কার আশ্রয় করিয়াছে। ঐ ধর্মসংস্কারকেই মহাভারতে কুকুর কল্পনা করা হইয়াছে। ধর্মই জীব সাধককে মুক্তিদ্বার পর্যন্ত আনিয়াছে বটে, কিন্তু ধর্মসংস্কার থাকিতে অহংনষ্ট হয়না। কাজেই মুক্তিও হইতে পারে না। এখন জীব সাধক পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে। মুক্তি ইচ্ছাও যে ভ্রান্তি তাহা বুঝিয়াছে। তাই সাধক ধর্মসংস্কার সহ মুক্তি ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া বিদেহ কৈবল্য লাভ করিল।

কৈবল্যপদ লাভেচ্ছু ব্যক্তিকে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সাধক হইতে হইবে অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। যোগ দর্শনে আছে—"সত্ত্বপুরুষোঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যং"—সত্ত্ব এবং পুরুষের শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্য লাভ হয়। পুরুষ নিত্যশুদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতিযুক্ত অবস্থায় তাঁহাকেও গুণাদিদোষদুষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বুদ্ধির যখন পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা আসে তখন আত্মার কল্পিত অশুদ্ধি বিদূরিত হয়। এইরূপে উভয়ের শুদ্ধি সাম্য হইলেই চিদাভাসরূপ বুদ্ধিতত্ত্ব চিদ্রূপ আত্মাতে একাকার হইয়া যায়। ইহাই কৈবল্যমুক্তি। সুতরাং সর্বোত্তম সুখ।

"রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোহয়মিত্যুক্তঃ স কেবল ইতি স্মৃতঃ।।"

প্রাণায়ামাদি সাধন করিতে করিতে বিনা আয়াসে রেচক ও পূরক অর্থাৎ শ্বাস

ও প্রশ্বাস স্থির হইয়া যায়। ইহাই "কেবল প্রাণায়াম"। ইহা দ্বারা প্রাণবায়ুকে শিরে ধারণ করিলেই কৈবল্যপদ লাভ হয়। সকলেই জ্ঞাত আছে যে শিব গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়া আছেন। এই প্রাণরূপিণী গঙ্গাকে যিনি শিরে ধারণ করিতে পারেন তিনিই শিব। সাধক যুধিষ্ঠিরকে শিবত্বে সমাসীন হইতে হইয়াছিল। তবেই সে বুঝিয়াছিল বন্ধন-মুক্তি ভ্রান্তি। আত্মা চিরমুক্ত। একমাত্র চৈতন্য বিদ্যমান। সুতরাং শিবত্বে স্থিতি বা কৈবল্যপদ লাভ করিতে হইলে সাধককে কেবল কুম্ভক অবলম্বন করিতে হইবে। রেচক পূরকের সাহায্য না লইয়া সুখে বা সহজে যে প্রাণবায়ুর নিরোধ হয় তাহাই কেবল কুম্ভক। প্রাণক্রিয়াদ্বারা প্রাণ স্থির হইলে তখন যে স্বাভাবিক স্থিরতা লক্ষিত হয়, সে সময় আর রেচক পূরকের কার্য থাকে না। তাহাই কেবল কুম্ভকের অবস্থা। গুরুর নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া অপানবায়ুকে মূলাধার হইতে মস্তক পর্যন্ত আকর্ষণ ও প্রাণবায়ুকে মূলাধার পর্যন্ত বিসর্জনরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে প্রাণ ও অপান একত্র মিলিত হইয়া মস্তকে স্থির হইয়া যায় অর্থাৎ পূরক ও রেচকদ্বারা পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতে করিতে বিনা আয়াসেই এই উভয় বায়ুর গতিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন যে কুম্ভক হয় তাহাই "কেবল কুম্ভক"।

"প্রাণগতে যথা দেহঃ সুখে দুঃখে ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রমেবসেৎ।" (যোগবাশিষ্ঠ)

অর্থাৎ প্রাণ চলিয়া গেলে দেহে যেমন সুখদুঃখের অনুভব থাকে না, তেমনি দেহে প্রাণ থাকিলেও যাহার সুখদুঃখের অনুভব নাই, তিনিই কৈবল্যপদে প্রতিষ্ঠিত।

উপদেশাবলী

পরমপূজ্যপাদ স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজ বলিতেন—ক্রিয়ার তিনটি অবস্থা—প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ। এই তিন অবস্থায় সাধককে তিনটি গ্রন্থিভেদ করিতে হয়। জিহ্বা গ্রন্থি ভেদ হইলে প্রবর্তক অবস্থা। হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইলে সাধক অবস্থা এবং মূলাধার গ্রন্থি ভেদ হইলে সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত ক্রিয়াযোগ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে সাধক এই তিন অবস্থা বুঝিতে পারে। প্রবর্তক অবস্থায় প্রাণায়ামের কর্ম করিতে করিতে শ্বাসপ্রশ্বাস গতির বিচ্ছেদ হয়। এই ধরণের মনঃসংযম প্রবর্তক অবস্থায় হয়। এই সময় সাধকের জিহ্বা আলজিহ্বার নীচ দিয়া তালু গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ জিহ্বার অবস্থিতিই জিহ্বাগ্রন্থিভেদের সর্বস্ব নহে। বাহ্যদৃষ্টিতে জিহ্বাকে কৌশলে এই অবস্থায় লইয়া গেলে অনেকে ইহাকে জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ মনে করেন। কিন্তু আসলে এই গ্রন্থিভেদ তাহা নহে। জিহ্বার এই অবস্থিতিকে অন্যকথায় খেচরী মুদ্রা বলা হয়। শাস্ত্রে এই খেচরী মুদ্রা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"দৃষ্টি স্থিরো যত্র বিনাবলোকনম্।
মনঃস্থিরো যত্র বিনাবলম্বনম্,
বায়ু স্থিরো যত্র বিনাবরোধনম্।
সা এষ মুদ্রা কথিতা তু খেচরী।।"

এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ অবস্থা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। সাধক এই অবস্থায় ক্রিয়া করিতে করিতে নানা ধ্বনি শুনিতে পায়। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার রবের মত ভ্রমর গুঞ্জন এবং দীর্ঘ ঘন্টা নিনাদ বৎ শব্দ শ্রুত হওয়ায় সাধক আত্মহারা হয়। ইহাই প্রণবধ্বনি—অনাহত নাদ। এই শব্দ অনাহত পদ্ম হইতে উত্থিত হয়, হৃদয় হইতে উত্থিত হয়। ইহাই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ। সর্বশেষে এই শব্দ "ওম্" এই ধরণের শ্রুত হয়। ইহাতে সাধকের মন পূর্বাপেক্ষা আরও সংযমের দিকে অগ্রসর হয়। তখন সাধক প্রায়ই জাগতিক বিষয় হইতে আনমনা হইয়া উদাসীনবৎ থাকেন। এই সময়ে সাধকের শূদ্রত্বের মোচন হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তাই শাস্ত্রে বলা হয় যে—শূদ্রের প্রণবে অধিকার নাই। এই অধিকার সাধনা দ্বারা লাভ করিতে হয়। "ওম্" এই শব্দ মুখে হাজার বার উচ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সাধনার দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে এই স্বতঃ স্ফূর্ত নাদ আপনাআপনি শ্রুত হয়। এই শব্দকে নানা সম্প্রদায় নানাভাবে গ্রহণ করেন। শৈবেরা এই শব্দকে বলেন ব্যোম নাদ, বৈষ্ণবেরা বলেন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি। তাহা ছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায় এই শব্দকে বিভিন্ন

নামে আখ্যাত করেন। ইহা সাধকের নিজ বোধ রূপ। সাধন দ্বারা ইহা অনুভূত হয়।

সিদ্ধ অবস্থায় সাধককে মূলাধার গ্রন্থি ভেদ করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে সাধককে গুরুনির্দিষ্ট সুকৌশল অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠান পর্যন্ত বক্রগতি থাকার জন্য সাধককে এই গ্রন্থি ভেদ করিতে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হয়। অবিচল অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সাধক এই গ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হয়। এই গ্রন্থি ভেদ হইলে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইয়া আজ্ঞাচক্র তথা সহস্রারস্থিত কূটস্থ ব্রহ্ম পুরুষোত্তমের সহিত মিলিতা হন। তখন সাধক তাঁহার ক্ষুদ্র সত্তা হারাইয়া অনন্ত সত্তায় এক অপূর্ব আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থাকেন। ইহাই সাধকের সমাধি বা পূর্ণ সিদ্ধাবস্থা।

আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের আরো কিছু অমৃতময় কথা এইবার সন্নিবেশিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

১। হে মুক্তিপথযাত্রী! তোমরা নর্দমার কীট নও। তোমরা মানুষ!! অসীম তেজের দ্বারা তোমরা নিজেদের তৈরী করো। চলার পথে ছন্দপতন ঘটিও না। সিংহ বিক্রমে এগিয়ে চলো। এই সংসার বাসা ঘর। একদিন সকলকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। এনিয়ে বেশী মাতামাতি করো না। জন্মাবার সময় তোমরা কাঁদতে কাঁদতে এসেছিলে। এবার হাঁসতে হাঁসতে চলো। সবার আগে ঈশ্বর লাভ কর। লাহিড়ী বাবার ক্রিয়াযোগের চাবিকাঠি দিয়ে নিজের ঘরের তালা খুল।

২। "আত্মার সাথে মিল নাই যার,
সে যদি আত্মীয় হয়।
শুধু অভিনয় আর কিছু নয়,
পলে পলে পরাজয়।।"

৩। ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও হীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হও। হে জাগ্রত প্রাণ সিংহ বিক্রমে এগিয়ে চল। আকাশে কল্পনার জাল বুনিও না। মাভৈঃ মাভৈঃ রবে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি কর।

৪। জাগ্রত সিংহ বিক্রমে একবার চেষ্টা করিলে বিশ্বে অসম্ভব কিছুই নয়।

৫। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিও, সমস্ত অভাবদূর হইবে। বাবার আদরের ছেলে যদি হয় এবং বাবার স্নেহের পাত্র হয়, তা হলে কি ছেলের অভাব থাকে?

৬। মহাকালের নিকট হইতে তোমরা মহৎ কাজের জন্যে সময় ভিক্ষা করিও।

৭। হে যুবকবৃন্দ! তোমরা "কিন্তু" এবং "যদি" কে জীবন থেকে বাদ দাও।

৮। ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিও না। ভবিষ্যতে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ নাও হইতে পারে প্রায়ই তাহা হয় না।

৯। আমরা সকলেই বিশ্বপিতার সন্তান। একই স্রষ্টার সৃষ্ট জীব। আমরা একে অপরকে অস্পৃশ্য হিসাবে দূরে ফেলিয়া রাখিব— ইহা কোনো ধর্ম্ম, কোনো নীতি সমর্থন করিতে পারে না।

১০। কু-সঙ্গ পরিত্যাগ করিও, কুলোক আর কুচিন্তা দুইটাই কু-সঙ্গ।

১১। বর্ত্তমান অশান্ত পৃথিবীকে সুন্দর করিতে হইলে সবভেদাভেদ ভুলিয়া একমাত্র মানুষকেই স্ব-জাতি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে যদি আমরা স্রষ্টার সৃষ্টি কার্য্যকে বিকাশ করিতে না পারি তবে খণ্ড খণ্ড প্রলয়ের দ্বারা সৃষ্টি ধবংস হইয়া যাইবে। ভূমিকম্প, মহামারী, জলপ্লাবন, ইত্যাদি প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য যাহা ঘটিতেছে তাহাই বিশ্বে পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইতে পারে। কাজেই সম্মিলিত চেষ্টায় মহামিলনের দ্বারা এই মনুষ্য সমাজের মহাব্যাধি (অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ) দূর করিতেই হইবে।

১২। প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি? কেন করিতেছ? তাহা বিচার কর।

১৩। সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া কর্ম্ম না করিলে তাহা হস্তি স্নানবৎ হয়।

১৪। "ভুলের মাশুল দিতে হবে সবে,
হউক যত বলিয়ান।
ভুলের হস্তে পড়েছে যে জন,
নাহি তার পরিত্রাণ।।"

১৫। তোমরা দুর্বল নও, ভীরু নও। তোমরা সেই বিরাটে অংশ। তোমরা নিজেদের সত্তাকে উপলব্ধি করো। বিরাটের পথে যাত্রা করো। এইহোক তোমাদের সাধনা।

আমার পরমগুরুদেব পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ সাধনক্ষেত্রে প্রবর্তক ও সাধক অবস্থা সম্বন্ধে যে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

।। প্রবর্তক অবস্থা ।।

১। বহ্নিতত্ত্ব অর্থাৎ তেজের মঙ্গলময় শক্তিতে যে কৃষ্ণবর্ণ স্থির বিদ্যুৎময়ী মূর্তি রাধিকার বক্ষঃস্থলে প্রকাশিত হন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ তেজের সত্ত্বগুণে জাত শারীরিক বিদ্যুৎ স্থিরভাবে পুঞ্জীভূত হইয়া দীপশিখার মত ভ্রূমধ্যে প্রকাশ পায় (রাধা) এবং পরক্ষণে সেই বিদ্যুৎ মূর্তির মধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণ গোলক প্রকাশ পায়, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ। ইহাতে স্থিত চৈতন্যই কূটস্থ চৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণ

চৈতন্য। ঐ কূটস্থ চৈতন্যের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত আছে।

২। সদ্‌গুরুর উপদেশ ভেদজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়া কূটস্থ চৈতন্য (শ্রীকৃষ্ণ) সহায় হইলে মনোজাত বৃত্তিসমূহ এই শরীরে কি করিতেছে তাহা দেখিবার জন্য মন আপনার প্রজ্ঞাদৃষ্টি ব্যবহার করে।

৩। মন প্রজ্ঞাদৃষ্টি দ্বারা দেখেন সংসার ব্যতীত কখনই কেহ কার্যক্ষম হইতে পারে না। বৃত্তি সকল এই সংস্কার দ্বারাই শিক্ষিত হয়।

৪। যাঁহারা জড়জগৎকে ভ্রম বিবেচনা করিয়া দেহকে পৃথক করিয়া কেবল আত্মচৈতন্যে অবস্থান করেন এবং যাঁহারা এই সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিয়া আপনাকে বিশ্বব্যাপী অনুভব করেন তাঁহারা কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন।

৫। কর্ম শুভই হোক বা অশুভ হউক, এককালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নিঃশেষ না হইলে জীবের মুক্তি হয় না।

৬। কর্মের সংস্কার ও কল্পনা মিলিত হইয়া বাসনার উদয় হয়। কর্ম সংস্কারবশতঃই জীবকে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়।

৭। বাসনার দ্বারা জীব শরীর পুনঃ সৃষ্টি হয়। এমনকি কল্পান্তেও ইহার বিনাশ নাই। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে এই বাসনা থাকা হেতুই এই জগৎ প্রকাশিত।

৮। মূলাধার স্থিত পৃথ্বিতত্ত্ব হইতে মত্তভৃঙ্গের ন্যায় প্রণব ধ্বনি অনুভূত হয়। তাহাতে সাধকগণ বুঝিতে পারেন সংযতাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ইহা সবিতর্ক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

৯। স্বাধিষ্ঠান স্থিতজলতত্ত্ব হইতে বেণুর ন্যায় প্রণবধ্বনি অনুভূত হয়। ইহা সবিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির লক্ষণ।

১০। মণিপুরস্থিত বহ্নিতত্ত্ব হইতে বীণার ন্যায় প্রণবধ্বনি অনুভূত হয়। ইহা সানন্দ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

১১। অনাহত পদ্মস্থিত ক্রিয়ান্বিত বায়ুতত্ত্ব হইতে দীর্ঘ ঘন্টার ন্যায় প্রণবধ্বনি অনুভূত হয়। এই প্রণবধ্বনিতে সমস্ত অন্তঃকরণ বৃত্তির লয় হইয়া কেবল অহংকার অবশিষ্ট থাকাতে ঈশ্বরবাচক প্রণবধ্বনি অনুভূত হয়। ইহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় আরোহণ।

১২। সুষুম্নার অন্তর্গত ব্যোম তত্ত্ব হইতে মেঘগর্জনের ন্যায় প্রণবধ্বনি উত্থিত হয়। ইহাতে অস্মিতা বিলীন হইয়া সমস্ত বিশ্বময় অনুভূত হয়। ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবস্থান। তখন মত্তভৃঙ্গ, বেণু, বীণা, দীর্ঘঘন্টা এবং মেঘগর্জন এই পাঁচ প্রকার শব্দ একত্র হইয়া সেই সব প্রকাশক কূটস্থ চৈতন্য হইতে একটি অনির্বচনীয় প্রণবের ঝংকার উঠিতে থাকে।

১৩। মস্তিষ্ক অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মই পূর্ণ চৈতন্য স্থান। ঐ মস্তিষ্কের নিম্নে

এবং মেরুদণ্ডের উপরে ভ্রূমধ্যে একটি কূর্মাকার নাড়ী আছে। ঐ কূর্ম নাড়ীতে সংযত হইলে তৎক্ষণাৎ চাঞ্চল্য নষ্ট হইয়া স্থির জ্যোতি বিরাজিত হয়। ইহা দ্বিদল বিশিষ্ট আজ্ঞা চক্র। মন এই পথ দিয়া সুষুম্নামধ্যে প্রবেশ করে। ইহা সুষুম্নার দ্বার স্বরূপ।

১৪। ঐ কূর্ম নাড়ী লম্বভাবে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া গুহ্যদেশ পর্যন্ত একটি দড়ির ন্যায় অবস্থিত আছে। ইহাকে সুষুম্না বলে। ইহার বামপাশে ঈড়া এবং ডানপাশে পিঙ্গলা নামক দুইটি মহাবলশালী নাড়ী মেরুদণ্ডের দুইদিকে গুহ্যদেশ হইতে চক্ষুদ্বয়ের পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই দুইটি নাড়ীস্থিত চৈতন্য দ্বারা রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক, বাহ্যপদার্থ গ্রহণ, মলমূত্রাদি ত্যাগ, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ উভয় চৈতন্যই সুষুম্নাস্থিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র।

১৫। সুষুম্নার নিম্নভাগে আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রিতা থাকাতে পূর্বোক্ত রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কার্য জীবের আয়ত্তে নহে।

১৬। মন এই সুষুম্নার স্বরূপ দ্বিদলপদ্মে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সম্মুখভাগেই অবস্থান করে। সেইজন্য শরীরের পশ্চাৎভাগস্থিত সুষুম্না হইতে উদ্ভূত ষাট হাজার নাড়ীই জীবের আয়ত্তে নহে। উহারা আপন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে এবং সম্মুখভাগের কয়েকটি নাড়ীকেই কেবল জীব ইচ্ছামত চালনা করিতে পারে। সেইজন্য পশ্চাৎভাগকে পুরুষ এবং সম্মুখভাগকে প্রকৃতি বলে।

১৭। প্রকৃতি জীব চৈতন্যকে আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করে। জীব চৈতন্যকে কোন কারণে দুর্বল পাইয়া আচ্ছাদন করিতে প্রকৃতি সংস্কার শক্তির দ্বারা উপযোগী স্থানে আকৃষ্ট হইয়া জীব চৈতন্যের সহিত পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম চৈতন্যের অংশ জীবকে প্রকৃতির অধীন হইয়া জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি দ্বারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

১৮। সদ্‌গুরুদত্ত সাধন ক্রিয়া দ্বারা মন অনুস্বরূপে দ্বাররূপ আজ্ঞাচক্র পার হইয়া সুষুম্না মধ্যে প্রবেশ করিলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন। সুষুম্না ক্রিয়ার বিভিন্নতার জন্য পাঁচ প্রকার ক্রিয়ায় পাঁচটি বিভাগ ক্রমশঃ পদ্মের ন্যায় চক্রাকারে প্রকাশ পায়। গুহ্যদেশ চতুর্দল পদ্মাকারে মূলাধার, লিঙ্গমূলে ষড়দল পদ্মাকারে স্বাধিষ্ঠান, নাভিদেশে দশদল পদ্মাকারে মণিপুর, হৃদয়ে দ্বাদশদল পদ্মাকারে অনাহত, কণ্ঠদেশে ষোড়শদল পদ্মাকারে বিশুদ্ধ নামক কয়েকটি চক্র আপন আপন অধিষ্ঠান পৃথ্বী, জল, বহ্নি, বায়ু, ব্যোমতত্ত্বের সহিত প্রকাশিত হইলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতাবস্থায় অনুভূত হয়।

১৯। ঐ আদ্যাশক্তি মূলাধারে জাগ্রতা হইলেই মত্তভৃঙ্গের ন্যায় প্রণবধ্বনি উঠিয়া সমাহিত অবস্থা আনয়ন করে এবং ঐ চক্রভেদ করিয়া স্বাধিষ্ঠানে উপস্থিত হইলে বেণুর ন্যায় শব্দ হয়। এইরূপে অপরাপর চক্র স্পর্শ করিয়া প্রণবধ্বনির বিভিন্নতা হইয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার বিলীন হয়। এইরূপে জীবচৈতন্য পাঞ্চ ভৌতিক দেহ হইতে পৃথক হইয়া পরিশুদ্ধ হন। ইহাই ভূতশুদ্ধি।

২০। সহস্রদলপদ্মে উপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্মচৈতন্যে মিলিত হইয়া "এই অনন্তকোটি বিশ্বই আমি" এইরূপ আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়। সুতরাং অনুভব করিবার পৃথক কোন বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায়, প্রণব জীবত্ব কিছুই অনুভব হয় না।

২১। গুরুর উপদেশমত ক্রিয়া দ্বারা সাধকগণ কূটস্থ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাংসারিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিয়া অদৃষ্টের দাসস্বরূপে নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব দ্বারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে আর ইচ্ছা থাকে না। উহা হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন, অনন্ত জ্ঞান এবং নিত্যানন্দময় ব্রহ্মে তন্ময় হইয়া অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন।

।। সাধক অবস্থা ।।

১। ভয়ানক শত্রুদল পরিবেষ্টিত দেহে অবস্থান করিয়া অজ্ঞদিগের ন্যায় চৈতন্য প্রকাশক ক্রিয়াতে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্তব্য নহে।

২। তেজে আমরা জীবরূপে অবস্থান করিতেছি। ক্রিয়া দ্বারা চিদাভাস ও সংস্কারকে নষ্ট করিবে।

৩। ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কখনও বিফল হয় না। এবং তাহাতে কোন বিঘ্নেরও সম্ভাবনা নাই। অল্পমাত্র ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আসক্তি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান করিয়া ক্রিয়া করা উচিৎ। এই সমান জ্ঞানই যোগ।

৪। পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে নাসিকার কোন পাশে না ঠেকিয়া ঠিক মধ্য দিয়া ১২ অঙ্গুলী শ্বাস বহন হয়। গলাতে মধুর রস অনুভব হয় এবং মধুর রসে আসক্তি জন্মে। কূটস্থে পীতবর্ণবিশিষ্ট চতুষ্কোণ আকার প্রত্যক্ষ হয়। মানব প্রকৃতি পরিশুদ্ধ অবস্থায় ২০ মিনিট এইরূপ বর্তমান থাকে।

৫। জলতত্ত্বের উদয়কালে নাসিকার নিম্নভাগে ১৬ অঙ্গুলী শ্বাস বহন হয়। গলাতে কষায় রসের অনুভব হয় এবং কসায় রসে আসক্তি জন্মে। কূটস্থে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট অর্ধচন্দ্র আকার প্রত্যক্ষ হয়। মানব প্রকৃতি পরিশুদ্ধ অবস্থায় ১৬ মিনিট এইরূপ বর্তমান থাকে।

৬। বহ্নিতত্ত্বের উদয়কালে নাসিকার উপরিভাগ দিয়া ৪ অঙ্গুলী শ্বাস বহন হয়। গলাতে তিক্ত রসের অনুভব হয় এবং তিক্তরসে আসক্তি জন্মে। মনে রক্তবর্ণের উদয় হয় এবং রক্তবর্ণ দেখিতে ইচ্ছা জন্মে। কূটস্থে রক্তবর্ণবিশিষ্ট ত্রিকোণ আকার প্রত্যক্ষ হয়। মানব প্রকৃতি পরিশুদ্ধ অবস্থায় ১২ মিনিট এইরূপ বর্তমান থাকে।

৭। বায়ুতত্ত্বের সময় নাসিকার পাশ দিয়া ৮ অঙ্গুলী শ্বাস বহন করে। গলাতে অম্লরসের অনুভব হয় এবং অম্লরসে আসক্তি জন্মে। মনে নীলবর্ণের উদ্ভব হয় এবং নীলবর্ণবিশিষ্ট গোলাকার প্রত্যক্ষ হয়। মানব প্রকৃতি পরিশুদ্ধ অবস্থায় ৮ মিনিট কাল এইরূপ বর্তমান থাকে।

৮। আকাশতত্ত্বের সময় নাসিকার মধ্যে শ্বাস বহন হয়। কিছুমাত্র বেগ থাকে না। গলাতে কুটরসের উদ্ভব হয় এবং কূটরসে আসক্তি জন্মে। মনে ধুম্রবর্ণের উদ্ভব হয় এবং ধূম্রবর্ণ দেখিতে ইচ্ছা জন্মে। কূটস্থে ধূম্রবর্ণের মধ্যে বিন্দু বিন্দু নানা প্রকার বর্ণ প্রত্যক্ষ হয়। মানব প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া ৪ মিনিট বর্তমান থাকে।

৯। উপরোক্ত তত্ত্বাদি দেহমধ্যে প্রধানরূপে বিরাজিত নাড়ীগণের অধিষ্ঠিত দৈবচৈতন্য ও কূটস্থ চৈতন্য, সমস্তই নিত্য পদার্থ অর্থাৎ জগতের সহিত সৃষ্টি নহে এবং প্রলয়কালে নষ্টও হয় না। এইরূপে সমানভাবে অবস্থান করে।

১০। এই ভৌতিক জগৎ সমস্তই সেই অবিজ্ঞেয় সূক্ষ্মতম পদার্থ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই লয় পায়। মধ্যে কিছুকাল প্রকাশ থাকে মাত্র। অতএব স্বপ্নবৎ প্রকৃতির বিকারজাত বৃত্তিসমূহের জন্য দুঃখ করিতে নাই।

১১। ক্রিয়ার দ্বারা বুদ্ধিস্থির হইলে সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। কর্মফল নষ্ট হওয়ায় ভোগের অভাববশতঃ ক্রিয়াবান্ মনীষী জন্মরহিত হইয়া শান্তিপদ পান।

১২। কূটস্থ চৈতন্যে চিত্ত সংযত হইলে অনুভব হয় যে, যাহারা সর্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করিয়া অপানাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, দুঃখে ক্ষোভশূন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য, সর্বপ্রকার আসক্তি, ভয়, ক্রোধবর্জিত, সর্বভূতে স্নেহশূন্য, অনুকূল বিষয়ে সন্তুষ্ট হন না, প্রতিকূল বিষয়ে অসন্তুষ্ট হন না, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে অনায়াসে তুলিয়া আত্মাতে অবস্থান করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৩। উপস্থিত দেহ নষ্ট হইলে, ঐ সমস্ত নানাপ্রকার কামনার বেগ নিবারণ না হওয়াতে জীবকে ঐ সমস্ত বেগের সমষ্টিশক্তি দ্বারা সেই ভোগের উপযোগী দেহধারণ করিতে হয়।

১৪। সঞ্চিত কামনা ভোগের জন্য জীবকে আবার এই সংসারে জন্মগ্রহণ

করিতে হয়। সুতরাং ইহার ভোগব্যতীত জীবের নিস্তার নাই।

১৫। মানসিক শুভাশুভ কর্ম অর্থাৎ কামনার বিষয় অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ভোগব্যতীত শতকোটি কল্পতেও ইহার ক্ষয় নাই। এই শুভাশুভ কর্মসকল যে পর্য্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ জীবের শান্তির বা মুক্তির উপায় নাই।

১৬। সঞ্চিত কামনাকে অদৃষ্ট বলে। কামনা পরিত্যাগের জন্য তাহার মূলস্বরূপ অনুরাগ ও বিরাগাদিবিহীন হইতে উপদেশ দেওয়া হয় এবং সঞ্চিত কামনারূপ অদৃষ্টের ভোগব্যতীত জীবের শান্তির উপায় নাই বলিয়া নিস্পৃহভাবে অর্থাৎ কোন নূতন অদৃষ্টের সৃষ্টি না করিয়া পূর্ণ সঞ্চিত অদৃষ্ট দত্ত ভোগ দ্বারা মনকে প্রকৃতিস্থ করিয়া শান্ত হইতে উপদেশ দেওয়া হয়।

১৭। যোগক্রিয়া দ্বারা কামনার উৎপত্তিস্থল রাগদ্বেষশূন্য হইলে বিভূতি প্রকাশ পাইয়া সর্বপ্রকার কাম্যবিষয়ের ভোগ সমাপণ করিয়া মনকে প্রকৃতিস্থ করিয়া শান্ত হইতে পারা যায়;এবং তাহাতে সমস্ত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থিত মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়দিগকে আপন অঙ্গের ন্যায় অনুভব করিয়া জীব বিশ্বমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, এই বিশ্বমণ্ডলস্থ সমষ্টিচৈতন্য পরমপুরুষ বা পরমাত্মার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন এই বিশ্বমণ্ডলে কেবল আপনি ভিন্ন অপর কোন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মাগণ ইহাকে কৈবল্যপদ বলিয়া উল্লেখ করেন।।

১৮। ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্তে আসে; ক্রিয়াতে মৃত্যু হইলে রোগাদির বিনা যন্ত্রণায় পরমসুখে উন্নত সংস্কার পাইয়া উত্তমস্থানে গমন করে। অতএব অনিত্য সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া নিত্যচৈতন্য প্রকাশকারী ক্রিয়াতে নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য।

১৯। ধ্যান, জ্ঞান, ত্যাগ এবং শান্তি এই চারটি যথাক্রমে সাধনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সোপান স্বরূপ। ধ্যান দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত প্রসন্ন হইলে চিত্তের স্থৈর্য্যের নিমিত্ত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এইরূপে ধ্যান ও জ্ঞান দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন এবং স্থিতিপদ লাভ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে সমস্ত পদার্থ লইয়া আমার আমার করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইতেছিলাম তাহার কোনটিই এমনকি শরীর পর্যন্ত নিজস্ব নহে, অতএব এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে আমার জীবরূপী নিজস্ব কিছুই নাই অথবা এই জগৎব্যাপী চৈতন্যরূপই আমারই সর্বস্ব। আমি না থাকিলে এ সমস্ত কিছুই থাকিতে পারে না। এ জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আমাতেই অবস্থান করিতেছে। রাজর্ষি জনক তাঁহার গুরুদেব মহর্ষি অষ্টাবক্রের জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন—

যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমনং তথা জগৎ।
অতো মম জগৎ সর্বমথবা ন চ কিঞ্চন।।

—(অষ্টাবক্র সংহিতা।। ২ প্রঃ/২।।)

—একমাত্র আমিই (আত্মাই) যেরূপ এই দেহ প্রকাশ করিতেছি, সেইরূপ এই জগতের সকল পদার্থই আমা কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে। সুতরাং নিখিল পদার্থেই আমি বর্তমান রহিয়াছি অথচ কিছুতেই সংলিপ্ত নহি।

২০। জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমস্ত কামনা এককালে ত্যাগ হয়। এইরূপে ধ্যান, জ্ঞান ও ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত সুষুম্নাস্থ হইয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করে। এই সুষুম্না শান্তিময় স্থান। ইহার দ্বারা চিত্ত প্রশান্ত হইলেই নিত্যচৈতন্য স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকে।

২১। আত্মচৈতন্যে কোন প্রকার স্পৃহা বা আসক্তির উদয় হইতে না পারাতে সেই ব্যক্তিকে কোন কর্মে লিপ্ত করিতে পারে না। যিনি আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে এইরূপ আত্মচৈতন্যস্বরূপ অবগত হইয়া জগতের সমস্ত কার্য্য স্বাভাবিক নিয়ম দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে এইরূপ বুঝিতে পারেন এবং আপনাকে সমস্ত কর্ম হইতে নির্লিপ্ত জানিতে পারিয়া স্পৃহাশূন্য ভাবে আত্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে আর কর্মতে আবদ্ধ হইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

কৃষ্ণজুর্বেদীয়শান্তিবচনম্ ঃ—

ওঁ সব নাববতু, সহনৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ব্রহ্ম আমাদের (গুরু ও শিষ্য) উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন। উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন। আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি। আমাদের উভয়ের লব্ধ বিদ্যা সফল হউক। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। শান্তি হউক, শান্তি হউক, শান্তি হউক।।

সমাপ্ত

পত্রাবলী

(১)

ওঁ তৎ সৎ—

নারায়ণ স্মরণানন্তরম্—

শ্রীমান বাবা জীবন। আশ্রমের এক খণ্ড কাপড় ভুলে তোমার কাপড়ের সহিত গিয়াছে। যখন আসিবে তখন কাপড়টী আনিবে। তোমার আশ্রমের কুশল দিও। চিঠিটী পেলে কিনা মাঝে মাঝে পত্র দিও। ভূমানন্দ অদ্য আশ্রম হইতে সবং যাইবে। ওখানকার ভক্তদিগকে আমার সাধু সম্ভাষণ দিও। বর্ত্তমান আশ্রমে জয়দেব থাকিবে। মানষিক তেজ লইয়া চলিও। বিশ্বে সকলকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিও। সকলি যে আমার প্রভু এই বোধে প্রতিষ্ঠ হইও। মাঘ মাসে একবার আসিতে হইবে। কোন সময়ে আসিবে তাহা পরে জানাইব। যাইহোক পত্র পাঠ কুশল দিও।

ইতি
শুভাকাঙ্খী
স্বামী ভবানন্দ গিরি।

(২)

১১ ভাদ্র

ওঁ তৎ সৎ—

নারায়ণ স্মরণানন্তরম্—

শ্রীমান বাবাজীবন। তোমার বইটী শ্রীগুরু পূজা যোগ সংগীত পেলাম। আমার বেশ ভাল লাগছে। অনেক ভক্ত আগ্রহ সহকারে বই লইতেছে। আমাদের মঠ মন্দিরের কার্য্য চলিতেছে। পূজার ভিতরে শিব প্রতিষ্ঠা হইবার চেষ্টা চলিতেছে। তুমি আশ্বিন মাসের প্রথম ২ একবার আসিও। কিছুদিন থাকিতে হইবে। অনেক যুক্তি পরামর্শ করিতে হইবে। এই যৌবন কালের সময় বিকাশ পাইতে হয়। বহুশক্তি তোমাদের ভীতর আছে তাহা বুঝিতে পার নাই। গুপ্ত অবস্থায় থাকে। যে বিকাশ পায় তাহার কল্যাণ সাধিত হয়। পত্রপাঠ পত্রের উত্তর দিও। সিংহ বিক্রমে গর্জ্জীয়ে উঠতে হবে। বলহীন ব্যক্তি ভগবত রাজ্যের অধিকারী নয়।

তাহারা মোহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। হে সাধক তুমি সত্য বোধে প্রতিষ্ঠা হইবার চেষ্টা করিও। পত্র পাঠ উত্তর দিও।

ইতি
শুভাকাঙ্খী
স্বামী ভবানন্দ গিরি
সাং তেলটকা
পো: সাতবাঁকুড়া
মেদিনীপুর

(৩)

নারায়ণ স্মরণানন্তরম্—

শ্রীমান বাবা জীবন। ৩রা কার্ত্তীক আমাদের মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। তোমাকে আগে থেকে আসিয়া কার্য্য ভার গ্রহণ করিতে হইবে। আমার বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে পাইবার ইচ্ছা রাখি। তুমি পঞ্চমি কিম্বা ষষ্ঠী দিন আসিও। পঞ্চ মি দিন আসিলে ভালোই হয়। পত্রের দ্বারায় নিমন্ত্রন করিলাম। আশা করি আমার ডাকে সাড়া দিলে আমি আনন্দিত হইব। পত্র পাঠ পত্র পাওয়ার সংবাদ যেন পাই।

ইতি
শুভাকাঙ্খী
স্বামী ভবানন্দ গিরি
শ্রীযুক্তেশ্বর মঠ
সাং তেলটকা
পো : সাতবাঁকুড়া
জেলা মেদিনীপুর

(৪)

ওঁ

মুক্তিপথযাত্রী ১৬.৫.৮৩
শ্রীযুক্তেশ্বর মঠ

শ্রীমৎ সাধনানন্দ বাবাজীবন, তুমি মাঝে মাঝে একবার আসিও। না আসিলে আমি কাহার মুখ দেখিয়া থাকিব। অনেক কিছু জানিবার আছে। এই বিশ্বে বিকাশ ঘটাইতে হইলে পুনঃ পুনঃ সাধু গুরুর সঙ্গ লইতে হয়। হাঁটিলে হুঁচুট

খাইতে হয়। ভাল মন্দ আহার্য্য গ্রহণে বিষম খাইতে হয়। কথা বার্ত্তায় বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। এই সব জিনিষ সাজানো আছে। তোমার দুঃখ করিবার কিছুই নাই সঙ্গ না করিলে আঘাত পাইতে হইবে। কারো প্রতি বিদ্দেশ ক্ষোভ সৃষ্টি করিও না। এইভাবে অহংকারের অধিন হইলে তোমার বিরাটের পথে যাওয়ার অন্তরায় হইবে। সৌর জগতে আসিয়া তুমি কোন আসন লইবে তাহা সাধুগুরুর কাছে জানিও। পথ ভ্রান্ত পথিক সাজিয়া ভ্রান্তির খেলা খেলিও না। পত্র পাঠ একবার আসিও তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইতেছে। এখানে বৃষ্টি হইতেছে।

ইতি
শুভাকাঙ্খী
স্বামী ভবানন্দ গিরি

(৫)

ওঁ

শ্রীমুক্তেশ্বর মঠ
চন্দ্রকোনা রোড

মুক্তিপথ যাত্রী
শ্রীমান বাবা জীবন তোমার পত্র পেয়ে আনন্দিত হলাম। মাঝে মাঝে পত্র দিয়ো— আমার শরীর মাঝে মাঝে নানা দিক দিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়— কোন রকম করে প্রভুকে ডেকে চলছি। এই বিশ্বে আসিয়া পূজারী সাজিও— স্রষ্টা সাজিয়া পূজা গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইয়ো না। এই ভাবে বিশ্বকে পূজা করিবে। যাহা যাহা নেত্র হেরে তাহা কৃষ্ণ স্ফূরে— বিশ্বটীকে কৃষ্ণময় দেখিও। গুরুজ্ঞানে পূজা করিও। যদি ভূল কর তবে অহংকার তোমাকে নর্দমায় ফেলাইয়া দিবে। বেশি আর কি বলিব। আমার উপদেশবাণী গ্রহণ করিও।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী ভবানন্দ গিরি

(৬)
ওঁ তৎসৎ

মুক্তিপথযাত্রী
শ্রীমৎ সাধনানন্দ বাবা জীবন এই বিশ্বে আসিয়া বিশ্বনাথের শরণাগত হইলে যাহা চাইবে তাহাই পাইবে। বিশ্বনাথের শরণাগতি লইবার জন্য শাশ্বত গতি

লক্ষ করিয়া চলিতে হয়। তোমার ক্রমবিকাশের পথ প্রসস্থ হইতেছে শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইতেছি। ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে যাইবার ইহাই একমাত্র পথ। চিন্ময়ী মায়ের কোলে আশ্রয় লইতে হইলে সরল সুন্দর শিশু সাজিতে হয়। এইভাবে সাজিলে মায়ের কোলে স্থান পাওয়া যায়। এই উপদেশ বাণীগুলি দিতেছি ইহা তোমার চলার পথে পাথেয়। পার যদি একবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলে আনন্দিত হইব।

ইতি
শুভাকাঙ্খী
স্বামী ভবানন্দ গিরি
চন্দ্র কোনো রোড্

(৭)
ওঁ তৎসৎ

নারায়ণ স্মরণানন্তরম্—
শ্রীমান বাবাজীবন তোমাকে একখানি চিঠি দিয়াছি বোধহয় পেয়ে থাকবে। ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার শ্রীশ্রী গুরু মহারাজের জন্মতিথি পালিত হইবে ইজমালিকে এবং ঘাটালে। আমি ঐ দিন আশ্রম হইতে ঘাটালে যাইব ওখানে আমাকে সভাপতির কাজ করিতে হইবে। ইজমালিকে দূর বলিয়া যাইতে পারিলাম না। তুমি ঘাটালে আসিয়া উক্ত সভাতে যোগাযোগ করিও। ঘাটাল ব্রীজ পার হইয়া পূর্বদিকে ঘাটাল শহরে ঢুকিবার মুখে শ্রীযুক্তেশ্বর পৌর বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল আছে। বাম পার্শ্বে পাকা বাড়ী হাইস্কুল ও আশ্রম আমি সকালে ৮টার সময় যাইব। তুমি সকালে বাহির হইয়া এই আশ্রমে আহারাদি করিবার যোগাযোগ করিও সভার কাজ তোমাকে করিতে হইবে।

ইতি
শুভাকাঙ্খী
স্বামী ভবানন্দ গিরি

(৮)
ওঁ তৎসৎ

মুক্তিপথ যাত্রী চন্দ্রকোনারোড
শ্রীমৎ সাধনান্দ বাবা জীবন তোমার চিঠি পেলাম। ঐ সঙ্গে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে দিয়ত ১০ টাকা পাইলাম। ৩রা বৈশাখ শনিবার আমার জন্মতিথি হইতেছে। তুমি ১লা আশ্রমে আসিও। শিবরাত্রীতে সকলকে আহ্বান করা হয়। জন্মতিথিতে অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে

লইয়া উৎসব পালিত হয়। তুমি অবশ্য আসিও। আমি তোমার আসায় আনন্দিত হইব। আমার শারীর মাঝে মাঝে টলমল করিতেছে।

ইতি
শুভাকাঙ্খী
স্বামী ভবানন্দ গিরি

(৯)

ওঁ তৎসৎ

নারায়ণ স্মরণানন্তরম্

মুক্তিপথ যাত্রী

শ্রীমান বাবাজীবন তোমার সাধুসেবার সাহায্যটি পেয়েছি। ২৭শে বৈশাখ শ্রীগুরু মহারাজের জন্মতিথি উৎসব পালিত হইতেছে। তোমার কাছে কেউ লোক জন যায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি যদি সুবিধা বিবেচনা কর যাইতে পার বিশেষ আর কি বলিব ওখানে যদি যাও তাহা হইলে সভাপতির কার্য্য করিতে হইবে পত্র পাঠ পত্রের কুশল দিও— রাস্তা খুব ভাল নয়। কিভাবে যাইবে আমি এখান থেকে বলিতে পারিব না। যে ওখানে যাইবে তাহার সহিত কথা বার্ত্তা বলিবে। আমার শরীর বেশ ভাল নয়—

ইতি
শুভাকাঙ্খী
স্বামী ভবানন্দ গিরি

(১০)

ওঁ তৎসৎ

নারায়ণ স্মরণানন্তরম্

মুক্তিপথ যাত্রী

শ্রীমান সাধনানন্দ বাবা জীবন, তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। সরল সুন্দর জীবনযাপন করিয়া জন্ম সার্থক করিও—

ইজমালিকে তুমি ভালোভাবে উৎসব করেছ শুনে আনন্দিত হলাম প্রবল উৎকট তাপ প্রবাহে মাঝে মাঝে শরীর বাঞ্চাল হইতেছে। পত্র পাঠ কুশল দিও। তোমার সাহায্যটি পেয়েছি।

ইতি
শুভাকাঙ্খী
স্বামী ভবানন্দ গিরি
চন্দ্রকোনা রোড।

প্রতিলিপি

পত্র নং ১

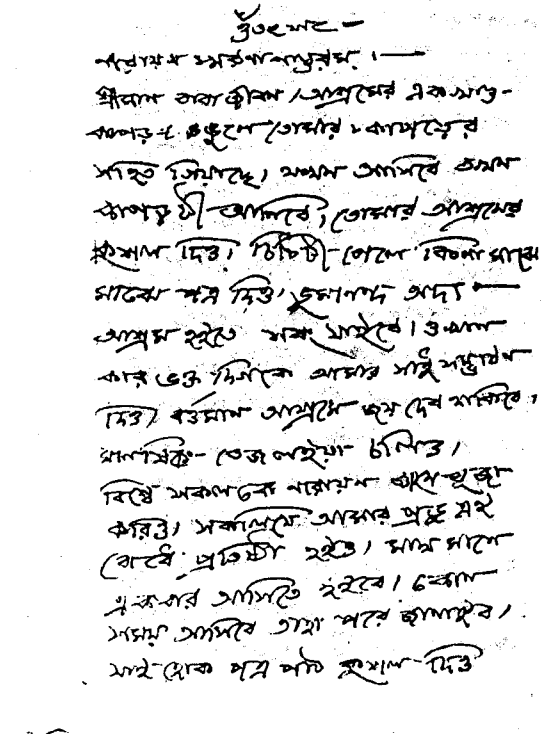

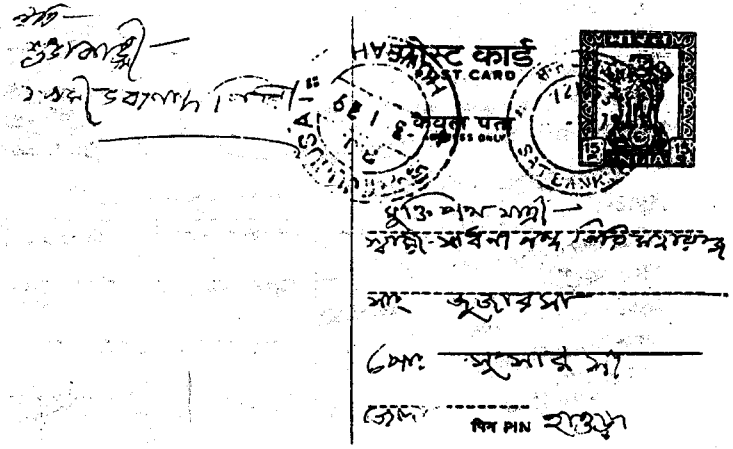

পত্র নং ২

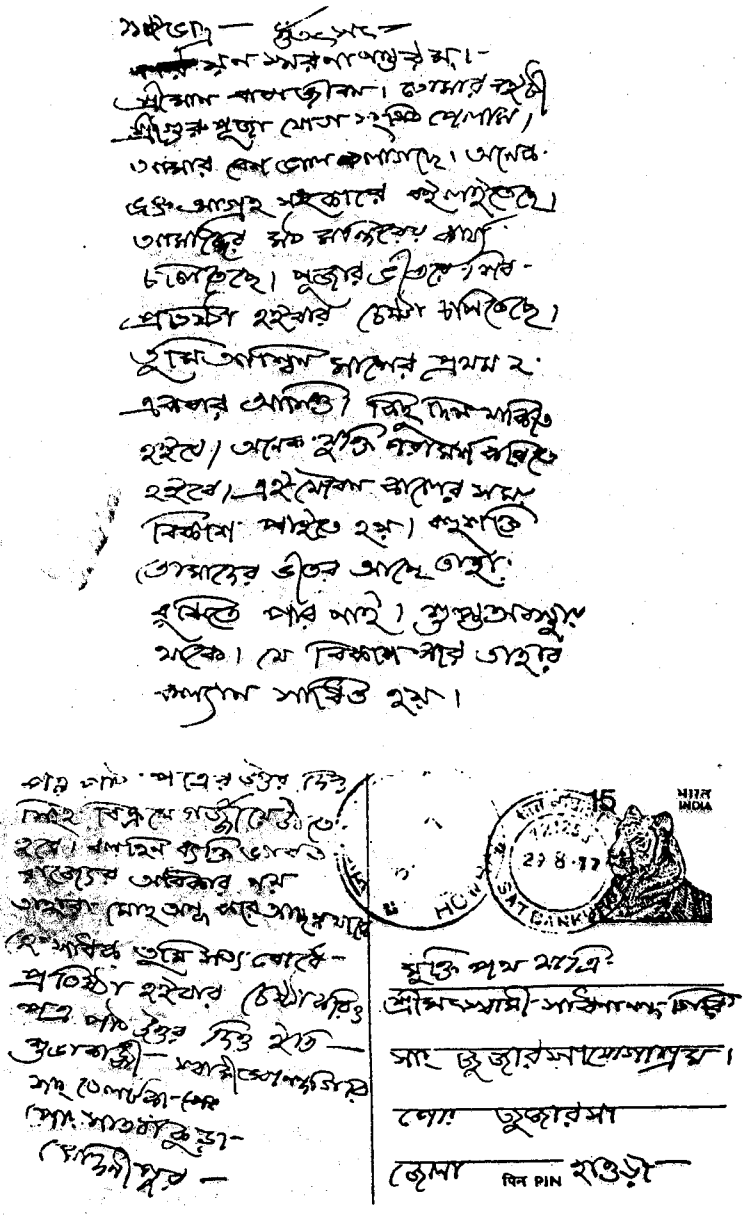

পত্র নং ৩

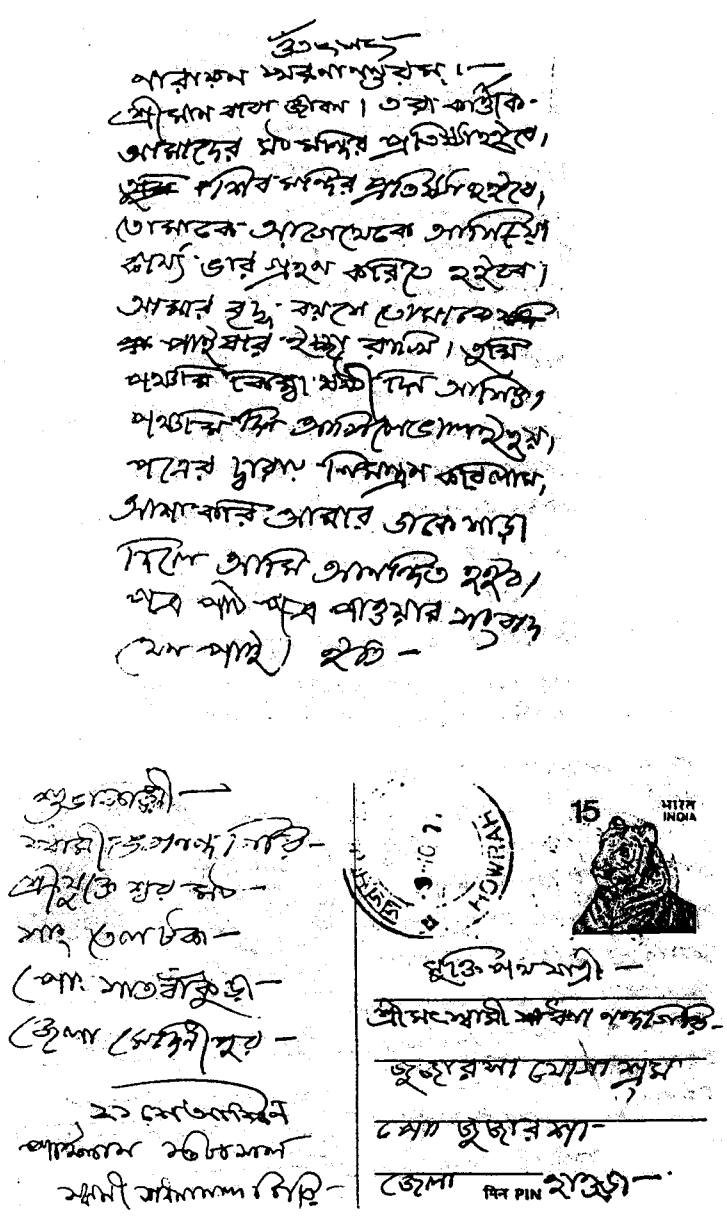

পত্র নং ৪

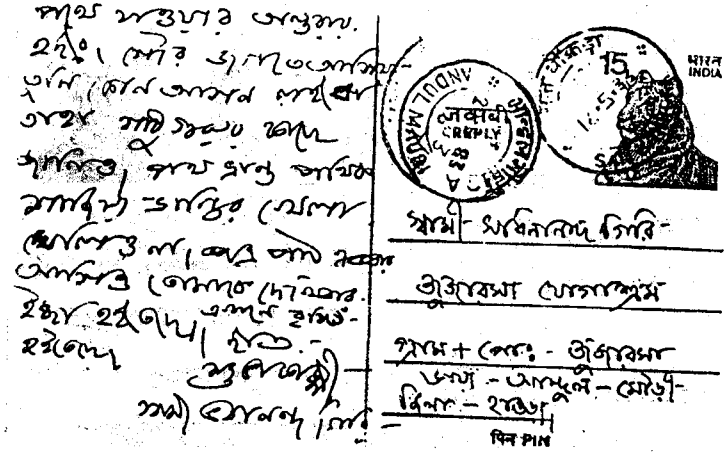

পত্র নং ৫

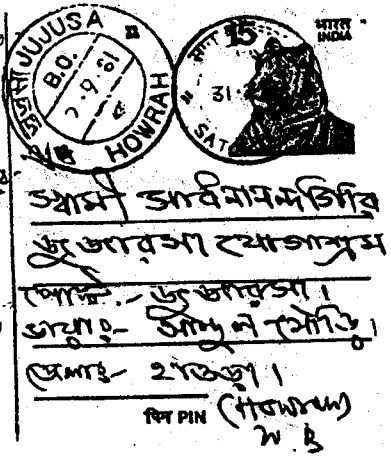

পত্র নং ৬

পত্র নং ৭

পত্র নং ৮

ওঁ তৎসৎ — চন্দ্রকোনা

মুক্তি পথ যাত্রী —
শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ বাবা জীবন
তোমার চিঠি পেলাম, এ সম্বন্ধে
স্বাস্থ্যের উদ্বেগ্য নিয়ে সংবাদ
পাইলাম, ৩রা বৈশাখ শনিবার
আমার জন্মতিথি হইতেছে, তুমি
ঐ আশ্রমে আসিও, শিবরাত্রিতে
সারারাত্রি আশ্রমে [illegible] করা হয়।
[illegible] ও জন্মতিথিতে অনুরূপ
উৎসব দিবসে লইয়া — [illegible]
উৎসব পালিত হয় —
তুমি অবশ্য অবশ্য আসিও
আমি, তোমার আসায়
আনন্দিত হইব, আমার —
শরীর — [illegible] মধ্যে মধ্যে
ভালমন্দ করিতেছে
ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী ভোলানন্দ গিরি —

স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি।
জুজারসা যোগাশ্রম।
গ্রাম+পোষ্ট:- জুজারসা।
ভায়া:- আন্দুল-মৌড়ি।
জেলা:- হাওড়া (Howrah) W.B.
পিন PIN

পত্র নং ৯

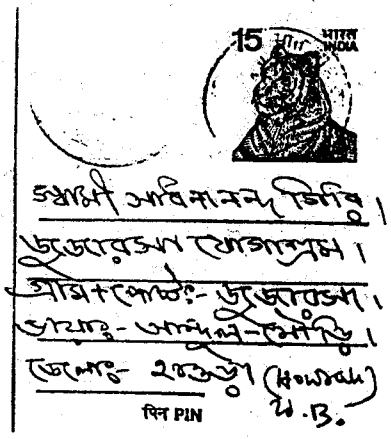

ওঁ তৎসৎ
নারায়ণস্মরণান্তরম্ -

মুক্তি পথ যাত্রী
শ্রীমান বাবা জীবন
তোমার সাধু সেবার সাহায্যটি
পেয়েছি। ২৭শে বৈশাখ শ্রীগুরু
মহারাজের জন্মতিথি উৎসব
পালিত [illegible] হইতেছে। তোমার
কাছে কেউ লোক জল খাব-
নিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি যদি
সুবিধা বিবেচনা কর যাইতে পার
বিশেষ আর কি বলিব ওখানে
যদি যজ্ঞ শেষ হইলে সত্যপাঠের
কার্য্য করিতে হইবে পত্র
পাঠ পত্রের কুশল দিও -
রাস্তার সুর ভাল নয়, কি
ভাবে যাইবে আমি এখন
থেকে বলিতে পারিব না,
যে ওখানে যাইবে তাহার
সহিত কথা বার্ত্তা
বলিবে, আমার শরীর
তেমন ভাল নয় -
ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
স্বামী ভোলানন্দ গিরি -

I have received this at 5Th May 1979
S. S. Giri

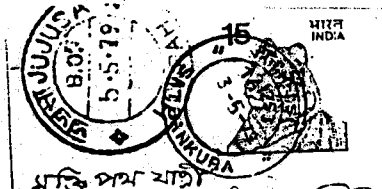

মুক্তি পথ যাত্রী
শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি.
সা: জুজারসা যোগাশ্রম
পো: - জুজারসা
জেলা - হাওড়া
পিন PIN

পত্র নং ১০

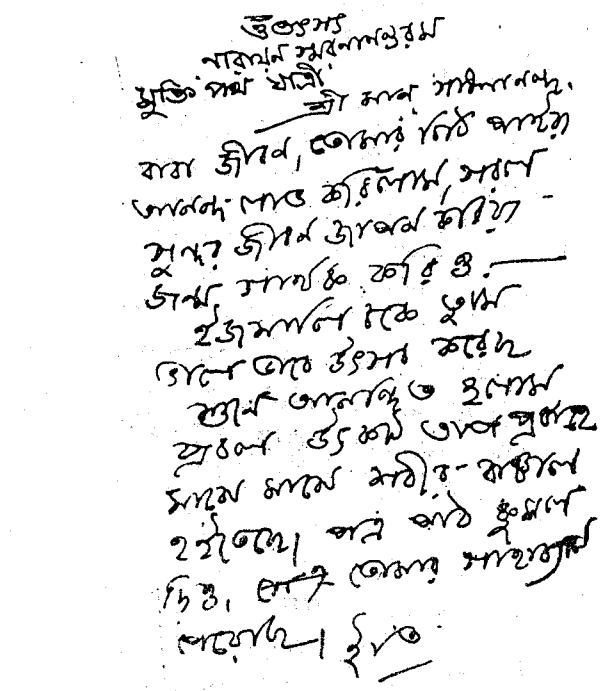

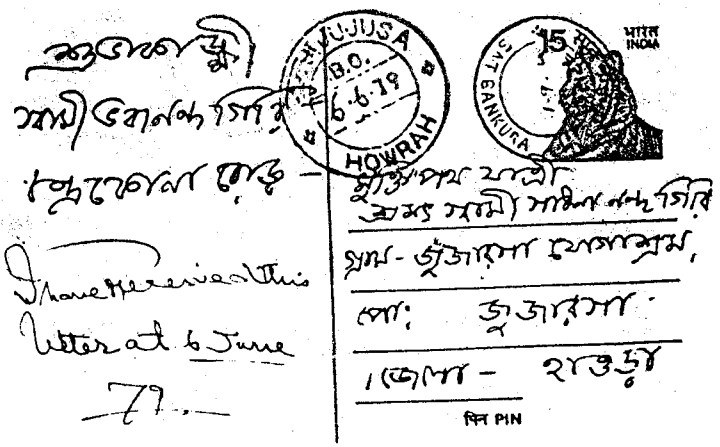

পাঠকের উপলব্ধি

স্বামী সাধনানন্দ গিরি লিখিত "সদ্ গুরুবাণী" গ্রন্থখানি গুরু-শিষ্য কথোপকথন বিষয়ে একখানি উত্তম গ্রন্থ বলা চলে। স্বামী সাধনানন্দ সুবিনীত অনুগত শিষ্যরূপে যোগাচার্য্য স্বামী ভবানন্দগিরি মহারাজকে উপযুক্ত প্রশ্নাদি করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজও নিজস্ব অনুভূতিলব্ধ সত্য সহ শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়া উত্তর দিয়াছেন। যোগিরাজ শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগের আদর্শ সম্মত উপদেশাবলী লইয়া জিজ্ঞাসু যোগশিক্ষার্থিগণের নিকটে ইহা একখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হইয়াছে।

সদ্ গুরু, শিষ্য সাধনার পথ, জগৎ সমাজ, জীবন, মানব কল্যাণ, সংযম, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তা গুরুর অনুভূতিশীল বাণী ও আগ্রহী শ্রোতা শিষ্যের বিদগ্ধ মন্তব্য থাকায় গ্রন্থখানিকে আধ্যাত্মক চিন্তার একটি সুসংবদ্ধ দিক নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যোগিরাজের শ্বাসের ক্রিয়াদির ও স্তরানুক্রমের সাবলীল বিশ্লেষণ। পাঠকদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এতৎসহ সংযোজিত ভাবার্থ বিশদর্থ এবং নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বচন গ্রন্থখানির মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। ক্রিয়ান্বিত বা অন্য ধর্মজিজ্ঞাসুদের মধ্যে গ্রন্থখানির বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। শুভমস্তু।

আচার্য স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি
সেবায়তন সৎসঙ্গ মিশন।

ইংরাজী তাং : ৬।৭।৮৯

পোষ্ট = সেবায়তন। ভায়া = ঝাড়গ্রাম, জিলা = মেদিনীপুর

২

যোগাচার্য্য মহারাজ সাধনানন্দজীর "সদ্ গুরুবাণী ও শ্রীশ্রী কালী ও শিবের তত্ত্বকথা" বই দুটি বাংলায় লেখা-সাধন-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে মনে হয়। সংস্কৃতচর্চায় দুর্বল সাধারণ মানুষের কাছে, ধ্বনি, শব্দার্থ ও অধ্যাত্ম ব্যাখ্যায় এই বই দুটি গুরুবাদ সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা অপসারণে এবং পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে নিশ্চত সাহার্য্য করবে।

মহারাজের মানস ফসলের স্বাদ মনোহারী। এতে বিধৃত অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা পাঠকমাত্রকে মুমুক্ষু ও সাধনকামী করে তুলবেই।

ইতি
আলোক কুমার সিংহ
Senior Lecturer
The Deparment of English, Serampore College, Hoogly.

ইংরাজী তাং : ১৫।১২।৯০

৩

যোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সাধনানন্দ গিরি মহারাজের কর্ত্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত "সদ্ গুরু বাণী" অর্থাৎ পরমপূজ্যপাদ যোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত পুলকিত ও উপকৃত হইলাম।

পরমপূজ্যপাদ যোগাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজের ভক্তশিষ্যগণ এমন একখানি গ্রন্থের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিলেন। ইতিপূর্বে এমন প্রামাণ্য গ্রন্থ কেহ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই।

গ্রন্থখানির সংকলক ও ব্যাখ্যাতা স্বীয়গুরু যোগাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী ভবানন্দ গিরিমহারাজের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য উচ্চাসনে উপবিষ্ট সন্ন্যাসী। তিনি গুরু সান্নিধ্যে অবস্থানকালে যাহা যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন তৎসমুদয় ও শ্রীশ্রী গুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উত্তর ক্যাসেট বন্দী করিয়া অতি যত্ন, নিষ্ঠা, ভক্তিও পরিশ্রম করতঃ পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করিয়া তৎসৎস্বীয় ব্যাখ্যা ও ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া আমার ন্যায় ভক্ত শিষ্যগণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ্য।

গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে অনুভব হয় যেন পরমপূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের সামনে বসিয়াই তাঁহার নিজস্ব ভাষায় ও ভাবে উত্তরগুলি শুনিতেছি। খুবই আনন্দ হয়। আসল কথা লেখকের একনিষ্ঠতা, গুরু ভক্তি তদুপরি আধ্যাত্মিক জগতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে গ্রন্থখানি সফল ও সার্থক হইতে পারিয়াছে। ক্রিয়াবান মাত্রেরই সম্পূর্ণ সার্থক "সদ্ গুরু বাণী" গ্রন্থ খানি সংগ্রহে রাখা উচিত। তাঁহারা উহা পাঠ করিয়া অবশ্যই উপকৃত হইবেন।

এমন অমূল্য গ্রন্থখানি মাত্র পঁচিশ টাকায়* আমাদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য লেখককে পুনরায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইতি
শ্রদ্ধাবনত
শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়
বিদ্যাসাগর পল্লী
পোষ্ট ও জিলা = মেদিনীপুর

ইংরাজী তাং ঃ ১১।৯।৯১

* প্রথম সংস্করণের মূল্যমান।

৪

শ্রদ্ধেয় স্বামী সাধনানন্দ গিরি মহারাজ, সর্বাগ্রে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার লিখিত ও সদ্য প্রকাশিত "সদ্ গুরু বাণী" বই পড়ে খুবই মুগ্ধ হয়েছি। আশান্বিত হয়েছি আমাদের মত গৃহীলোকেরও সেই পরমের সঙ্গে নিজেকে, নিজের ক্ষুদ্র অহংকে যোগে যুক্ত করতে পারা যাবে এই ভেবে। আহা কি মধুর এই আশ্বাসবাণী। এই গ্রন্থখানি সমাজে প্রভূত উপকার সাধন করবে।

ইতি
শ্রী ভূধর চন্দ্র দে
সাং+পো ঃ উরুড়ি
ভায়া = পালপাড়া
জিলা = মেদিনীপুর।

৪ঠা কার্ত্তিক - সন ১৩৯৫ সাল, শুক্রবার

৫

শ্রীগুরু অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্য সত্ত্বা শ্রীপাদপদ্মে জানাই প্রাণের প্রণতি। আপনার স্বরচিত "সদ্ গুরুবাণী" গ্রন্থ পাঠ করে দেখলাম যে পুস্তকটী অতি উচ্চস্তরের প্রকাশ। জীবাত্মা, আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, পরমাশক্তি, ব্রহ্মশক্তি, শক্তিমানের শক্তি, তিনি স্বয়ং মহামায়া ইত্যাদি জ্ঞানতত্ত্বের বিশ্লেষণ যা পরিপাটী উপযুক্ত মধুর বাক্য ও পদে লিখিত হয়েছে তাতে অন্ধ বা অজ্ঞানীরও অন্তরে জ্ঞানের আলো ফুটে উঠবে। আর অধ্যাত্ম সাধনার মূলে যে শ্রীগুরুকৃপা ও তত্ত্বকথা বলা হয়েছে তা শাশ্বত সত্য। বলা উচিত নহে আমি বহু পুস্তক পাঠ করেছি কিন্তু ধারাবাহিকভাবে, সহজ সরল ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত এরূপ পুস্তক আমি দেখি নাই। ধন্য আপনার লেখনী ও আপনার অন্তর দেবতা শ্রীগুরুরকরুণা। শ্রী ভগবান পাদপদ্মে জানাই যে মানবজীবনকল্যাণে উক্ত "সদ্ গুরুবাণী" গ্রন্থটীর মূল উদ্দেশ্য বহুল প্রচারিত ও সার্থক হউক।

ইতি
প্রণতঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
সভাপতি ঃ বিবেকানন্দ তীর্থ।
৬৫/২ নটবর পাল রোড্
হাওড়া — ৭১১১০১

তাং ২৭শে অগ্রাহায়ণ, ১৩৯৬

৬

"সদ্ গুরু বাণী" গ্রন্থটি প্রকৃত পক্ষে যোগাচার্য্য স্বামী ভবানন্দ গিরি মহারাজের মুখনিঃসৃত বাণী। তাঁরই শিষ্য স্বামী সাধনানন্দ গিরি সেই বাণীগুলিকে এই গ্রন্থে সংকলন ও ব্যাখ্যা করে ধর্মপিপাসুদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। সংকলকের সন্ন্যাস জীবনে যে সকল প্রশ্ন দেখা দিত, তা তিনি গুরুদেবকে জানাতেন এবং তাঁর উত্তর খাতায় নোট করে রাখতেন। এছাড়া ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চারবছর ধরে শিষ্যের মনে যে সকল প্রশ্ন জেগে ছিল, সেগুলিও গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এই গ্রন্থে সেই উত্তরগুলিও সংযুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে গ্রথিত। প্রথম প্রশ্নই "সদ্ গুরু" কাকে বলে? উত্তরে বলা হয়েছে, "গুরু মানেই— হচ্ছে বিরাট। তার সৎ অসৎ নেই। অন্য গুরু হয়না।" সম্ভবত এই উত্তরটি প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মেলে না, কিন্তু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এরকম অসংখ্য প্রশ্ন এবং তাঁর যুক্তিসিদ্ধ উত্তর এই বইটিতে স্থান লাভ করেছে।

মোট ১৪১ পৃষ্ঠা ব্যাপী সুবিন্যস্ত এই বইটির বৃহত্তর অংশেই ধর্ম-জিজ্ঞাসু পাঠক এবং আধ্যাত্মিক পথের সন্ধানী পাঠক তাঁদের মনের বহু প্রশ্নের উত্তর পাবেন এবং তাঁদের বহু সংশয়ের অবসান ঘটবে। এই বইটির একটি বড় সম্পদ "গীতা ও অধ্যাত্ম তত্ত্ব" শীর্ষক অধ্যায়টি। যোগীবর শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ীর বিভিন্ন প্রসঙ্গে গীতা ব্যাখ্যা এই অধ্যায়টিকে রীতিমত সমৃদ্ধ করেছে।

সবশেষে "উপদেশবলী"—যেখানে বলা হয়েছে স্বামী ভবানন্দ গিরিমহারাজ বলতেন, ক্রিয়ার তিনটি অবস্থা—প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ। এই তিন অবস্থায় সাধককে তিনটি গ্রন্থি ভেদ করতে হয়। জিহ্বা গ্রন্থি ভেদ হলে প্রবর্ত্তক অবস্থা। হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হলে সাধক অবস্থা এবং মূলাধার গ্রন্থিভেদ হলে সিদ্ধ অবস্থা। আধ্যাত্মিক পথের পথিক এই গ্রন্থে সাধন পথের সন্ধান পাবেন।

সাংবাদিক
শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্ত্তী
যুগান্তর পত্রিকা।

তাং ২৩শে মাঘ, বুধবার, ১৪০২ সাল